

গল্প-সংগ্রহ

ভাসিলি শুকশিন • গল্প-সংগ্রহ

ভাসিলি শুকশিন • গল্প-সংগ্রহ

ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ

ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି

ভাসিলি শুক্‌শিন

গল্প সংগ্রহ

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: **মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়**
অঙ্গসজ্জা: **স. ক. পুস্‌কোভা**

Василий Шукшин

«ОХОТА ЖИТЬ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

на языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Ш $\frac{70302-498}{014(01)-79}$ 759—79   4702010200

সূচি

প্রকাশকের কথা

নিজের সম্বন্ধে ভাসিলি শুকশিন বলেছেন, 'সর্বাগ্রে আমি লেখক...' কিন্তু ওঁর পাঠকেরা প্রথমেই যে পরিচয় পেয়েছেন তা হল এই যে শুকশিন অসাধারণ অভিনেতা, যাঁর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। 'দুই ফিয়দর' ফিল্‌মে প্রধান ভূমিকায় ওঁর সর্বপ্রথম অভিনয়। এরপর চলচ্চিত্রের পর্দায় দর্শক-মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন বহুবার। প্রখ্যাত সোভিয়েত নাট্যকার আলেক্সেই আরবুজভ লিখেছেন, 'বিখ্যাত ছায়াছবি "হ্রদতীরে"তে ভাসিলি শুকশিন যেন অভিনয় করেন নি, বরং এটাই যেন তাঁর স্বাভাবিক জীবন। এক্ষেত্রে রুশ অভিনয়ের ধারা এমন এক তুঙ্গে পৌঁছেছে, কারও সঙ্গে যার তুলনা করা যায় না।' 'হ্রদতীরে' ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে ভ. শুকশিন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া পরেও তিনি অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন — যেমন, 'পেচকি-লাভচকি', 'জীবনের পথে', 'ওরা মাতৃভূমির রক্ষক' ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসেবে শুকশিন জীবন শুরু করেন এবং দ্রুত হয়ে ওঠেন অদ্বিতীয়। 'এক যে ছিল ছেলে' — নিজস্ব চিত্রনাট্য অবলম্বনে তৈরি তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র। সগৌরবে গোটা সোভিয়েত দেশে প্রদর্শিত হবার পর ছবিটি ভূষিত হয়েছে স্বর্ণসিংহ পদকে — যা ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে বিবেচিত। চিত্র-পরিচালক হিসেবে তাঁর দ্বিতীয় কাজ

হচ্ছে 'আপনার ছেলে এবং ভাই' — এ-ছবিটি রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছে। এছাড়া 'আজব লোকজন', 'পেচ্‌কি-লাভচ্‌কি', 'জীবনের পথে' ইত্যাদি ফিল্‌ম প্রমাণ করেছে যে সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পে ভাসিলি শুক্‌শিনের অসামান্য এবং ফলপ্রদ একটি নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে যাই হোক, শুক্‌শিন সর্বাগ্রে হচ্ছেন লেখক। ওই সময়েরই মধ্যে ওঁর প্রথম গল্পগুচ্ছ 'গ্রামবাসী' পাঠকদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছিল, সাড়া জাগিয়েছিল সমালোচক-মহলে। এরপর ধারাবাহিক গল্পগুচ্ছ — 'ওখানে, অনেক দূরে', 'দেশবাসী', 'চরিত্রচিত্র', 'চাঁদের আলোয় আলোচনা' এবং উপন্যাসদ্বয় 'লিউবাভিনি' ও 'আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি' দ্রুত তাঁর খ্যাতিকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সবসেরা, গুণী সোভিয়েত লেখকের সারিতে স্থান পেয়েছে ওঁর নাম।

শুক্‌শিনের গল্পগুচ্ছ পড়তে-পড়তে মনে হয় যেন নানা ধরনের লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। পরিচয় হয় তখন রকমারি মানুষজনের সঙ্গে, তাদের আনন্দের ও দুঃখকষ্টের অংশীদার হতে হয়। ভাসিলি শুক্‌শিন সামাজিক খন্ডচিত্রকে রূপায়িত করেছেন তেমনিভাবে, ঠিক যেমনটি ধ্রুপদী রুশ জীবনধারাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তুর্গেনেভ। রঙ্গরসিকতা আর সূক্ষ্ম ঠাট্টা-বিদ্রূপ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শুক্‌শিন।

ভাসিলি শুক্‌শিন খুব অল্পবয়সেই জীবনের মায়া ত্যাগ করেন, মারা যান মাত্র ৪৫ বছর বয়সে। ১৯৭৪ সালের শরৎকালে মিখাইল শোলখভের উপন্যাস 'ওরা মাতৃভূমির রক্ষক'এর চিত্ররূপের যখন পুরোদমে শুটিং চলছিল তখন শুক্‌শিন মারা যান। এই ফিল্‌মে তিনি আন্দ্রেই লপাখিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন — ফুটিয়ে তুলেছেন এক পরিশ্রমী মানুষ ও যোদ্ধার চরিত্র। নিজের জীবনেও উনি ছিলেন সত্যি-সত্যি ওইরকম।

খুব কঠিন পরিবেশে শুক্‌শিন জীবন শুরু করেছিলেন, কোনো সময়েই সহজভাবে কাটে নি ওঁর। বড় হয়ে উঠেছেন ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের আমলে। ১৬ বছর বয়সে কাজ শুরু করেছেন যৌথখামারে এবং পরে ট্র্যাক্টর কারখানায়। স্কুলের পাঠ শেষ করে শুক্‌শিন ওখানেই ভাষা ও

সাহিত্য পড়িয়েছেন এবং পরে স্কুলের ডিরেক্টরও হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে সিনেমাটোগ্রাফির সারা ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। শুক্শিন এই পড়াশুনো শেষ করেন ৩০ বছর বয়সে। ওঁর মেধা ছিল অস্বাভাবিক পরাক্রান্ত, যা গভীর জ্ঞানে জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। উনি ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠেছেন এক রচনা থেকে অন্য রচনায়, জানতেন মানুষকে কী বলতে হবে আর কী করে বলতে হবে তাও। জনগণও শুক্শিনকে আপনজন হিসেবে গভীরভাবে নিজেদের মনে স্থান দিয়েছেন।

পাঠকেরা এই বইয়ে ভাসিলি শুক্শিনের ১৬টি গল্পের এক সংগ্রহ পাবেন। গল্পগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের শেষ দশ বছরে লেখা।



মস্তান মোটর-ড্রাইভার

সেবার বসন্তে বীজবোনার সময় ঘনিয়ে আসার মুখে-মুখে বিস্ত্রিয়ান্‌কায় নতুন এক ছোকরার আবির্ভাব ঘটল। ছোকরাটি — মোটর-ড্রাইভার পাশ্‌কা খল্‌মান্‌স্কি। পাতলা ছিপছিপে শক্তসমর্থ চেহারা, ভারি চটপটে, হলুদের ছোপলাগা পাঁশুটেরঙের বেপরোয়া চোখ, পাতলা টিকলো নাক, মুখে বসন্তের কয়েকটা দাগ আর ধনুকের মতো একজোড়া বাঁকানো ভুরু। ছোকরা রাগী মেজাজী লোক না সুপুরুষ, তা বলা মুশকিল ছিল। ওকে দেখলে এক-ধরনের পাখির কথাই মনে পড়ে যেত।

কট্টর আচারনিষ্ঠ 'ওল্‌ড বিলিভার'দের এক পরিবারে জন্ম হয়েছিল পাশ্‌কার। আল্‌তাই পর্বতমালার মধ্যে কাতুন নদীর পাহাড়ি খাতের ধারে কোনো এক গাঁ থেকে এসেছিল সে, তবে পূর্বপুরুষদের অনড় সাবেকি ধরনধারণের কিছুই তাতে বর্তায় নি।

বিস্ত্রিয়ান্‌কায় ওর আসার ইতিহাসটা হল এইরকম।

বিস্ত্রিয়ান্‌কার স্থানীয় যৌথ খামারের চেয়ারম্যান ইয়েরমলাই প্রোখরভ খামারের ল্যান্ডরোভারে চেপে শহর থেকে ঘরমুখো অর্ধেক রাস্তা আসার পর গাড়িখানার পেছনদিককার একখানা স্প্রিং গেল ভেঙে। ড্রাইভারকে এ-নিয়ে খুব একচোট বকাবকি করে মনটা একটু হালকা হলে পর প্রোখরভ বুড়ো আঙুল নেড়ে-নেড়ে পথচলতি লরি থামানোয় মন দিলেন। খান-দুই লরি তাঁর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে না-থেমে চলে যাবার পর অবশেষে তৃতীয় একখানা লরি থামল আর ড্রাইভার দরজা খুলে মুখ বাড়াল:

'যাবেন কোথা?'

'বিস্ত্রিয়ান্‌কা।'

'আর সাল্তন? সেটা কি ওর কাছাকাছি কোনো জায়গা?'

'কিছুটা কাছে তো বটেই। কেনে কও দেখি?'

'আমি আপনারে সাল্তন পর্যন্ত পেঁাছে দিতে পারি। তবে আপনি কিন্তু আমারে রাস্তা দেখাবেন।'

অতঃপর ওই গাড়িতেই রওনা দিলেন প্রোখরভ।

ডান হাতখানা স্টিয়ারিং হুইলে রেখে সিটে হেলান দিয়ে বসে ছিল ড্রাইভার, বাঁ হাতখানা ঠেকো দিয়ে রেখেছিল লরির ক্যাবিনের দরজায়। দৃষ্টিটা ওর নিবদ্ধ ছিল সামনের রাস্তার দিকে। চোখের কোণগুলো মনোযোগে কুঁচকে ছিল একটু।

রাস্তায় গর্তগার্তা কী এক অলৌকিক কৌশলে এড়িয়ে লরিখানা বাঁক নিয়ে-নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। একবার উলটোমুখে-আসা অপর একখানা লরির এমন গা ঘেঁষে চলে গেল ওদের লরিটা যে চেয়ারম্যান-সায়েব আঁতকে উঠলেন। আড়চোখে একবার ড্রাইভারের দিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে হুইল ধরে চোখের কোণদুটো একই রকম স-মনোযোগে কুঁচকে বসে থাকতে দেখা গেল ছেলেটাকে।

'কখনও অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাও নি?'

'কী বললেন?.. না-না, ঘাবড়ায়েন না। মাথা ঠাণ্ডা রাখেন দাদু। ফৌজী বিমান চালাতে হলে আসল জিনিস কী লাগে জানেন?' বলতে-বলতে একগাল দিলখোলা হাসিতে ড্রাইভার-ছোকরার মুখটা ভরে উঠল।

'আমার মনে হয়, ফৌজী বিমান চালাতে আসল যে-জিনিসটা লাগে তা হল বেশি কের্দানি না-দেখানো।'

'না-না, বলতে পারলেন না।' ছোকরা এবার স্টিয়ারিং হুইল বিলকুল ছেড়ে দিয়ে পকেট চাপড়ে সিগারেটের খোঁজ করতে লাগল। মনে হল সহযাত্রীটিকে ভয় পেতে দেখে সে মজাই পাচ্ছে।

দাঁত কিড়মিড় করে প্রোখরভ মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই লরিটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। সহজাত প্রবৃত্তিবশে প্রোখরভ লরির দরজাটার দিকে হাত বাড়ালেন — তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকালেন খ্যাপাটে চোখে।

'অ্যাই!.. ফৌজী বিমান কাঁহাকা!'

ছোকরা কিন্তু ফের মুচকি হাসল। সবিনয়ে স্বীকার করল:

'জোরে গাড়ি চালানো আমার পছন্দ।'

একমুহূর্ত ছেলেটার চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রোখরভ। ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা তাঁর মনে ধরে গেল।

'তুই সাল্‌তন যাচ্চিস কী জন্যে?'

'কাজে যাচ্চি।'

'কী কাজ? বীজ বোনা?'

'হ্যাঁ... খামারের ছোঁড়াদেরে সাহায্য করতে মাঝে-মাঝে যেতে হয় আমারে।'

ধূর্ত প্রোখরভ কিছুক্ষণ চুপটি মেরে রইলেন। সিগারেট ধরিয়ে নিলেন একটা। মনে-মনে ইতিমধ্যে তিনি ঠিক করে ফেলেছেন যে তিনি যে-খামারের চেয়ারম্যান সেই খামারে কাজ করার জন্যে ছেলেটাকে বাগাতেই হবে।

'তুই কি খোদ সাল্‌তনেই কাজ করতে যাচ্চিস, নাকি ওই তল্লাটে আর-কোথাও?'

'বাইরির দিকে আর-কোথাও। লিস্‌ত্‌ভিয়ান্‌কা গাঁয়ে। আপনাদের এখেনে দেশ-গাঁ ভারি সোন্দর জায়গা।'

'নাম কী তোর?'

'আমার নাম? পাশ্‌কা বটে গো। পাভেল ইয়েগোরিচ খল্‌মান্‌স্কি।'

'তাইলে দেখা যাচ্চে আমাদের নাম এক। আমারও বাপের নাম ইয়েগোর। তা, তুই আমাদের ঠেঁয়ে এসে কাজ কর্‌-না কেনে, ইয়েগোরিচ?'

'তার মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'যেখেনে তুই যাচ্চিস সেই খামারের চেয়ারম্যানরে আমি চিনি। তার সাথে আমি সব বন্দোবস্ত পাকা করে নেব-নে। আমিও খামারের চেয়ারম্যান, বুঝলি তো! লিস্‌ত্‌ভিয়ান্‌কা একটা আঁস্তাকুড়, জায়গাটা আমার ভালোই জানা আচে। আমাদের জায়গাটার সাথে কোনো তুলনাই চলে না...'

'আপনার কথাটা ঠিক বোঝলাম না। আমারে নির্দেশ দেয়া হয়েচে যে —'

'বলি, তোর এতে কী যায়-আসে?! অ্যাঁ? আমিও তোর হাতে একই রকম চিরকুট ধইরে দিতে পারি। তাতে লেখা থাকবে বীজবোনায় তোর যা কাজ তা তুই করেচিস। কাজটা সব্বত্তরই তো সমান, নাকি? যাই হোক, ওখেনকার চেয়ারম্যানের সাথে আমি সব বন্দোবস্ত করে ফেলব-নে। তাছাড়া তার কাছে একটা সুবিধাও আমাদের পাওনা, বুঝলি! তা, তুই কী বলিস?'

'আপনাদের ওখেনে কি ক্লাব আচে?' পাশ্‌কা শুধোল।

'ক্লাব? নিশ্চয় আচে!'

'আহা, ছবি-ছবি।'

'মানে?'

'না, বলচি কী, তাইলে খাসা কারবার। একবারে সুপারক্রোম্যাটিক।'

মুরুব্বিয়ানা চালে হাসির বিজকুড়ি কাটলেন প্রোখরভ। বললেন:

'তুই দেখচি রসিক লোক... (ঠিক বীজবোনার সময়টাতেই বাড়তি একখান ট্রাক সহ একজন ড্রাইভারও জুটে গেল — এটা 'আহা, ছবি-ছবি' ছাড়া আর কী! আর সে ছবি সুপারক্রোম্যাটিকও বটে!) তা যাই বলিস, তুই কিন্তু সত্যিকার একজনা রসিক লোক, ইয়েগোরিচ।'

'তা, লোকেরে হাসাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি বৈকি। তাইলে, আপনাদের ওখেনে একটা ছোটখাট ক্লাবও আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা আছে বটে, পাভেল। চমৎকার ক্লাবঘর একখান — ঘরখান আগে গির্জে ছেল!'

'তাইলে আমরা সেখেনে প্রাথনাও জানাতে পারব, কী বলেন!' পাশ্‌কা উতোর জুড়ল।

আর দু'জনেই হেসে উঠল হো-হো করে।

এইভাবেই বিস্ত্রিয়ান্‌কায় ওইদিন পাশ্‌কার আসা ঘটে গেল।

প্রোখরভদের পরিবারের সঙ্গে থাকতে শুরু করল পাশ্‌কা। বাড়ির কর্ত্রী, প্রোখরভের স্ত্রীর সঙ্গে শিগ্‌গিরই সে ভাব জমিয়ে নিল। সন্ধেটা মহিলার সঙ্গে আলাপ করে কাটাতে তার ভালোই লাগত।

ওই দিন সন্ধেবেলা মাকারোনি সহ হাঁসের মাংসের ঘন ঝোলে মুখ ডুবিয়ে সে তো বলেই বসল, 'হ্যাঁ, ইস্তিরি হতে গেলে মন বলে পদাত্থ থাকা চাই!'

'তা যা বলেচিস, ইয়েগোরিচ,' প্রোখরভ ওর কথায় রসান দিলেন। তারপর অনেকখানি হেঁট হয়ে পা থেকে আঁটো-হয়ে-চেপে-বসা একপাটি বুট খুলতে-খুলতে বললেন, 'সে আবার কেমনধারা ইস্তিরি যার মন বলে পদাত্থ নেই? অ্যাঁ?'

পাশ্‌কা বলে চলল, 'ধরেন, কাজ সেরে আমি বাড়ি এলাম। তা, খাটুনির চোটে ভেঙে পড়ে আর ঝুলকালিতে মাখামাখি হয়ে বাড়ি ফিরে পেরথমেই যা আমি দেখতে চাইব তা হল ইস্তিরির দুর্দান্ত চন্‌মনে ভাব। ধরেন, আমি যদি তখন হাঁক পাড়ি, "এই-যে, মারুসিয়া!" তারে তখন একগাল হেসে জবাব দিতে লাগবে, "এই-যে, পাভেলসোনা! খুব ক্লান্ত বুঝি?"'

'কিন্তু ধর, বেচারা মেয়েটা সারাদিনের খাটাখাটুনির পর নিজেই যদি খুব ক্লান্ত থাকে, তাইলে? তাইলে অত হাসিখুশি ভাব সে পাবে কোন ঠেঁয়ে শুনি?' এবার ফোড়ন কাটলেন বাড়ির কর্ত্রী স্বয়ং।

'তাতে আমার কী যায়-আসে? ইস্তিরির যদি দেখি তিরিক্ষি মেজাজ আর ভেঙে-পড়া ভাব, তাইলে আমি তারে শুধু বলব, "সুপারক্রোম্যাটিক", ব্যাস। তারপর অপর মেয়েছেলের দিকে চোখ পড়বে আমার। তাই-না, ইয়েগোরিচ?'

'নিশ্চয়!' প্রোখরভ সায় দিলেন।

এতে তাঁর স্ত্রী রাগের ভান করে বললেন — সব পুরুষই ওইরকম, মেয়ে দেখলেই পিছু ধাওয়া করে।

...গাঁয়ে এসে পৌঁছনোর পরদিনই পাশ্‌কা এসে দেখা দিল ক্লাবঘরে। উদাস-উদাস খুশিখুশি ভাব আর গলার বোতাম-খোলা কালচে-ঘন লালরঙের শার্ট, ক্রোম-লেদারের উঁচু বুট ও নতুন ফৌজী কায়দার টুপি পরনে আর টুপির তলা থেকে ঝাঁপিয়ে-পড়া বাদামিরঙের চুলের গোছাটা নিয়ে এসে দাঁড়াল সে। একেবারে নজর কাড়বার মতো চেহারা।

'এখেনকার লোকজন কেমন সব? তেমন খারাপ না, বোধকরি?' আল্‌গাভাবে একটি ছেলেকে শুধোল সে, তারপর নাচিয়ে জোড়াগুলোর দিকে নিস্পৃহ চোখে একনজর তাকাল। 'এখেনকার লোকজন' এর ওপর তার এই আবির্ভাবের ফলাফল কী, তা-ই যেন যাচাই করতে চাইল।

'না, তেমন খারাপ না,' অপর ছেলেটি জবাব দিল।

'তা, তোমার এত খাট্টা মেজাজের কারণ কী?'

'তা, তুমিই-বা একথা শুধোবার কে — শুনি?' ছেলেটি পাল্‌টা ফুট কাটল।

পাশ্‌কা কিন্তু অমায়িক ভঙ্গিতে একগাল হেসে দিল। বলল:

'আমি তোমাদের নূতন সরকারি উকিল যে গো। এ-জায়গাটার গোলমাল মিইট্যে ঠিকঠাক করে দিতে আমার আসা।'

'দেখো, তোমারেই-না সবাই আবার ঠিকঠাক করে দেয়।'

'তা লিয়ে তোমারে মাথা ঘামাতে হবে নি,' বলে ওর দিকে চোখ টিপল পাশ্‌কা। তারপর হলঘরের ছেলেমেয়েদের আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

আর তারাও পাল্‌টা দেখতে লাগল ওকে।

এই ধরনের পরিস্থিতিই পছন্দসই ছিল পাশ্‌কার। যা কিছু উদ্ভট, অপরিচিত আর প্রতিকূল তাই-ই ওকে চন্‌মনে মেজাজ এনে দিত। সবচেয়ে বেশি করে অবশ্য ও আগ্রহী ছিল মেয়েদের সম্পর্কে।

ইতিমধ্যে নাচ শেষ হয়ে যাওয়ায় জোড়ায়-জোড়ায় ছেলেমেয়েরা তাদের বসবার জায়গায় ফিরে গিয়েছিল।

'মেয়েটা কে বটে?' আগে যে-ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছিল তাকেই ফের জিজ্ঞেস করল পাশ্‌কা। যে-মেয়েটির কথা শুধোল ও, সে ছিল স্থানীয় সুন্দরীদের একজন। নাম নাস্তাসিয়া প্লাতোনভা।

ছোকরাটি কিন্তু এ-কথার উত্তর না-দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

ক্লাবের ব্যান্ডপার্টি এবার ওয়াল্‌ত্‌স নাচের বাজনা ধরল।

হলঘরের এপাশ থেকে ওপাশে সোজাসুজি হেঁটে গিয়ে নাস্তাসিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে অল্প একটু নুয়ে অভিবাদন করল পাশ্‌কা, তারপর বেশ চড়াগলায় বলল:

'ওয়াল্‌ত্‌সটা কি তোমার সাথে নাচতে পারি?'

এমন দারুণ কায়দাদুরস্ত ধরনধারণে সকলের তাক লেগে গেল। খুশি হয়ে ওর রকমসকম আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল সবাই।

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে ভারি একখানা হাত পাশ্‌কার রোগা কাঁধের ওপর রাখল নাস্তাসিয়া আর পাশ্‌কা ওর চোখের দিকে মিষ্টি করে তাকাল।

ওয়াল্‌ত্‌স নাচ শুরু করল ওরা।

নড়াচড়ায় কিছুটা ভারি আর ঢিলেঢালা ছিল নাস্তাসিয়ার ধরন। অন্যদিকে পাশ্‌কা এমন চোখ-ধাঁধানো পদক্ষেপের মুদ্রা দেখাতে লাগল যে কিছু লোক নিজেরা নাচ থামিয়ে ওর নাচ দেখতে লাগল। আর যখন নাস্তাসিয়ার হাত না-ছেড়ে ওর কাছ থেকে অল্প-একটু সরে দাঁড়িয়ে পাশ্‌কা এপাশ-ওপাশে হেলনদোলনের জটিল কিছু মুদ্রা দেখাল তখন তো বাকি সবাইকে একেবারে হতবাক করে দিল সে। সকলের তখন বিস্ময়ে খাবি খাওয়ার জোগাড়... এদিকে পাশ্‌কা 'এখেনকার লোকজন'এর মাথা ডিঙিয়ে দূরের দিকে তাকাল একবার, যেন বলতে চাইল: ' এ তো কিছুই না, যখন আমি মেজাজে থাকব তখন কতদূর কী করতে পারি তা একদিন দেখাব তোমাদেরে। এককালে আমি বড় কম তুখোড় নাচিয়ে ছেলাম না, বোঝলে!'

টুকটুকে রাঙা দুটি গাল নিয়ে নাস্তাসিয়া কিন্তু সমানে তার ধীর মসৃণ ছন্দে নেচে চলল।

পাশ্‌কার চোখের ভেতরে তাকিয়ে মজা পাওয়ার সুরে বলল সে, 'তুমি খুব লোক-দেখানো কাজকম্মো পছন্দ কর, তাই-না?'

পাশ্‌কা কিন্তু এতেও বিচলিত হল না।

'কোথা থেকে আসচ তুমি?'

'মস্কো থেকে,' আল্‌গাভাবে উত্তর দিল পাশ্‌কা।

'সেখেনে কি সক্কলে এমনধারা নাকি?'

'কেমনধারা আবার?'

'এই, দেখানেপনার বাতিক আছে যাদের।'

'সত্যি, তোমাদের গাঁইয়াপনা দেখে আমারই তাক লেগে যাচ্চে,' বলল পাশ্‌কা। তারপর নাস্তাসিয়ার কালো হেঁয়ালিভরা চোখের গভীরে অর্থপূর্ণ মোলায়েম দৃষ্টি বিঁধিয়ে দিল।

আল্‌তো করে হাসল নাস্তাসিয়া।

কিন্তু পাশ্‌কা ততক্ষণে গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

বলল, 'তোমারে ভালো লেগেচে আমার। আমি যারে এযাবৎ খুঁজে বেইড়েচি তুমিই সেই মেয়ে।'

নাস্তাসিয়া এবার সরাসরি পাশ্‌কার চোখে-চোখে তাকাল। বলল: 'ভারি তড়িঘড়ি তোমার কাজ, দেখচি তো!'

'না-না, ঠাট্টা না, আমি সত্যি কথাই বলচি!'

'তা, তাতে হলটা কী?'

'আজ আমি তোমারে ঘরে পেঁছে দেব। তবে তোমার যদি আর কোনো ছেলে-বন্ধু থাকে তাইলে ভেন্ন কথা। কেমন, এই ঠিক রইল তো?'

নাস্তাসিয়া হেসে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল। পাশ্‌কা কিন্তু তা দেখেও দেখল না।

অবশেষে ওয়াল্‌ত্‌স নাচ শেষ হল।

পাশ্‌কা মেয়েটিকে তার বসবার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ফের একবার অল্প নুয়ে সেই দারুণ কায়দাদুরস্ত অভিবাদন জানিয়ে বাইরের বারান্দায় যেখানে অন্য ছোকরারা ছিল সিগারেট খেতে সেখানে গেল।

সেখানে কড়া বিদ্বেষভরা চাউনির সম্মুখীন হতে হল তাকে। পাশ্‌কা জানত এটাই স্বাভাবিক, এ-সমস্ত ক্ষেত্রে এমনটাই হয়ে থাকে।

সিগারেট-ফোঁকা একটা দলের কাছে গিয়ে সে শুধোল, 'চট করে গলায় ঢালবার কিছু পাওয়া যায় এমন জায়গা আচে কাছেপিঠে?'

বিদ্রূপভরা চোখে পাশ্‌কার দিকে তাকাল ছেলেরা। কেউ উত্তর দিল না।

'কী হল? কথা খুঁজে পাচ্ছ না নাকি?'

'একটু বেশি কের্‌দানি দেখাচ্ছ বলে মনে হচ্চে না তোমার?' নাচের আগে যে-ছেলেটির সঙ্গে কথা বলেছিল পাশ্‌কা সে-ই জবাব দিল।

'কই মনে লিচ্চে না তো।'

'আমার কিন্তু তা-ই মনে লিচ্চে।'

'মনে লিলে আর কী করা, বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁক আর-কি।'

শুনে ছেলেটির চোখদুটো অপ্রসন্নভাবে কুঁচকে উঠল। বলল:

'এক-মিনিট একটু বাইরে আস দেখি, ব্যাপারটার একটা ফয়সলা করে ফেলা যাক।'

পাশ্‌কা মাথা নাড়ল।

'না, যেতে লারব।'

'কেনে?'

'বাইরে গেলে এখুনি তুমি আমারে খোঁড়া করে ছাড়বে, একবারে মিছামিছি, খামোকা... পরে এ-লিয়ে ফয়সলা করা যাবে-নে। কিন্তু সবাই এমন আমার 'পরে খাপ্পা হয়ে উঠলে কেনে কও দেখি? আমি তো কারো বাড়া ভাতে ছাই দিই নাই, দিচি কি?'

ছেলেরা ওর কাছ থেকে এমন কথা আশা করে নি। পাশ্‌কার সরলতা ওদের মনে ধরে গেল। ক্রমে ওরা কথাবার্তা বলতে শুরু করল।

ওরা যখন কথাবার্তা বলছে এমন সময় ব্যান্ডপার্টি ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা ধরে দিল আর অন্য কে একজন নাস্তাসিয়াকে নাচতে ডাকল। দেখে পাশ্‌কা সিগারেটের অবশিষ্ট টুকরো মাটিতে ফেলে সজোরে পা দিয়ে মাড়াল... ছেলেদের কাছে শুনল ও যে নাস্তাসিয়া মস্কো-থেকে-আসা এক এঞ্জিনিয়র ছোকরার সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা করছে, মনে হচ্ছে ছোকরাকেই ও বিয়ে করবে। পাশ্‌কা তখন মনোযোগ দিয়ে নাস্তাসিয়াকে লক্ষ্য করছিল, অন্যদের কথা কানে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল না। টুপিটা মাথার পেছনদিকে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল ও।

'আচ্ছা দেখা যাবে কে কার ছবি খেঁচে। তা, সে আচে কোন ঠেঁয়ে?' বলে ফের মাথার টুপিটা যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

'কোন ছোঁড়া আবার?'

'ওই তোমাদের ইঞ্জিনিয়ার গো।'

'আজ সে এখেনে আসে নাই।'

'বুদ্ধিজীবীদের আমি বাঁ-হাতে শায়েস্তা করনেওয়ালা।'

ট্যাঙ্গো নাচ শেষ হল এতক্ষণে।

পাশ্‌কা এবার নাস্তাসিয়ার কাছে গেল। বলল:

'তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাও নাই।'

'কী কথা?'

'আজ আমি তোমারে ঘরে পেঁাছে দিচ্চি তো?'

'আমি একাই বেশ যেতে পারব। ধন্যবাদ।'

ওর পাশে বসল পাশ্‌কা। বেড়ালের মতো গোল-গোল চোখদুটো তার আবার গভীর হয়ে এল। বলল:

'এস, ভদ্দরলোকের ভিত্‌রি যেমন হয় তেমনি এর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলা যাক...'

'ওহ্‌, ভগমান!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল নাস্তাসিয়া, তারপর হলঘরের অপর প্রান্তে চলে গেল।

পাশ্‌কা ওর যাওয়া তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল... চারপাশ থেকে সহানুভূতিসূচক চুক-চুক শব্দ শুনেও লজ্জা পেল না ও। কেবল পাকস্থলীর গভীরে কোথায় যেন একটা যন্ত্রণার বোধ, একটা তপ্ত খোঁচা-খাওয়ার অনুভূতি টের পাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লাববাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল ও।

পরদিন সন্ধেবেলা আরও বেশি ফ্যাশনদুরস্তভাবে সাজসজ্জা করল পাশ্‌কা। এমব্রয়ডারি-করা একখানা কামিজ প্রোখরভের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ট্যাস্‌ল্‌ওয়ালা নীল সিল্কের একটা কাপড়ের কোমরবন্ধ তার ওপর বাঁধল। নিচে পরল ঘন নীলরঙের একটা কর্ডের ব্রিচেস আর গায়ে চাপাল মিহি পশমী একখানা জ্যাকেট। তারপর গিয়ে দেখা দিল স্থানীয় লাইব্রেরিতে। (নাস্তাসিয়া-যে লাইব্রেরিয়ান এটা ও সময়মতো খোঁজ করে আগেই জেনে নিয়েছিল।)

যে-বড় ঘরখানা একই সঙ্গে গাঁয়ের লাইব্রেরি আর রিডিং রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল সেখানে ঢুকে মনের বেশ জোর রেখেই সে বলল, 'শুভসন্ধ্যা!'

অপর একটি ছোকরা বাদে ঘরখানায় নাস্তাসিয়া একাই ছিল। ছোকরাটি একটা পড়ার টেবিলে বসে একখানা ছবির পত্রিকার পাতা ওল্‌টাচ্ছিল।

নাস্তাসিয়া প্রতি-নমস্কার জানিয়ে যেন ও অনেকদিনের পরিচিত এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

নাস্তাসিয়ার কাউন্টারের কাছে এগিয়ে গেল পাশ্‌কা, তারপর মেয়েটার দিকে একেবারেই নজর না-দিয়ে ধীরেসুস্থে ওখানকার বইগুলো দেখতে লাগল। যে-ছোকরা পত্রিকা পড়ছিল সে-ই যে নাস্তাসিয়ার প্রণয়ী এটা ও আন্দাজ করেছিল।

'কিছু পড়তে চাও?' নাস্তাসিয়া শুধোল। পাশ্‌কা-যে ওকে চিনতে পারে নি এতে কিছুটা অবাকই হয়েছিল ও।

'বোঝলেন, আমার প্রেয়জন...'

'কী আপনার প্রেয়জন বলেন?' অন্যমনস্কভাবে নাস্তাসিয়া 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' ধরল।

'মার্কসের "পুঁজি" বইখানা চাই। বইখানার শেষ চ্যাপ্টারটা আমি শেষ করে উঠতে পারি নাই কিনা, তাই।'

শুনে অপর ছোকরাটি পত্রিকাখানা সরিয়ে রেখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

নাস্তাসিয়া হেসে উঠতে যাচ্ছিল প্রায়, কিন্তু পাশ্‌কার কঠোর মুখের চেহারা দেখে কী ভেবে যেন সামলে নিল নিজেকে।

'আপনার পদবি?'

'খল্‌মান্‌স্কি পাভেল ইয়েগোরিচ। জন্ম — ১৯৩৫ সালে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ড্রাইভার-মেকানিক।'

নাস্তাসিয়া যখন এসব লিখে নিচ্ছিল পাশ্‌কা ততক্ষণ তার অজান্তে আড়চোখে দেখছিল তাকে। তারপর সে ফিরে তাকাল... দেখল, এঞ্জিনিয়রটিও তাকে লক্ষ্য করছে। ওদের চোখোচোখি ঘটে গেল। আর এক-মুহূর্তের জন্যে মনের জোর হারাল পাশ্‌কা... তারপর ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল:

'আমরা ধাঁধার উত্তর খুঁজচি, তাই-না?'

প্রথমটায় কী-যে জবাব দেবে ভেবে পেল না এঞ্জিনিয়র-ছোকরা। পরে বলল:

'হুঁ... তুমি দেখছি গভীর জলের মাছ।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা। গেন্না, ও-ও কিন্তু মস্কো থেকে এয়েচে,' নাস্তাসিয়া পরিচয় করিয়ে দিল।

'তাই নাকি? সত্যি?' গেন্না সত্যিসত্যিই খুশি হয়ে উঠল। 'কবে মস্কো ছেড়েছেন আপনি? তারপর, ওখানকার খবর কী।'

সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব না-দিয়ে পাশ্‌কা লাইব্রেরির কার্ডে নিজের নামসইয়ের জন্যে দরকারের চেয়ে বেশি সময় নিতে লাগল।

এরপর নাস্তাসিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারি মোটা বইখানা পড়ার টেবিলে নিয়ে গিয়ে ধপাস করে ফেলল। পরে গেন্নার দিকে করমর্দনের ভঙ্গিতে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পরিচয় দিল, 'পাভেল ইয়েগোরিচ।'

'গেন্না। দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।'

কয়েকখানা পত্রিকা নিজের দিকে টেনে নিয়ে পুরনো কথার জের টেনে পাশ্‌কা বলল, 'মস্কোর খবর জানতে চাচ্ছিলেন, তাই-না? তা, মস্কোয় হৈচৈ-হুড়োহুড়ি চলচে যথাপূর্বং। হৈচৈ-হুড়োহুড়ি চলচে তো চলচেই...' এঞ্জিনিয়রটিকে সামলে ওঠার সুযোগ না-দিয়েই সে বকে চলল, 'মজাদার কার্টুনগুলো দেখতে ভালোবাসি। বিশেষ করে পাঁড় মাতালদের লিয়ে ছবি — ওঃ, ওদের লিয়ে কী সব ছবিই যে আঁকে লোকে!'

'হ্যাঁ, কিছু-কিছু কার্টুন মজার হয় বটে। তা, কতদিন হল আপনি মস্কো ছেড়েছেন?'

'আমি? মস্কো ছেড়েচি'... বলে পত্রিকার পাতা ওল্‌টাল পাশ্‌কা। তারপর বলল, 'বলে জেবনে কোনোদিনই মস্কোয় ছেলাম না তা আবার। মেয়েটি আর কারও সাথে আমারে গুইলে ফেলেচেন।'

'কিন্তু কাল রাত্তিরে ক্লাবঘরে আপনি নিজেই তো অমন কথা বললেন আমারে!' নাস্তাসিয়া প্রতিবাদ জানাল।

শুনে ওর দিকে চোখ গোল-গোল করে তাকাল পাশ্‌কা। বলল:

'কথাটা ঠিকমতন বাজল নি।'

শুনে নাস্তাসিয়া গেন্নার দিকে তাকাল। গেন্না তাকাল পাশ্‌কার দিকে।

পাশ্‌কার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে তখন কার্টুন-ছবিগুলো মন দিয়ে দেখছে।

নাস্তাসিয়া বলল, 'অবাক কান্ড! আমি নিশ্চই স্বপন দেখছিলাম।'

পত্রিকাখানা দেখতে-দেখতেই পাশ্‌কা সায় দিল। বলল, 'তা হতেও পারে।' তারপর গেন্নার হাতে কাগজখানা দিয়ে বলল, 'এই ছবিখান দেখেন — বুড়া দমবাজ একজনা। মাইরি, কেমন দেখতে লাগচে? অ্যাঁ?'

গেন্না হাসল। বলল:

'আপনি কি বীজবোনার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন?'

'তাই বটে,' বলে পাশ্‌কা ঘুরে নাস্তাসিয়ার দিকে তাকাল। নাস্তাসিয়া ওকে কৌতূহল নিয়ে দেখছিল। ওর কৌতূহল পাশ্‌কার চোখ এড়াল না। এঞ্জিনিয়র-ছোকরার দিকে ফিরে সে বলল, 'কী, একদান ড্রাফ্‌ট্‌স খেলা চলবে না কী?'

'ড্রাফ্‌ট্‌স? কেন, দাবা খেলতে দোষ কী?'

'দাবা খেলতে বড্ড বেশি সময় লাগে,' বলল পাশ্‌কা (আসলে ও দাবাখেলা জানত না)। 'বড্ড বেশি মাথা ঘামাতে হয় খেলা নিয়ে। কিন্তু ড্রাফ্‌ট্‌স — ধর্‌ তক্তা মার্‌ পেরেক, ব্যাস কেল্লা ফতে!'

'ঠিক আছে, ড্রাফ্‌ট্‌সই খেলা যাক তাহলে,' রাজি হয়ে গেল গেন্না। তারপর নাস্তাসিয়ার দিকে তাকাল।

নাস্তাসিয়াও তার কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে ওদের কাছে বসল।

পাশ্‌কা শুধোল, 'আমরা কি ঝাপট মেরে খেলব?'

'সে আবার কী?'

'অর্থাৎ, ঘুঁটি মারার সুযোগ পেয়ে না-মারলে যে-ঘুঁটি দে মারা যেত, সেটা তুলে নেয়া হবে,' নাস্তাসিয়া বুঝিয়ে বলল।

'হুঁহুঁ... ঠিক আছে, ঝাপট মেরেই খেলা যাক।'

দ্রুত-হাতে পাশ্‌কা বোর্ডের ওপর ঘুঁটিগুলো সাজিয়ে ফেলল, তারপর বোর্ড থেকে শাদা-কালো দুটো ঘুঁটি তুলে নিয়ে পেছনদিকে আড়াল করল।

'বলেন দেখি, কোন হাত?'

'বাঁ-হাত।'

'না, আপনের দান পড়ল না।' পাশ্‌কাই প্রথম দান চালল।

'এইভাবে শুরু করা যাক তাইলে,' বলে যুত করে চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসল সে। মুখে ফুটে উঠল একটা ধূর্ত, আত্মসন্তুষ্ট ভাব। তারপর নাস্তাসিয়াকে শুধোল, 'এখেনে নিশ্চই সিগ্রেট খাওয়ার নিয়ম নাই?'

'না, নিশ্চই না।'

'বহুত্‌ আচ্ছা, এইবার!' ড্রাফ্‌ট্‌স-বোর্ডে পাশ্‌কা দ্বিতীয় দান চালল। 'এইবার — ফরাসিরা যেমন বলে তেমনি — মজাখান হবে-নে সুপারক্রোম্যাটিক।'

দেখা গেল এঞ্জিনিয়র ছোকরা মোটেই যুতের খেলোয়াড় নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এটা ধরা পড়ে গেল। নাস্তাসিয়া তাকে দান চালার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে শুরু করল। কিন্তু দেখা গেল এতে এঞ্জিনিয়রটির প্রবল আপত্তি।

'দাঁড়াও-দাঁড়াও, এক-মিনিট! সব গোলমাল হয়ে গেছে... আচ্ছা, তুমি আমাকে দান বলে দিচ্ছ কেন বল তো?'

'তুমি আগাগোড়া ভুল চাল চালচ, তাই! আবার কেনে?'

'তা, ভুল চাল চালছি তো হয়েছে কী? খেলছি তো আমি, নাকি?'

'না, হবে আর-কী! তবে খেলাটা তোমার শেখা উচিত।'

পাশ্‌কা তখন মুখ টিপে হাসছে। আর দান চেলে চলেছে দ্রুত আর নিশ্চিত ভঙ্গিতে।

'এবার ওইটা-ওইটা... ওই ওধারের ঘুঁটিটা, গেন্না,' ফের আবার দান বলে না-দিয়ে কিছুতে পারল না নাস্তাসিয়া।

'নাঃ, এভাবে আর খেলা যায় না!' তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠল গেন্না। বলল, 'আমি ঠিক ওই ঘুঁটিটাই চালতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আমি কিছুতেই ওটা চালব না — কিছুতে না।'

'বোকা কোথাকার! এ-নিয়ে অত মাথা-গরম করার কী আচে?'

'নিশ্চয়ই, মাথা-গরম হয় বৈকি!'

'না-না, মাথা-গরম করা স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে ক্ষতিকর,' পাশ্‌কা মাঝ থেকে ফোড়ন কাটল। তারপর নাস্তাসিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। লাল হয়ে উঠল নাস্তাসিয়া। বলল:

'এখন তোমারে হারতে লাগবে — কিছুতেই পার নাই।'

'না-না, হারবে কেনে? এখনও আমারে ছবি খেঁচার অঢেল সুযোগ আচে ওর,' অনুকম্পাভরে বলল পাশ্‌কা। 'আচ্ছা, এবার রাজা মারলাম। চালো দেখি — তোমার দান এবার।'

'যাঃ এবার নিঘ্‌ঘাত হারলে তুমি,' হতাশ হয়ে বলে উঠল নাস্তাসিয়া।

গেন্না আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। বলল, 'তোমার নিজের চরকায় তেল দাও দেখি! অসম্ভব ব্যাপার করে তুলেছ। সরো দেখি, সরো!'

নাস্তাসিয়া উঠে পড়ল। নিজের কাউন্টারে ফিরে যেতে-যেতে বলল, 'নিজেরে তুমি আবার ইঞ্জিনিয়ার বল! লজ্জা করে না!'

'কথাটায় খুব-একটা কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় মিলল না। আমার এঞ্জিনিয়র হওয়ার সাথে এর কী সম্বন্ধ?'

'মনে লাগে তার পীরিতি আমারই লাগি,' যেন খানিকটা নিজমনেই গুন্‌গুন গান ধরে দিল নাস্তাসিয়া। তারপর বইয়ের শেল্‌ফগুলোর ফাঁক দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অন্যদিকে চলে গেল।

'আহ্, এরেই কয় নারীজাতি,' কী কারণে যেন মন্তব্য করল পাশ্কা।

এঞ্জিনিয়র-ছোকরা বোর্ডের ওপরকার ঘুঁটিগুলো একসঙ্গে একপাশে সরিয়ে দিল। তারপর ধরা-ধরা গলায় বলল, 'আমিই হেরেছি।'

পাশ্কা বলল, 'চল, বাইরে গিয়ে একটা সুখটান দেয়া যাক।'

'চল।'

করিডরে বেরিয়ে এসে দু'জনে দুটো সিগারেট ধরাবার পর এঞ্জিনিয়র-ছোকরা মনের কথা আর চেপে রাখতে পারল না। বলল, 'ওর এই অভ্যেসটা আমি কিছুতেই বুঝি না। কেন-যে সব ব্যাপারে ওর মাথা গলানো চাই-ই তা কে জানে।'

'ও কিছু না,' পাশ্কা আল্তোভাবে মন্তব্য করল। 'তা, অনেকদিন হল বুঝি?'

'কী?'

'না, বলছিলাম কী, এখেনে তোমার অনেকদিন হল বুঝি?'

'তা, একমাসের ওপর হল বৈকি।'

'বে করতে চাও?'

শুনে এঞ্জিনিয়র একদৃষ্টে পাশ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল: 'ওকে? হ্যাঁ, তা চাই বৈকি। হঠাৎ ওকথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'ঘাবড়িও না। মেয়েটা ভালোই। তা, ও তোমারে ভালোবাসে তো?'

এঞ্জিনিয়র কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। বলল:

'আমাকে ভালোবাসে কিনা?... হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।'

হঠাৎ দু'জনে চুপ করে গেল। সিগারেট টানতে-টানতে পাশ্কা সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল। হঠাৎ কেশে গলা ঝেড়ে এঞ্জিনিয়র শুধোল, 'তুমি সত্যিই "পুঁজি" বইখানা পড়ছ নাকি?'

'মনেও ভেবো না তা,' বলে পাশ্কা হেলাফেলায় সিগারেটটা ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে দিয়ে ভুরু কোঁচকাল। তারপর হাত-দু'খানা কোমরবন্ধের মধ্যে ঢুকিয়ে দক্ষ হাতে কামিজটা টান-টান করে নিল। পরে বলল, 'বায়স্কোপ দেখতে গেলে কেমন হয়?'

'আজ সন্ধেয় কোন ফিল্ম হচ্ছে?'

'শুনলাম একখান কমেডি-পিকচার চলচে।'

'তা, যাওয়া যেতে পারে।'

'তাইলে... ওরেও ডেকে নে চল,' বলে পাশ্‌কা লাইব্রেরির দরজার দিকে মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিত করল আর মুখখানাতে সহানুভূতি মাখিয়ে রাখল।

এঞ্জিনিয়র সায় দিল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' তারপর আন্তরিকভাবেই বলল, 'আমি ঘরে গিয়ে ওর সাথে কথা বলব।'

'যাও, তাইলে।'

এঞ্জিনিয়র ঘরের ভেতর ঢুকল আর পাশ্‌কা বাইরে বেরিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে সি'ড়িতে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

...সিনেমা-হলে ওরা তিনজন একসঙ্গে বসল। নাস্তাসিয়া বসল মাঝখানে।

হলের আলো নিবে যাওয়ামাত্রই পাশ্‌কা নাস্তাসিয়ার কাছ ঘে'ষে এসে তার একখানা হাত ধরল। নাস্তাসিয়া নিঃশব্দে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে বসল একটু। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে পাশ্‌কা সামনে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল। মিনিট দশেক পরে সে আবার সাবধানে অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মেয়েটার হাত খু'জতে লাগল। হঠাৎ ওর দিকে ঝু'কে পড়ে নাস্তাসিয়া কানে-কানে ফিস্‌ফিস করে খুব শান্তভাবে বলল, 'আমারে থাবা মারা যদি বন্ধ না-কর তাইলে কিন্তু আমি সবার সামনে চে'চাব।'

শুনে সঙ্গে সঙ্গে পাশ্‌কা তার হাতখানা সরিয়ে নিল।

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে রইল সে। তারপর নাস্তাসিয়ার দিকে হেলে পড়ে সে-ও কানে-কানে বলল, 'স্‌প্লিন্টার-ভরা গ্রেনেডের মতন আমার বুকখান যেন ফেটে যাচ্চে।'

শুনে ভারি নিঃশব্দে হাসল নাস্তাসিয়া। পাশ্‌কা ফের ওর হাত ধরার চেষ্টা করল। নাস্তাসিয়া এবার গেন্নার দিকে ফিরে বলল:

'আমারে তোমার জায়গায় বসতে দাও দিকি।'

'সামনের লোকটা মাথা দিয়ে আড়াল করচে বুঝি?' বলে পাশ্‌কা তাড়াতাড়ি হে'কে বলল, 'হেই কমরেড, মাথাটা একটু সরান দিকি!'

শুনে সামনের সারিতে-বসা কমরেডটি মাথাটা 'সরিয়ে নিল'।

'এখন ঠিক হয়েচে তো?'

'ঠিক হয়েচে,' জবাব দিল নাস্তাসিয়া।

হলের দর্শকরা বেশ গোলমাল করছিল সেদিন। থেকে-থেকেই প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ছিল তারা।

হঠাৎ ঘাড় গু'জে নিচু হয়ে বসে পাশ্‌কা একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল,

তারপর তাড়াতাড়ি দমকে-দমকে সুগন্ধি ধোঁয়া টানতে লাগল। প্রোজেকটরের আলোয় সিগারেটের নীলচে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে দেখা গেল একসময়। নাস্তাসিয়া কনুই দিয়ে পাশ্‌কার পাঁজরায় একটা খোঁচা দিল। বলল:

'করচ কী?'

শুনে সিগারেট নিবিয়ে ফেলল পাশ্‌কা। এর কয়েক মুহূর্ত পরে অন্ধকারে নাস্তাসিয়ার হাতখানার নাগাল পেয়ে গেল সে। সজোরে একবার তাতে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল, তারপর উঠে নিচু হয়ে বেরুবার দরজার দিকে এগোতে লাগল।

গেন্নার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বলল, 'এ-ছবি কেবল বাঘের দেখার যুগ্যি।'

বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে পাশ্‌কা কামিজের কলার আল্‌গা করে দিল, তারপর সিগারেট ধরাল... পায়ে-পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরল সে।

বাড়ি ফিরে জামা-জুতো না-খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

প্রোখরভ শুধোলেন, 'কী ব্যাপার, অমন মনমরা কেনে?'

'না, তেমন কিছু না...' পাশ্‌কা বলল। কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকার পর হঠাৎ সে শুধোল, 'আমি ভাবচি লোকে এখনও নারীহরণ করে কিনা?'

'তার মানে?' শুধোলেন প্রোখরভ।

'যেমন সেকালের দিনে লোকে করত। তখন অমনধারা রেওয়াজ ছিল, তাই-না?'

'অ, তাই কও! তা, আমি শালার কী জানি তার! কিন্তু চুরি করার দরকারটা কী? আমার তো মনে নেয়, অরা এমনিতেই একঠ্যাঙে রাজি হয়ে আচে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমি এমনিই ভাবছিলাম আর-কি,' পাশ্‌কা বলল। তারপর আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের শুধোল, 'তা, কী বলেন, মেয়েচুরির জন্যে আইনে শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নাই নিশ্চই?'

'নাই বলেই তো মনে নেয়। তবে আমি ঠিক জানি না।'

বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল পাশ্‌কা। কী একটা নিয়ে যেন ও ভীষণ চিন্তিত বলে মনে হল।

'এ-জেবনে তুমি একবারই হবে অষ্টাদশী,' হঠাৎ গান ধরে দিল ও। তারপর

বলল, 'ঠিক আচে, ইয়েগোরিচ। এই রইল আপনের কামিজ,' বলে ইংরেজিতে যোগ করে দিল, 'স্যাঙ্ক্ য়ু!'

'বলি, ব্যাপার কী তোর?'

'কিছু না, কিছু না,' বলতে-বলতে পাশ্‌কা প্রোখরভের এমব্রয়ডারি-করা কামিজটা টেনে খুলে নিজেরটা গায়ে চড়াল... কী যেন ভাবতে-ভাবতে ঘরের মাঝখানটায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর বলল, 'ইয়েগোরিচ, আহা ছবি-ছবি!'

'তুই কোনো ছুঁড়িরে চুরি করতে চাস না কী, ক' দেখি?' শুধোলেন প্রোখরভ।

শুনে পাশ্‌কা হাসল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। এরপর ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও।

বাইরে তখন ন্যাকড়াভেজা অন্ধকার রাত। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সবকিছু থেকে জল ঝরছে টুপটাপ করে। এদিক-ওদিক গাঁয়ের কুকুরগুলো ডাকাডাকি করছে। কোথা থেকে যেন একটা মোটর-এঞ্জিন চলার সজোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

যেখানে তার লরিটা রাখা ছিল সেই ট্রাক্টর-মেরামতি ডিপোয় গেল পাশ্‌কা।

ডিপোর উঠোনে ঢুকতেই একটা গলা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাঁক পাড়ল।

'বন্ধু,' বলে সাড়া দিল পাশ্‌কা।

'কোন বন্ধু?'

'খল্‌মান্‌স্কি।'

শুনে বুড়ো পাহারাওলা আলোর বৃত্তটার মধ্যে এসে দাঁড়াল। ভেড়ার চামড়ার লম্বা ঝুলওয়ালা কোট পরনে, পিঠের ওপর খাড়া-করা বন্দুক।

'কী, কোনো ঠেঁয়ে যেতে নাগবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'বিড়িটিড়ি কিছু আচে সঙ্গে?'

'আচে।'

দু'জনে সিগারেট ধরাল ওরা।

হাই তুলে বুড়ো বললে, 'মনে লিচ্ছে, আরও খানিক বিষ্টি হবে। এমন বিষ্টিতে ঘুম এসে যায়, চোখের পাতা জুড়ে আসে যেন।'

'তাইলে ঘুমান-না কেনে,' পাশ্‌কা পরামর্শ দিল।

'না, নিয়ম নাই। এখ্নি ঘ্ম এসে গেছিল, এমন সময় গাড়িখান এসে পড়ল...'

বাচাল ব্ড়োর কথায় বাধা দিয়ে পাশ্‌কা বলল:

'ঠিক আচে, ঠিক আচে, খ্ড়ো। আমার আবার তাড়া আচে কিনা।'

'তাইলে কেটে পড়্, যা!' বলে ব্ড়ো ফের হাই তুলল।

লরিতে স্টার্ট দিয়ে পাশ্‌কা ডিপোর উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নাস্তাসিয়া কোথায় থাকে তা জানত ও। ওকে যেতে হবে নদীর ধারের রাস্তায়, খাড়াই পাড়টার অপর দিকে।

ওইদিন বিকেলবেলাতেই প্রোখরভের সঙ্গে কথা বলার সময় চেয়ারম্যান-সায়েব ওকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্‌কার মনে ছিল যে বাড়ির বসবার ঘরখানার জানলাগ্লো বাগানের দিকে ম্খ-করা।

একটিমাত্র প্রশ্নই তখন ওকে বিচলিত করে তুলেছিল। তা হল, প্লাতোনভদের কোনো পোষা কুকুর আছে, না নেই?

রাস্তাঘাটে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। এমন দ্র্যোগ যে এমন কি প্রেমিকয্গলরাও ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। পাছে কাদায় কোথাও গাড়ির চাকা বসে যায় এই ভয়ে আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল পাশ্‌কা।

নাস্তাসিয়ার বাড়ির কাছাকাছি এসে গাড়ি দাঁড় করাল ও, তারপর ক্যাবিন থেকে নামল। তবে গাড়ির এঞ্জিন চাল্ রেখে দিল।

'এইবার ঝামেলা শ্র্,' নিচুগলায় কথাগ্লো বলে হাতের চেটো দিয়ে নিজের ব্কখানা পাশ্‌কা ঘষে নিল একবার। ভারি নার্ভাস বোধ করছিল ও।

বাড়িটার কোথাও কোনো আলো জ্বলছিল না। অন্ধকারে চোখদ্টো অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর গাছের ন্যাড়া ডালপালার ফাঁক দিয়ে সামনের ঘরখানার জানলায় শার্সির অস্পষ্ট ঝিলিক দেখতে পেল পাশ্‌কা। ওর ব্কখানা সজোরে ধড়ফড় করে উঠল।

'না, কুকুর নেই। ওদের কুকুর থাকাটা উচিত হবে না।'

একবার কাশল, তারপর বেড়াটা ধরে সাবধানে ঝাঁকুনি দিল — না, উঠোন থেকে কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। সব চুপচাপ। কেবল বাড়ির ছাদ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শ্নতে পাচ্ছে ও।

'তাইলে পাশ্‌কা তৈরি হও — হয় মাথার মধ্যে ব্লেট সেঁধ্বে আর নয়তো...'

নিচু বেড়াটা নিঃশব্দে টপ্‌কে ও জানলাগ্লোর দিকে এগোল। পেছনে

একটু দূরে ওর বিশ্বস্ত বাহনের চাপা গর্‌গর, ওর নিজের পায়ের মৃদু আওয়াজ আর জলের ফোঁটা পড়ার জোর শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। বসন্তের বরফগলা জল বাড়ছে সবদিকেই। মাটির নিচের ঘরের মতো স্যাঁতানো বাতাস।

বাগানের মধ্যে দিয়ে পায়ে-পায়ে এগোতে-এগোতে পাশ্‌কা মনে-মনে অষ্টাদশী নিয়ে সেই গানটা গেয়ে চলেছে। ঘুরেফিরে গাইছে কেবল ওই একটাই লাইন: 'এ-জেবনে তুমি একবারই হবে অষ্টাদশী।' ওইদিন সকাল থেকে সারাদিন ও কেবল ওই গানটাই গাইছে।

যখন বাড়ির জানলাগুলোর পাশে এসে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ ওর পায়ের নিচে সজোরে মটাস করে একটা শুকনো ডাল ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে যেন জমে গেল ও। নাঃ, চারিদিক নিস্তব্ধ। বৃষ্টির ফোঁটার টুপটাপ আওয়াজ শুধু। আরও দু'পা এগিয়ে পাশ্‌কা বাড়ির সামনের দুটো জানলার ফাঁকটাতে দাঁড়াল। দম নেবার জন্যে থামল একটু।

এখন একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, 'বসবার ঘরে নাস্তাসিয়া কি একা ঘুমোচ্ছে?'

পকেট থেকে টর্চ বের করে সুইচ টিপে জ্বালিয়ে একটা জানলার কাচে আলোটা ফেলল। হলুদ আলোর বৃত্তটা ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের উলটোদিকের দেয়ালে আর অন্ধকারের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে লাগল নানা ধরনের জিনিস। যথা, টালি-লাগানো বড় একটা চুল্লি, একটা দরজা, একটা বিছানা... কেঁপে-কেঁপে হঠাৎ আলোর বৃত্তটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। বিছানাটায় কে যেন নড়ল বলে মনে হল। বালিশ ছেড়ে একটা মাথা উঁচু হল — আরে, এ-যে নাস্তাসিয়া! বোঝা গেল, নাস্তাসিয়া ভয় পায় নি। আল্‌তোভাবে লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে রাত্রিবাস-পরা অবস্থাতেই সে জানলায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে টর্চটা নিবিয়ে দিল পাশ্‌কা।

আগলদুটো ঠেলে খুলে ফেলল নাস্তাসিয়া, তারপর জানলাটা খুলল।

উষ্ণ ঘুমঘুম একটা হাওয়ার স্রোত বেরিয়ে এল ঘরটা থেকে।

'কী ব্যাপার?' ফিস্‌ফিসিয়ে শুধোল নাস্তাসিয়া। ওর গলায় নিস্পৃহ সুর শুনে সাবধান হল পাশ্‌কা।

ও কী পাশ্‌কাকে চিনতে পেরেছে? কে জানে! পাশ্‌কা চাইল, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ওকে অন্যজন বলে ভুল করুক নাস্তাসিয়া। ও চুপ করে রইল।

এবার জানলা থেকে সরে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল নাস্তাসিয়া। পাশ্‌কা ফের স্যুইচ টিপে টর্চ জ্বালাল। নাস্তাসিয়া ঘরের দরজার কাছে গিয়ে শক্ত করে দরজা বন্ধ করে দিল, তারপর ফের জানলার কাছে ফিরে এল। পাশ্‌কাও সঙ্গে সঙ্গে টর্চ নিবিয়ে দিল।

বোঝা গেল, ও পাশ্‌কাকে চিনতে পারে নি। পারলে কখনোই শুধুমাত্র রাতের অন্তর্বাস পরে এভাবে ঘুরে বেড়াত না।

এবার জানলায় হেলান দিয়ে বাইরে মুখ বাড়াল নাস্তাসিয়া। ওর মুখখানা এত কাছে এসে গিয়েছিল যে পাশ্‌কা ওর চুলের সুগন্ধ টের পাচ্ছিল পর্যন্ত। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের উষ্ণ বাষ্পে চোখ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল পাশ্‌কার। ও তাড়াতাড়ি নাস্তাসিয়াকে ঠেলে সরিয়ে জানলা দিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

'শেষকালে এই ছিল তোমার মনে?' নাস্তাসিয়া বলল। এবার ওর গলায় যেন আরও একটু অন্তরঙ্গতার সুর।

'ঠিক এইটাই মনে ছেল আমার,' মনে-মনে ভাবল পাশ্‌কা। 'তবে ঝামেলা যা বাধবার এইবারই বেধে যাবে-নে।'

জানলা গলিয়ে ঢুকে পাশ্‌কা যখন ওর পাশে এসে দাঁড়াল তখন নাস্তাসিয়া বলল, 'পা-দুটো পুঁছে নিলে ভালো হোত-না?'

তখনও কিছু বলছে না পাশ্‌কা। হঠাৎ ও নাস্তাসিয়াকে দু'হাতে জাপটে ধরল — নাস্তাসিয়ার উষ্ণ কোমল দেহটাকে, তারপর ওকে পিষতে লাগল এত জোরে যে নাস্তাসিয়ার অন্তর্বাসের একটা ফিতে ছিঁড়ে গেল।

'উঃ,' নিশ্বাস নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে-করতে নাস্তাসিয়া অস্ফুটে বলে উঠল। 'করচ কী, অসভ্য কোথাকার?'

পাশ্‌কা ওকে প্রাণপণে চুমু খেতে শুরু করল... আর তখন হঠাৎ কী যেন টের পেয়ে গেল নাস্তাসিয়া। সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছট্‌কে দূরে সরে গেল সে, তারপর আলোর স্যুইচটার সন্ধানে পাগলের মতো দেয়াল হাতড়াতে লাগল।

চরম কেলেঙ্কারির জন্যে নিজেকে তৈরি করতে-করতে পাশ্‌কা এবার মনে-মনে বলল, 'যাঃ, সব ফুইরে গেল! মেয়েটা এবার নিঘ্‌ঘাত চিচ্‌কার শুরু করে দেবে, ওর বাপ এসে পড়বে আর তারপর পাশ্‌কারে "ছবি" করে সেঁটে দেবে-নে।' সাবধানের মার নেই মনে করে ও পিছু হেঁটে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরের আলো জ্বলে উঠল... নাস্তাসিয়া প্রথমটায় এমনই হতভম্ব হয়ে

পড়েছিল যে সে-যে অপর এক পুরুষের সামনে প্রায় নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তা মনেই ছিল না তার।

পাশ্‌কা ওর দিকে তাকিয়ে নরম করে হাসল। বলল:

'কী, ডর লেগেচে বুঝি?'

একটা চেয়ারের ওপর থেকে ছোঁ মেরে স্কার্টখানা টেনে নিয়ে নাস্তাসিয়া তাড়াতাড়ি সেটা পরতে লেগে গেল। তারপর পাশ্‌কার সামনে এসে দাঁড়াল... আর কিছু-একটা ভেবে ওঠবার আগেই পাশ্‌কা তার বাঁ-গালের ওপর সজোর একখানা চড়ের ঘা অনুভব করল। তারপর আরও একখানা — এবার ডান গালে।

কিছুক্ষণ দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল, একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে। রাগে নাস্তাসিয়ার গালদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। ওই মুহূর্তে তাকে দেখতে লাগছিল অপরূপ সুন্দর।

পাশ্‌কা না-ভেবে পারল না, 'এঞ্জিনিয়র-ছোকরা সত্যিই ভাগ্যবান।'

'এখুনি বেইরে যাও,' শান্তভাবে বলল নাস্তাসিয়া।

পাশ্‌কা বুঝল নাস্তাসিয়া চেঁচামেচি করার পাত্রী নয় — সে-ধরনের মেয়েই নয় ও।

'ব্যাপারটার একটা ফয়সলা করে নেয়া যাক, ভদ্দরলোকের মতন,' বলল পাশ্‌কা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ফের বলল, 'আমি চলে যাব বৈকি, তবে কিনা সেটা নেহাতই শাদামাটা ব্যাপার হবে। দুব্বল ব্যাপার।' দেশলাই-কাঠিটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে নিজের এই কথাটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল ও। তবে কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই ভাববার চেষ্টা করল, কেননা ভয় ছিল নাস্তাসিয়া হয়তো এরপর ভারি কিছু হাতে তুলে নিয়ে ওর পুরনো হুকুমেরই পুনরাবৃত্তি করবে। এই ভয়ে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে না-থেকে ও ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা শুরু করে দিল — জানলা থেকে টেব্‌লের কাছে, ফের টেব্‌ল থেকে জানলায়। আর বলতে লাগল, 'বুইলে কিনা, আমি ভালোবেসে ফেলেচি। সত্যি-সত্যি। দর-বাড়ানো কথা নয়। তবে একটা জিনিস আমি ঠিক ধরতে লারচি: ওই ইঞ্জিনিয়ার-ছোঁড়ার এমন কী আচে যা আমার নাই? ইচ্ছা করলে আমি দুই তুড়িতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর বনতে পারি, বুইলে কিনা। একবার তুমি শুধু মুখ ফুটে কথাটা বললেই হয়। তাইলে? এত ঝুট-ঝামেলা পাকিয়ে লাভ কী? জিনিসপত্তর বরং বাঁধাছাঁদা করে লাও, চল আমরা কেটে পড়ি। শহরে গিয়ে বাসা বাঁধব

দু'জনায়।' হঠাৎ কথা থামিয়ে গম্ভীর মুখে, চোখের পলক না-ফেলে নাস্তাসিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল পাশ্‌কা। নাস্তাসিয়াকে ও ভালোবেসে ফেলেছে, এত ভালো বুঝি জীবনে আর কাউকে কখনও বাসে নি। নাস্তাসিয়ারও বুঝতে বাকি রইল না তা।

'তুমি এত হাবাগবা কেনে?' সখেদে, নিতান্ত সরলভাবে বলল নাস্তাসিয়া। 'বুইতে পার না এটা কত অর্থহীন ব্যাপার?' এবার একখানা চেয়ার টেনে বসল ও। বলল, 'এমন একখান কাণ্ড বাধিয়ে এখন এয়েচে যুক্তি করতে। আমারে নাকি ভালোবাসে!..' অস্বাভাবিক ধরনে চোখদুটো পিটপিট করে এবার মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল মেয়েটা। পাশ্‌কা বুঝল, ও কাঁদছে। 'তুমি বলচ যে তুমি নাকি ভালোবাস। কিন্তু আমিও-যে আর কাউরে ভালোবাসতে পারি এয়া তোমার মাথায় ঢোকে না কেনে?' বলে জলভরা চোখ নিয়ে নাস্তাসিয়া এবার পাশ্‌কার দিকেই মুখ ফেরাল।

এখন ওকে সত্যিই সুন্দর, আশ্চর্যরকম সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর ঠিক ওই মুহূর্তে পাশ্‌কা বুঝল যে মেয়েটা কোনোদিনই তার হবে না। সর্বদা এমনটাই ঘটে এসেছে তার বরাতে। যখনই কোনো মেয়েকে গভীর আর আন্তরিক হতে দেখেছে, তখনই ও বুঝেছে যে সে আর ওর হবার নয়।

'তা, এত কান্না কিসের?'

'কাঁদব না কেনে? তোমরা খালি নিজেদের কথাই ভাবো... সব্বাই স্বার্থপর তোমরা। বুইলে, ও আমারে ভালোবাসে!' চোখের জল মুছে ফের বলল নাস্তাসিয়া, 'সত্যিই যদি তুমি আমারে ভালোবাস, তাইলে আমারে অন্তত কিছুটা মর্য্যেদা দেয়া উচিত তোমার। এমনটা করা উচিত হয় নাই...'

'কেনে, কী আবার করলাম? জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেচি — তা, তাতে হয়েচেটা কী! সব্বদা অমনধারাই তো করে থাকে লোকে...'

'না-না, তা না। তোমরা সব্বাই বিষম হাবাগবা, এইটাই হল কথা। ও-ও একটা গবা — তোমারে দেখে হিংসের ঠেলায় খেপে উঠেচে একবারে... বলচে, ও নাকি এখেনে থাকবে না, অন্যত্তর চলে যাবে।'

'চলে যাবে? কোন চুলোয়?' এই হাবাগবাটি যে কে পাশ্‌কা তা বুঝেছিল।

'কোন চুলোয়?.. ওরেই বরং জিজ্ঞেসা কর কেনে!'

শুনে ভুরু কোঁচকাল পাশ্‌কা। বলল:

'সত্যি বলচ?'

হাতের তেলো দিয়ে ফের একবার চোখ মুছল নাস্তাসিয়া, কিছু বলল না।

ওর প্রতি মমতায় পাশ্‌কার বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

এবার সে হুকুম জারি করল, 'লাও, তৈয়ের হও!'

অবাক হয়ে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল নাস্তাসিয়া।

পাশ্‌কা বলল, 'আমরা গাড়ি চাইল্যে ওর বাসায় যাব। মানুষের ভালোবাসা যে কী বস্তু তা মস্কোর এই বিড়ালছ্যানারে শিক্ষে দেয়া লাগবে।'

'না, আমরা কোনো ঠেঁয়েই যাব না... তোমার ওই হামবড়াই রাখ দেখি।'

'দ্যাখো, সোন্দরী...' পাশ্‌কা এবার টানটান সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আমি তোমারে আমার গালে চড় কষাতে দিছি, তাই তো? কিন্তু তাই বলে এমন আজেবাজে কথা আমি সহ্যি করব না, হ্যাঁ! হামবড়াই রাখ বলতে কী বোঝাতে চাও, শুনি?'

'এত রাত্তিরে কোন ঠেঁয়ে যেতে চাও তাই শুনি?..'

'রাত্তির-ফাত্তির কে কেয়ার করে? যা বলতেছি শোন, পোশাক পরে লাও। এই লাও তোমার ব্লাউজ!'

চেয়ারের ওপর থেকে একটা ব্লাউজ ঝট্‌কা মেরে তুলে নাস্তাসিয়ার দিকে ছুড়ে দিল সে। ব্লাউজটা লুফে নিয়ে অনিশ্চিতভাবে উঠে দাঁড়াল নাস্তাসিয়া... আর পাশ্‌কা ফের একবার ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিল।

হঠাৎ ও শুধোল, 'কিন্তু ওর হিংসে হল কেনে?' কথাটায় একটু-যে আত্মসন্তুষ্টির সুর না-লাগল এমন নয়।

'কেনে আবার? আমরা-যে একসাথে নাচ করেচি সে-খবরটা কে যেন ওর কানে পেঁৗছিয়ে দেছে। তাছাড়া ও লক্ষ্য করেচে যে বায়স্কোপ দেখতে গিয়ে আমরা কানাকানি করছিলাম। এমনধারা রাম-আহাম্মক ও!'

'তা, তুমি ওরে সকল কথা খুলে বললেই তো পারতে?..'

'কেনে বলব আমি? এঃ, ভারি বয়ে গেচে আমার! না বাপু, আমি কোনো ঠেঁয়ে যাচ্চি না।'

শুনে থমকে দাঁড়াল পাশ্‌কা। বলল:

'আমি তিন পর্যন্ত গোনব। এক, দুই... এরপরই তোমারে চুমো দিতে শুরু করব কিন্তু।'

'ইঃ, চেষ্টা করে দেখ-না একবার!.. তা, তুমি ওরে কী বলবে শুনি?'

'কী বলব তা আমিই জানি!'

'তাইলে আমি তোমার সাথে যাব কেনে?'

'যাবে বৈকি। যেতেই হবে।'

'কেনে? কেনে, শুনি?'

'ও ছোঁড়া যে কোন ঠেঁয়ে থাকে তা আমার জানা নাই। তাছাড়া, যাই হোক-না কেনে তোমারে যেতে লাগবে — এই আমার শেষ কথা।'

নাস্তাসিয়া ব্লাউজ পরে নিল, তারপর জুতো পরল। বলল:

'চল তাইলে। তবে আমি তোমার পিছু-পিছু তফাত রেখে যাব। কেউ যদি আমাদেরে একসাথে দেখে ফেলে এখন তাইলেই চিত্তির...'

ঘরের জানলায় উঠে পাশ্‌কা এবার বাগানে নামল। তারপর নাস্তাসিয়াকেও নামতে সাহায্য করল। পরে দু'জনে হেঁটে রাস্তায় গিয়ে উঠল।

রাস্তায় ট্রাকখানা তখনও প্রভুর অপেক্ষায় নিচুগলায় গর্‌গর করছিল।

'উঠে পড়, ছিঁচ্‌কাঁদুনি কন্যে... ভ্যালা কাজ জুটেচে আমার, তোমাদেরে লোকজনেরে রাত্তিরবেলা এদিক-ওদিক বয়ে লিয়ে যাওয়া।'

তার এই নতুন আর অপ্রত্যাশিত ভূমিকা বেশ উপভোগ করতে শুরু করেছিল পাশ্‌কা।

ট্রাকের ক্যাবিনে উঠে বসল নাস্তাসিয়া। বলল:

'আমারে নিয়ে তুমি ভাগবার মতলব করেছেলে? তাই তো?'

'ইস, কী শখ মাইরি! রওনা দিতে গিয়ে দেখচি আমি বুড়া হয়ে যাব।'

'পাভেল, তুমি-না...'

'কী?' কঠিন সুরে শুধোল পাশ্‌কা।

'না, কিছু না।'

'হ্যাঁ, তাই ভালো।' সশব্দে ট্রাকের গিয়ার ঠেলে গাড়ি ছেড়ে দিল পাশ্‌কা।

...ও যখন এঞ্জিনিয়রের বাসায় গিয়ে জানলায় টোকা দিল, ছোকরা তখনও ঘুমোয় নি। সাড়া দিয়ে বলল:

'কে?'

'আমি।'

'আমি কে?'

'পাশ্‌কা গো। পাভেল ইয়েগোরিচ।'

দরজা খুলে পাভেলকে ঢুকতে দিল এঞ্জিনিয়র... তারপর খোলাখুলি অবাক হয়ে হাঁ-করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোঁকাল পাশ্‌কা। বলল, 'দুঃখের কাব্যি লিখে মনের ব্যথা জানাচ্চ বুঝি?'

'ঠিক বুঝলাম না। কী ব্যাপার বল তো?..'

টেবিলের পাশে বসে পড়ে দুই কনুই দিয়ে কাগজপত্র সরিয়ে দিল পাশ্‌কা। তারপর বলল, 'বুঝবে, বুঝবে। মিনিটখানেকের মধ্যিই বুঝবে। আচ্ছা, তুমি নাস্তাসিয়ারে ভালোবাস, তাই-না?'

'দ্যাখো, সাবধান কিন্তু!..' এঞ্জিনিয়রের মুখখানা দেখতে-দেখতে রাঙা হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি, ভালোবাস। তা, যাও, গিয়ে লিয়ে আস দেখি ওরে — ট্রাকের মধ্যি বসে আচে ও।'

'কোথায়? কোন ট্রাকে?'

'রাস্তায় যে-ট্রাক দাঁইড়ে আছে তার মধ্যি। তবে আমার উপর তোমার হিংসে হওয়া উচিত হয় নাই। ডব্‌কা ছুঁড়ি আমার বরাতে নাই।'

এঞ্জিনিয়র-ছোকরা তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরুল। আর আমাদের পাশ্‌কা, পাভেল ইয়েগোরিচ, মাথাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে চোখ বুজোল। হঠাৎ নিজেকে ভারি ক্লান্ত মনে হল তার। সেদিন সারাটা দিন গানের যে-কলিটা তার মাথায় ঘুরছিল সেটা গুন্‌গুনিয়ে ফের ফিরে এল মাথার মধ্যে: 'এ-জেবনে তুমি একবারই হবে অষ্টাদশী...' বুকের মধ্যে বিশ্রী একটা ব্যথার অস্তিত্ব টের পেল সে।

এমন সময় নাস্তাসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এঞ্জিনিয়র ফিরে এল।

পাশ্‌কা দাঁড়িয়ে উঠল... কিছুক্ষণের জন্যে মনে হল ও যেন বিদায় নেবার আগে বক্তৃতা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

হঠাৎ ও শুধোল, 'ব্যাস? সব ঠিক আচে?'

'সব ঠিক আছে,' এঞ্জিনিয়র বলল।

আর নাস্তাসিয়া — হাসল শুধু।

'ঠিক আচে তাইলে,' চটে উঠে পাশ্‌কা বলল। 'মঙ্গল হোক।' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এঞ্জিনিয়র আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আরে, চললে কোথায়? দাঁড়াও একমিনিট!'

সাড়া না-দিয়ে, একবারও পেছন ফিরে না-তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল পাশ্‌কা।

গ্রামখানা পেছনে রেখে পাশ্‌কা গাড়ি ছোটাল সাল্‌তনের দিকে। আসার আগে প্রোখরভের বাড়ির সদর দরজার নিচে একখানা চিরকুট গংজে রেখে এসেছিল, যাতে ওর তিনদিনের খামারের কাজ বাবদ একরারনামা পাঠানোর জন্যে পরিবহণ ডিপোর ঠিকানা দেয়া ছিল। চেয়ারম্যান-সায়েব ওর এই সিদ্ধান্তে কতখানি মর্মাহত হবেন তা অনুমান করে পাশ্‌কা ওই চিরকুটের নিচে একটা পুনশ্চও যোগ করে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল: 'ক্ষমা করবেন। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।'

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গিয়েছিল পাশ্‌কার। একটার-পর-একটা সিগারেট টেনে চলল সে।

একসময় টিপটিপ করে বৃষ্টি নামল।

সাল্‌তনের ঠিক আগের গাঁ ইগ্রিনেভো'র মধ্যে দিয়ে যাবার সময় রাস্তার ওপর দূরে দুটো মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তারা হাত নাড়তে থাকায় ও কাছে এসে গাড়ি রুখল।

দৌড়ে এগিয়ে এল এক তরুণ ফৌজী অফিসর আর একটি মেয়ে।

'দয়া করে আমাদের সাল্‌তন অবধি যদি পেঁছে দেন!' অফিসরটিকে কী কারণে যেন ভারি হাসিখুশি ঠেকল।

'উঠে পড়েন কেনে।'

মেয়েটি ট্রাকের ক্যাবিনে চড়ে বসল আর বসেই ভারি ছটফট করতে লাগল, নিজের জামাকাপড় ঝাড়তে লাগল ঘনঘন। লেফ্‌টেন্যান্টটি উঠল লরির খোলা পেছনদিকটায়। গাড়িতে উঠেই দু'জনে একে অপরকে চিৎকার করে ডাকাডাকি আর হাসাহাসি করতে লাগল।

পাশ্‌কা একবার আড়চোখে পাশে-বসা মেয়েটিকে দেখে নিল — ভারি সুশ্রী মেয়েটি, শাদা দাঁতের পাটি, গোলাপকুঁড়ির মতো ঠোঁটদুটি, মেয়েরা যতটা সুশ্রী হতে পারে ততটাই! তবে নাস্তাসিয়ার চেয়ে অনেক মাটো।

শুধোল, 'বলি, এত রাত্তিরে যাওয়া হচ্চে কোন ঠেঁয়ে?'

'দেখা করতে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মেয়েটি। তারপর ক্যাবিনের জানলা দিয়ে মাথাটা বাইরে বের করে ছেলে-বন্ধুটিকে ফের হেঁকে বললে, 'সাশা? সাশা!.. ওখেনে বাইরে কেমন লাগচে তোমার?'

'চমৎকার!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললে লেফ্‌টেন্যান্ট।

'সারা দিনমানটা কি যথেষ্ট ছেল না?' মেয়েটিকে ফের জিজ্ঞেস করল পাশ্‌কা।

'কী?' বলে মেয়েটি ওর দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই ফের জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'সাশা? সাশ্!..'

'সব্বাই দেখি পীরিতে হাবুডুবু খাচ্চে,' মনে-মনে গজরাতে লাগল পাশ্কা। 'নিঘ্ঘাত খেপে উঠেচে সব্বাই।' আর নাস্তাসিয়ার কথা ফের মনে পড়ে গেল ওর। এই তো অল্প কিছুক্ষণ আগেই নাস্তাসিয়া ওর পাশে বসে ছিল গাড়িতে — কিন্তু সে ওর নিজস্ব ছিল না। আর এ-মেয়েটাও ওর নয়।

'সাশা! সাশ্!..'

'সাশা! সাশ্!..' পাশ্কা নিজের মনেই ভেংচি কাটল মেয়েটিকে। 'তোমার সাশা এমনিতেই বাতাসে ভর দিয়ে উড়চে। ওরে যদি ছেড়ে দাও তাইলে ও এই ট্রাকের আগে-আগে উড়ে চলে যাবে।'

'আমাদের দেখে ওরা-যে কী বলবে আর না-বলবে তা-ই ভাবচি!' লরির পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল সাশা।

শুনে মেয়েটি হাসিতে রীতিমতো কাঁপতে লাগল।

'বছরের এই সময়টায় লোকের মাথার ঠিক থাকে না দেখচি,' মহা বিরক্ত হয়ে মনে-মনে ভাবল পাশ্কা।

এই সময়ে জোরে বৃষ্টি নামল।

'সাশ্! ওখেনে কেমন বোধ করচ?'

'ঠিক হ্যয়! ঠিকঠাক গাড়িতেই আচি!'

'ওরে কও, ওখেনে বাড়তি একখান চাকার নিচে একখান তের্পল আছে ইচ্ছা করলে তের্পল দিয়ে নিজেরে ঢাকতে পারে,' পাশ্কা মেয়েটিকে বলল।

শুনে মেয়েটি ক্যাবিন থেকে বাইরে এতখানি ঝুঁকে পড়ল যে প্রায় পড়ে যাবার যোগাড়। বলল:

'সাশা! সাশ্!.. ওখেনে বাড়তি চাকার নিচে একখান তের্পল আছে!.. ওখান গায়ে চাপা দাও শিগ্গির!'

'ঠিক আচে! ধন্যবাদ!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই কর,' পাশ্কা বলল। তারপর আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে চোখদুটো নিবদ্ধ করে ভাবনায় ডুবে গেল।



গাঁয়ের মানুষ

...তা হইলে মা আমাদের এখানে একবার আস না কেন? তোমার ছোটবেলার কথা একবার মনে করিয়া দেখ দেখি। আসিয়া একবার আমাদের দেখিয়া যাও-না কেন। এখানে আসিলে মস্কো শহর ও সকল কিছু ঘুরিয়া দেখিতে পাইবে। গাড়িভাড়ার টাকা আমি পাঠাইয়া দিতেছি। তবে তুমি উড়োজাহাজে আসিলে ভালো হয়, তাহাতে ভাড়া কম লাগিবে। অবিলম্বে আমাকে তার করিয়া দিও, যাহাতে তুমি কখন আসিতেছ তাহা জানিতে পারি। আর সবার থেকে বড় কথা, আসিতে মোটেই ভয় পাইও না।'

চিঠি পড়া শেষ করে মালানিয়া দিদিমা শুকনো ঠোঁটদুটো কোঁচকালেন একবার, তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'পাভেল পত্তর পাঠিয়েচে। যেতে কয়েচে আমারে,' শুর্‌কাকে কথাগুলো বলে ছেলেটার দিকে চশমাজোড়ার কাচের ওপর দিয়ে তাকালেন। শুর্‌কা ওঁর নাতি, মেয়ের ছেলে। বিয়ে দেয়ার পর মেয়ের জীবন তেমন সচ্ছল হয় নি, তাই বৃদ্ধা শুর্‌কাকে সাময়িকভাবে নিজের হেফাজতে এনে রাখার ব্যাপারে মেয়েকে রাজি করিয়েছেন। দৌহিত্রটিকে তিনি ভালোবাসেন বটে, তবে সর্বদা কড়া শাসনে রাখেন।

টেবিলের ধারে বসে শুর্‌কা ইশ্‌কুলের হোমওয়ার্ক করছিল। দিদিমার কথা শুনে সে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল একটু। ভাবখানা এমন যেন বলতে চাইল, তা ডাক এসে থাকে তো যাও-না কেন।

'তোর ছুটি শুরু হচ্চে কবে?' দিদিমা কড়াসুরে শুধোলেন এবার।

শুনে শুর্‌কা কান খাড়া করল।

'কিসের ছুটি? শীতকালের?'

'তবে আবার কিসের? তুই কি বলতে চাস আমি গ্রীষ্মকালের কথা শুধোচ্চি?'

'পয়লা জানুয়ারি থেকে। তা, কেন বল তো?'

ফের একবার ঠোঁটদুটো কুঁচকে দিদিমা যেন ভাবনায় পড়ে গেলেন।

আনন্দে উদ্বেগে শুরোকার বুকখানা ধড়ফড় করে উঠল।

ফের সে শুধোল, 'কেন বল তো?'

'তাতে তোর কী? তুই তোর ইশ্কুলের পড়া কর্ দেখি,' বলে দিদিমা চিঠিখানা তাঁর আঙ্রাখার পকেটে পুরে ফেললেন। তারপর কোট পরে আর শালখানা তার ওপর জড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

দিদিমা কোথায় চলল দেখার জন্যে শুরোকাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ির ফটকেই এক প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দিদিমার। আর তিনি চেঁচিয়ে খবরটা জানাতে শুরু করলেন তাকে।

'পাভেল আমারে মস্কোয় গিয়ে তার সাথে ক'দিন থাকতে কয়েচে। কিন্তু কী যে করি বুঝে উঠতে পারচি নে। সত্যি, বিশ্বেস কর্। ছেলে কচ্চে, "এসে আমাদেরে দেখে যাও। তোমার অভাব আমরা বড্ড বোধ করচি।"'

জবাবে প্রতিবেশিনী কী যে বলল শোনা গেল না। তবে দিদিমার জোরালো গলা ফের খন্খন করে উঠল।

'হ্যাঁ, তা যাওয়া সম্ভব বৈকি। নিজের নাতিপুতিগুলারে ছবিতে ছাড়া এখনও চক্ষে দেখি নাই। তবে কী জানিস, যাওয়ার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্চে এই আর-কি...'

ওঁর কথা শুনে পথচলতি আরও দুটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে গেল। তারপর একজন, ফের আরেকজন... দেখতে-দেখতে মালানিয়া দিদিমাকে ঘিরে রীতিমতো একটা ভিড়ই জমে উঠল। আর প্রতিবার নতুন লোক আসার সঙ্গে সঙ্গে ফের একবার গোড়া থেকে গল্পটা শুরু করতে লাগলেন তিনি।

'আমার পাভেল গো। মস্কোয় যেতে কয়েচে আমারে। কিন্তু কী যে করি ভেবে পাচ্চি নে...'

হাবেভাবে বোঝা গেল সকলেই ওঁকে পরামর্শ দিচ্ছে যাওয়ার জন্যে।

দুই পকেটে দু'হাত পুরে শুরোকা এবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লেগে গেল। দিদিমার মতো ওরও মুখের ভাব স্বপ্নালু আর চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। মোটের ওপর ও-ও দেখতে দিদিমার মতোই। ওইরকম রোগা,

চোখের নিচে ওপর-চোয়ালের হাড়দুটো খাড়া উঁচনো, ওইরকম খুদে-খুদে চালাক চোখ। তবে দু'জনের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। দিদিমা হলেন চটপটে, কষ্টসহিষ্ণু, চিৎকার করে কথা বলেন আর সবকিছু জানার আগ্রহ তাঁর অসীম। শুর্‌কারও সব বিষয়ে কৌতূহল আছে বটে, তবে সে এত লাজুক যে বোকাটে বললেই চলে, আর সে ভারি বিনীত আর বড্ড স্পর্শকাতর।

ওইদিন সন্ধেয় মস্কোয় পাঠানোর জন্যে একখানা টেলিগ্রামের মুসাবিদা করতে বসল দু'জনে। শুর্‌কা লিখে নিতে লাগল আর দিদিমা বলে চললেন।

'সোনামনি পাভেল, তুই যদি সত্যিই চাস যে আমি তোর ওখেনে যাই, তাইলে আমি যেতে পারি বৈকি। তবে কিনা আমার এই বুড়া বয়সে...'

হঠাৎ শুর্‌কা বলে উঠল, 'থামো তো দেখি! অমন করে কেউ টেলিগ্রাম লেখে?'

'তাইলে কেমন করে নিখতে হয় শুনি?'

'আসছি। দাঁড়ি। আর নয়তো: নববর্ষের পর আসছি। দাঁড়ি। মা। ব্যাস।'

শুনে দিদিমা তো চটেই অস্থির।

'ছ' বচ্ছর ধরে ইশ্‌কুল যাচ্ছিস শুর্‌কা, তবু যদি তোর নামমাত্তর কান্ডজ্ঞান থাকে! তুই খালি শিখেচিস কীভাবে সময় বাঁচাতে হয়!'

এবার শুর্‌কার চটবার পালা।

সে বলল, 'ঠিক আছে, বলে যাও যা প্রাণ চায়। তবে জানো তো, ওইভাবে তার করতে গেলে তোমার কত খরচ পড়বে? পুরানো টাকায় কুড়ি রুব্‌লের মতন।'

শুনে ঠোঁট কুঁচকে ফের ভাবতে বসলেন দিদিমা। পরে বললেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা। তাইলে নেখ্ দেখি: সোনামনি খোকা, আমি এখেনকার নোকজনের সাথে পরামশ্শ করে দেখচি...'

শুর্‌কা আবার কলম নামিয়ে রাখল।

'এতসব আমি লিখতে পারব না। কে জানতে চায় যে তুমি লোকের সাথে পরামর্শ করছ কিনা? পোস্টাপিসে ওরা এসব দেখলে হাসবে।'

'যা বলছি তাই নেখ্ দেখি!' দিদিমা এবার হুকুম জারি করলেন। 'তুই কি মনে করিস পেটের ছেলের জন্যে আমি বিশ রুব্‌ল খরচা করতে ডরাই?'

অগত্যা কলম তুলে নিয়ে যেন বুড়ির প্রতি করুণাভরে ভুরু কুঁচকে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল শুর্‌কা।

'সোনামনি পাভেল, এখেনে আমার পড়শিদের সাথে কথা বললাম। ওরা সবাই আমারে যেতে কয়। অবিশ্যি এটা ঠিক যে আমার এই বয়সে কোথাও যেতে এক-আধটুক ডর নাগে বৈকি...'

'পোস্টাপিসে এসব কেটেকুটে দিয়ে ফের ওরা লিখবে,' শুর্‌কা থাকতে না-পেরে আবার বাধা দিল।

'ইস্‌, চেষ্টা পেয়ে দেখুক-না একবার!'

'তুমি তা জানতেও পারবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, নেখ্‌: ...আমার এক-আধটুক ডর নাগে বৈকি। তবে সে কিছু না। নববর্ষের পর আমরা আসচি। দাঁড়ি। শুর্‌কারে সাথে লিয়ে যাব। ও এখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেচে। বাধ্যও হয়েচে খুব...'

শুর্‌কা অবশ্য তার বড় হওয়া আর বাধ্য হওয়া সম্বন্ধে শেষের দুটো বাক্য লিখল না।

'ছেলেটা সাথে থাকলে আমার তেমন ডর নাগবে না। তাইলে, সোনামনি, এখনকার মতন বিদায় নিচ্চি। তোর অভাব বড্ড বেশি বোধ করচি আমি...'

'বড্ড বেশি' শব্দদুটোর জায়গায় শুর্‌কা লিখল 'সাংঘাতিক'।

'...যাই হোক, এবার গেলে তোর বাচ্চা কটারে অন্তত চোখের দেখা দেখতে পাব। দাঁড়ি। মা।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে শুর্‌কা বলল, 'এবার তাইলে যোগ দিয়ে দেখা যাক।' কলম দিয়ে একেকটা শব্দের মাথায় ঢেরাচিহ্ন দিতে-দিতে ফিস্‌ফিস করে সে গুনে চলল: 'এক, দুই, তিন, চার...'

আর ওর পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইলেন দিদিমা।

'...আটান্ন, উনষাট, ষাট! তাইলে কত হল? ষাট-তিরিশং এক হাজার আট শো। তার মানে, কত? এক শো দিয়ে ভাগ দিলে দাঁড়ায় আঠারো... তার মানে, কুড়ি রুব্‌লেরও বেশি!' বিজয়ীর ভঙ্গিতে ঘোষণা করে দিল শুর্‌কা।

দিদিমা এবার টেলিগ্রামের কাগজখানা ওর হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরলেন। বললেন:

'নিজেই এটা পোস্টাপিসে লিয়ে চললাম। তুই নিশ্চই ঠিকে ভুল করেচিস, বেশি করে বাড়িয়ে বলচিস। এঃ, ভারি আমার পণ্ডিত রে!'

'বেশ তো, যাও-না। দেখবে, হিসাব ওইরকমই দাঁড়াবে। বড়জোর দু'চার কোপেকের গোলমাল হতে পারে, তার বেশি কিছুতেই না।'

...রাত এগারোটা নাগাদ গ্রামের স্কুলের সরবরাহ-ম্যানেজার ও ওদের

প্রতিবেশী ইয়েগোর লিজ্নোভ দেখা করতে এল। দিদিমা অবশ্য দিনের বেলাতেই ওর বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছিলেন যে কাজ থেকে ফিরলেই ওকে যেন তাঁর বাড়িতে আসতে বলা হয়। বয়সকালে ইয়েগোর ঘ্রে বেড়িয়েছে অনেক। এমন কি উড়োজাহাজে চেপেছে পর্যন্ত।

ইয়েগোর এসে একে-একে কোট খ্লল, টুপি খ্লল, তারপর কড়াপড়া দ্ই হাত দিয়ে নিজের শাদা-হয়ে-আসা জটাপড়া চুলগ্লো সমান করে নিল, অবশেষে টেবিলের ধারে বসল। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে খড় আর ঘোড়ার লাগাম ইত্যাদি সাজসরঞ্জামের গন্ধে ঘর ভরে উঠল।

'তাইলে আপনি উড়োজাহাজে চাপতে চান, কেমন?'

মালানিয়া দিদিমা মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরে নেমে গিয়ে জলমেশানো মধ্ গাঁজিয়ে তৈরি বড় এক বোতল মদ নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন:

'হ্যাঁ, ইয়েগোর। এখন, এ-ব্যাপারে তুমি যা জানো তা বল দিনি।'

'তা, বিশেষ কিছ্ বলার নাই তেমন, ব্ইলেন কিনা,' বৃদ্ধাকে ওর গ্লাসে মদ ঢালতে দেখে লোভের চেয়েও বেশি করে কর্ণায় চোখের দৃষ্টিটা ভরে জবাব দিল ইয়েগোর। 'এখেন থেকে সোজা শহরে চলে যান, তাপ্পর বিইস্ক-তোম্স্কের লাইনে রেলে চেপে নভসিবির্স্ক পর্যন্ত যান। সেখেনে খোঁজ কর্ন উড়োজাহাজের টিকিটঘরটা কোন দিকে। কিংবা সেখেনে এস্টেশন থেকে সোজা বিমানবন্দরেও চলে যেতে পারেন...'

'দাঁড়াও-দাঁড়াও, সব্র কর দিনি এক-মিনিট! তোমার ওই 'কিংবা-টিংবা' হেনতেন রাখ দেখি। আমি কী-কী করতে পারি তা না বলে আমারে কী করতে হবে তাই কও শ্নি। আর অত জোরে ম্খ ছোটালে চলবে না। হ্ড়ম্ড় করে সবটুক কথা আমার গায়ে ঢেলে দিও না তো বাপ্।' মধ্-গাঁজানো মদের গ্লাসটা ইয়েগোরের সামনে ধরে দিয়ে কড়া চোখে তার দিকে তাকালেন দিদিমা।

আদরভরে, গ্লাসটায় হাত ব্লোতে-ব্লোতে ইয়েগোর বলল:

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আচে। তাইলে ধরেন, নভসিবির্স্কে পোঁছানোর পর পেথমেই করবেন কী, বিমানবন্দরে যাওয়ার উপায়টা কাউরে শ্ধিয়ে নেবেন, কেমন? এই শ্র্কা, মনে রাখিস কথাটা।'

'শ্র্কা, কথাগ্লা লিখে নে দেখি,' দিদিমা হ্কুম দিলেন।

এক্সারসাইজ খাতার একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে শ্র্কা লিখতে শ্র্ করে দিল।

'তাম্পর, যখন তল্‌মাচোভো'য় পেঁাছাবেন তখন ফের খোঁজ করবেন মস্কো যাবার টিকিট বিক্রি হয় কোন ঠেঁয়ে। খোঁজখবর করে টিকিট কেটে একখান "তু-১০৪" জাহাজে চেপে বসবেন। ব্যাস, তাম্পর আর-কি, পাঁচ ঘণ্টায় পেঁাছিয়ে যাবেন মস্কো শহরে, আমাদের দেশের রাজধানীতে।'

ছোট-ছোট, শুকনো দুই হাতের তালুতে থুত্‌নির ভর রেখে বৃদ্ধা আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে ইয়েগোরের কথা শুনছিলেন। আর ইয়েগোর যত কথা বলছিল আর যাওয়াটা তার কাছে যত সোজা মনে হচ্ছিল বৃদ্ধার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠছিল তত বেশি করে।

'অবিশ্যি স্‌ভের্দ্‌লভ্‌স্কে আপনাদেরে থামতে হবে একবার...'

'কেন? কিসের জন্যে?'

'হবে তো হবে, কেন আবার? আপনার মত কেউ জিজ্ঞেসা করবে নাকি ভেবেচেন? ওরা স্রেফ আপনারে নাইমে দেবে, ব্যাস।' ইয়েগোরের মনে হল, এবার একগ্লাস মদ খাওয়ার সময় হয়েছে। গ্লাস তুলে বলল, 'তাইলে?.. যাত্রা সরল হোক এই কামনায় আরেক পাত্তর খাওয়া যাক!'

'অত তাড়াতাড়ি ঢুকুঢুকু চালিও না, বাছা। আচ্ছা, স্‌ভের্দ্‌লভ্‌স্কে নামানোর কথা আমাদেরে কি বলতে হবে, না ওরা সব্বাইরে নামাবে?'

অনেকখানি মদ গলায় ঢেলে দিয়ে ঠোঁটে টকাস করে খুশির আওয়াজ তুলল ইয়েগোর। তারপর গোঁফজোড়া চুমরে নিল একবার।

'সব্বাইরে নামাবে। আপনার এই মধু-গাঁজানো মদটা ভারি খাসা, মালানিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না। তা, কীভাবে বানালেন এটা? আহা, আমার ইস্তিরিরে যদি একটু শিখিয়ে দিতেন!'

দিদিমা ওকে আরও একগ্লাস মদ ঢেলে দিলেন। বললেন:

'যখন এট্টু কম কিপ্‌টেমি করবে তখন মদও তৈয়ের হবে ভালো, বুইলে?'

'তার মানে?' ইয়েগোর যেন ধাঁধায় পড়ে গেল।

'মানে, মদে আরও চিনি ঢালতে নাগবে এই আর-কি। তোমরা বাপু সব্বদাই শস্তায় কেল্লা ফতে করতে চাও। চোলাইতে আরও এট্টু চিনি ঢেলো দিনি, জিনিসটে মজলে খেতে আরও খাসা ঠেকবে। তবে তোমরা বাপু যেন কেমনধারা, মদের মধ্যি তামাক মিশেল দিয়ে কড়া করে তোল। ওমা, কী নজ্জা, কী নজ্জা!'

'তা বটে,' অন্যমনস্কভাবে বলল ইয়েগোর। তারপর গ্লাসটা তুলে ধরে একবার তাকাল বৃদ্ধার দিকে, একবার শুরুকার দিকে। পরে পুরো গ্লাস গলায়

ঢেলে দিয়ে ফের বলল, 'তা বটে। ভালো, ভালো। তবে কী জানেন, নভসিবির্স্কে গিয়ে খেয়াল রাখবেন যেন ভুলে অন্য কোনো পথে চলে না-যান।'

'কেনে, কেনে?'

'ব্যাপার কী জানেন, কতকিছুই ঘটতে পারে।' তামাকের থলি বের করে একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়ে নিল ইয়েগোর, তারপর গোঁফের ফাঁকে একরাশ শাদা ধোঁয়া ছাড়ল। 'আসল কথা হল, তল্মাচোভো'য় পেঁছাবার পর টিকিট-ঘর গুইলে ফেলেন না যেন। তাইলে কিন্তু ভ্লাদিভোস্তক উড়ে চলে যাবেন।'

অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠে পড়লেন মালানিয়া দিদিমা, তারপর তৃতীয়বারের মতো ইয়েগোরের গ্লাস ভরে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে দিল ইয়েগোর, ঠোঁটে টকাস শব্দ তুলল, তারপর আগের কথাটা আরও বিশদ করতে লেগে গেল।

'কিছু নোক আচে, বুইলেন, যারা টিকিট-ঘরের সামনে গিয়েই টিকিট চেয়ে বসে। আরে বাবা, কোথায় যাবি, কোথাকার টিকিট চাস তা বল্, তা না। তাম্পর আর-কি, যখন হুঁশ ফেরে তখন দেখে একবারে উল্টা দিকে উড়ে চলেচে তারা। তাই বলচি, দেখেশুনে পা ফেলবেন কিন্তু।'

দিদিমা চতুর্থবার গ্লাসে মদ ঢেলে দিলেন ইয়েগোরের। এতক্ষণে মনের রাশ পুরোপুরি আলগা হয়ে গেল ইয়েগোরের, কথা বলার মেজাজ পেয়ে বসল তাকে।

'উড়োজাহাজে যখন উড়বে তখন স্নায়ুগুলা ইস্পাতের তৈরি হওয়া দরকার। যেই আকাশে উড়ল জাহাজ অমনি ওরা আপনেরে এক-টুকরা ল্যাবেঞ্চুস ধইরে দেবে...'

'ল্যাবেঞ্চুস?'

'নিচ্চয়। অত্থাৎ কিনা, ওরা বলতে চাইবে, সবকিছু ভুলে থাক, কী হয় না-হয় সিদিকে নজর দিও না... তবে সত্যি কথা বলতে কী, ওইটাই হল গে সবথেকে বিপজ্জনক মুহূত্ত। কিংবা, ধরেন, ঠিক ওই সময় ওরা আপনারে বলল, "সিটের সাথে নিজেরে বেঁধে রাখ"। তা, আপনি হয়তো বললেন, "কেনে বল তো?" ওরা তখন বলবে, "এইটাই আইন"। হুঃ, নিকুচি করেচে তোর আইনের! আসলে ওরা যা বলতে চায় তা হল এই যে আমরা চিৎপটাং হয়ে পড়তে পারি। ওদের মনের কথাটা হল এই! কিন্তু তা না বলে

ওরা বলে, আইন।'

'হায় ভগমান!' হায়-হায় করে উঠলেন বৃদ্ধা। 'এমনই যদি সব কাণ্ডকারখানা তো লোকে অমন গাড়িতে উড়তে চায় কেনে?..'

'এট্টা কথা আচে, যদি নেকড়েরে ডরাও তো বনের দিক মাড়িও না।' মদের বোতলটার দিকে এক-নজর তাকিয়ে ইয়েগোর ফের শুরু করল। 'জেটবিমান অবিশ্যি আরেট্টু নিভ্ভরযোগ্য। প্রপেলার-ওলা যে-বিমান তা যে-কোনো মুহূত্তে ভেঙে পড়তে পারে — এই হল গে আপনার অবস্তা... তাছাড়া ওগুলায়, ওদের ইঞ্জিনগুলায় দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ আগুন নেগে যায়। একবার আমি ভ্ল্যাদিভোস্তক থেকে উড়ে আসচি...' চেয়ারটায় আরও ভালো করে গুছিয়ে বসে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল ইয়েগোর, তারপর বোতলটার দিকে ফের একবার তাকাল। দিদিমা কিন্তু নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। ইয়েগোর বলল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। উড়ে চলেচি এমন সময় হঠাৎ একবার জানলা দিয়ে বাইরে তাইকে দেখি — ওরে বাবা, ধু-ধু আগুন!'

দিদিমা বলে উঠলেন, 'দোহাই ভগমান!'

আর শুনতে-শুনতে শুর্কার মুখখানা তখন হাঁ হয়ে গেছে।

'তবে আর বলচি কী! আমি তো বাবারে-মারে করে চিচ্কার পেড়ে অস্থির হলাম। শুনে পাইলটদের একজনা ছুটে এল... তবে ব্যাপারটা এর বেশি আর গড়াল না, নোকটা খালি আমারে খুব একচোট ধমক দিয়ে চলে গেল। বলল, "এত হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়েচ কিসের জন্যে, অ্যাঁ?" হ্যাঁ, ওখেনে আগুন জ্বলচে ঠিকই, তবে তা লিয়ে তোমারে মাথা ঘামাতে হবে না। যেখেনে আচ চুপটি মেরে বসে থাক... ওদের উড়োজাহাজের কাজ-কারবার ওরা এইভাবেই চালায় আর-কি।'

শুর্কার কাছে কিন্তু গপ্পোটা একেবারে অবিশ্বাস্য ঠেকল। ও আশা করেছিল যে শুনবে আগুন দেখে পাইলট এরোপ্লেনের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে আগুন নেবাবার চেষ্টা করছে কিংবা অ-জায়গায় সাত-তাড়াতাড়ি প্লেন নামিয়ে ফেলছে। ও হরি, সে-সব কিছুই না, লোকটা খালি ইয়েগোরকে ধমক দিয়ে চলে গেল?

'এট্টা ব্যাপার আমি কিছুতে বুইতে পারি নে,' এবার শুর্কার দিকে ফিরে ইয়েগোর বলল। 'ওরা যাত্রীদের এক-একখান প্যারাশুট দেয় না কেনে?'

শুরকা কাঁধ ঝাঁকাল। যাত্রীদের-যে প্যারাশুট দেয়া হয় না, এ-খবরটাই জানা ছিল না ওর। সত্যিই যদি তা হয় তাহলে তো ব্যাপারটা আশ্চর্য বলতে হবে।

একটা ফুলের টবে সিগারেটের শেষাংশ ঘষে নিবিয়ে অর্ধেক উঠে ইয়েগোর বোতল থেকে মদ ঢেলে ফের নিজের গ্লাসটা ভরে নিল।

'হ্যাঁ, মদের মতন মদ বটে আপনার, মালানিয়া!'

'তা বলে বেশি খেয়ে ফেলো না যেন — তাইলে মাতাল হয়ে যাবে।'

'দারুণ মাল বটে...' বলতে-বলতে মাথা নেড়ে-নেড়ে মদটুকু ঢুক করে গলায় ঢেলে দিল ইয়েগোর।

'আহ্! তবে জেটগুলাও কিন্তু কম বিপজ্জনক না। কলকব্জা কিছু-এট্টা বিগড়ালেই হল, ধাঁ-ধাঁ করে জেটখান নিচে পড়ে যাবে একখান কুড়োলের মতন। একবারে মুহূর্তের মধ্যে — পরে আর কোনোকিছু আস্ত পাওয়ার আশা থাকে না। জামাকাপড় সমেত একেট্টা লোক শ'তিনেক গ্রাম ওজনের কিমা বনে যায়।' ভুরু কুঁচকে ইয়েগোর আবার বোতলটার দিকে স-মনোযোগ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কিন্তু দিদিমা ছোঁ মেরে বোতলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়। থম মেরে ইয়গোর আরও কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে। একটু-একটু টলছিল সে।

যাবার আগে চেঁচিয়ে বলল, 'তবে তা বলে ডর নাগার কিছু নাই, বুইলেন! তবে পাইলটের ক্যাবিন থেকে যতটা দূরে পারেন থাকবেন। একবারে ল্যাজের দিক ঘেঁষে বসবেন, তাইলে ভালো বোধ করবেন। আচ্ছা, তাইলে চলা যাক...'

ভারি পায়ে ধপ-ধপ আওয়াজ করতে-করতে দরজার কাছে গেল সে, তারপর টুপি আর কোট পরল।

'পাভেল সের্গেয়েভিচরে আমার নমস্কার জানাবেন। হ্যাঁ, মদের মতন মদ বটে আপনার, মালানিয়া!'

ইয়েগোর এত তাড়াতাড়ি মাতাল হয়ে যাওয়ায় দিদিমা বিরক্ত হয়েছিলেন — নাঃ, ঠিকমতন কথাই বলা গেল না ওর সাথে।

বললেন, 'তোমার মাথা আজ তেমন খোলসা নাই, ইয়েগোর।'

'আর কিছু না, আজ এট্টু পরিশ্রান্ত আছি এই আর-কি,' কোটের কলার থেকে খড়ের একটা টুকরো ঝেড়ে ফেলে ইয়েগোর বলল। 'কত করে আমাদের কত্তাদেরে বোঝালাম যে খড় গ্রীষ্মিকালেই গাড়িতে করে গোলায় নেয়া উচিত। তা কে কার কথা শোনে! ইদিকে সেদিনকার তুষার-ঝড়ের পর রাস্তাটাস্তা সব বরফে বোঝাই হয়ে গ্যাচে। তাই সারা দিনমান টানাটানি হেঁচড়াহেঁচড়ি করতে

নেগেচে আমাদেরে, তবেই সবথেকে কাছের গাদাগুলির ধারেকাছে কোনোরকমে ঘেঁষতে পেরেচি। আর তাম্পর পেটে পড়েচে আপনার ওই মধু-গাঁজানো মদ...' মাথা নেড়ে খুকখুক করে হাসল ইয়েগোর। 'আচ্ছা, চলি তাইলে। তবে আপনারা কিন্তু উড়োজাহাজেই যাবেন — সত্যিই ডর নাগার কিছু নাই। কেবল পাইলটের ক্যাবিনের কাছ থেকে দূরে থাকবেন, ব্যাস। আচ্ছা, বিদায়।'

'বিদায়,' শুর্কা সাড়া দিল।

দরজাটা ইয়েগোরের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। ঘর থেকে দিদিমা আর নাতি শুনল উঁচু বার-বারান্দা থেকে সিঁড়ি বেয়ে সতর্কভাবে ইয়েগোরের নামার আর তারপর উঠোনটা পার হওয়ার পদশব্দ। এরপর ফটকের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল আর রাস্তায় নেমে ইয়েগোর ধরে দিল বিশাল উত্তাল সমুদ্র নিয়ে লেখা একটা গানের কয়েকটা কলি। তারপর হঠাৎ আচমকা আবার থেমে গেল গানটা।

অন্ধকার জানলাটার দিকে আতঙ্কিত মুখে তাকিয়ে ছিলেন মালানিয়া দিদিমা। ইয়েগোরের যে-সব মন্তব্য শুর্কা টুকে নিয়েছিল সেগুলো সে ওঁকে পড়ে শোনাল এবার।

দিদিমা বললেন, 'আকাশে উড়তে ডর নাগচে রে শুর্কা।'

'কেন, আরও কতলোক তো ওড়ে...'

'টেরেনে গেলে বোধহয় ভালো হয়, তাই না?'

'তার মানে, আমার ছুটির সব ক'টা দিন ট্রেনেই কেটে যাবে।'

'কী যে করি ভেবে উঠতে পারচি নে!' নিশ্বাস ফেলে বললেন দিদিমা। 'তার চেয়ে এট্টা কাজ করি, পাভেলরে একখান পত্তর নিখি আর টেলিগেরাম পাঠানো বাতিল করে দিই।'

এক্সারসাইজ খাতা থেকে শুর্কা ফের একখানা পাতা ছিঁড়ে নিল।

'তাহলে আমরা উড়োজাহাজে যাচ্ছি না?'

'উড়োজাহাজে যাব! বলিস কী রে, কত সাংঘাতিক ঝামেলার ব্যাপার তা দেখচিস তো। হায় ভগমান! বলে কিনা তিনশো গেরাম ছাড়া আর কিছু থাকে না...'

গভীর চিন্তায় পড়ে গেল শুর্কা।

'নে, নেখ্। সোনামনি পাভেল, এখেনকার মাতব্বর জনাকয় মানুষের সাথে পরামর্শ করলাম...'

কাগজের ওপর ঝ‌ুঁকে পড়ে লিখে নিতে লাগল শ‌ুর্‌কা।

‘তারা উড়োজাহাজে ওড়ার ব্যাপারটা সবকিছ‌ু খোলসা করে জানিয়েচে… তাই শ‌ুর্‌কা আর আমি আমরা মতলব করেচি যে গ্রীষ্মিকালে তোর ওখেনে টেরেনে করে যাব। আমরা এখনই যেতে পারতাম, তবে শ‌ুর্‌কার ছ‌ুটি বড় কম দিনের জন্যে তাই…’

এই পর্যন্ত লিখে দ‌ু’এক সেকেন্ড ইতস্তত করে এবার শ‌ুর্‌কা নিজেই লিখে যেতে লাগল:

‘পাভেলমামা, এখন আমিই তোমাকে দ‌ু’কলম লিখছি। আমাদের সরবরাহ-ম্যানেজার ইয়েগোর লিজ‌ুনোভমামাকে মনে আছে তো? সে দিদাকে ভয় খাইয়ে দিয়েছে। যেমন ধর, সে আমাদের বলেছে যে এরোপ্লেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে একবার ইঞ্জিনে আগ‌ুন লেগে যেতে দেখেছিল। আর খবরটা পাইলটকে জানাতে সে মামাকে ধমকে দেয় শ‌ুধ‌ু। কিন্তু আমার মনে হয় ইঞ্জিনে যদি সত্যিই আগ‌ুন লাগত তাহলে ওরা সাধারণত যেমনটা করে থাকে পাইলট তেমনই করত, মানে প্লেনের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে আগ‌ুন নেবাবার চেষ্টা করত। আমার যতদ‌ূর মনে হয় ব্যাপারটা আর কিছ‌ুই নয়, খালি ইয়েগোরমামা এগ্‌জস্ট-পাইপ থেকে আগ‌ুন বেরোতে দেখে ভয় পেয়ে চে‌ঁচামেচি শ‌ুর‌ু করেছিল। এখন, তুমি যদি দিদাকে চিঠি লিখে জানাও যে ও নিয়ে অত ভয় পাওয়ার কিছ‌ু নেই তাহলে ভালো হয়। তবে আমি-যে তোমাকে চিঠি লিখেছি তা বোলো না কিন্তু। এখন যাওয়া না-হলে দিদা গ্রীষ্মকালেও যাবে না। তখন সব্‌জি-বাগান দেখাশ‌ুনো করতে হবে, তাছাড়া হাঁস-ম‌ুরগি-শ‌ুয়োর এসবের দিকেও নজর রাখতে হবে — আর দিদা এসব ফেলে কখনোই যাবে না। ব‌ুঝতেই পারছ, আমরা এখনও যে-গে‌ঁয়ো সেই গে‌ঁয়োই রয়ে গেছি। কিন্তু আমার মস্কো দেখার ভারি ইচ্ছে। ইশ্‌কুলে ভূগোল আর ইতিহাসের বইতে আমরা মস্কো নিয়ে অনেক-কিছ‌ু পড়েছি। কিন্তু ব‌ুঝতেই তো পার বইয়ে পড়া আর চোখে দেখা এক জিনিস নয়। আরেকটা কথা। ইয়েগোরমামা বলছে যে এরোপ্লেনের যাত্রীদের নাকি প্যারাশ‌ুট দেয়া হয় না। এটা নিছক ভয়-দেখানো কথা, তাই না? দিদা কিন্তু একথাও বিশ্বাস করে বসে আছে। দোহাই তোমার, পাভেলমামা, দিদাকে এ নিয়ে একটু লজ্জা দিয়ে দিও তো! দিদা তোমায় কত-যে ভালোবাসে, কী বলি। কাজেই তুমি দিদাকে লিখো: তুমি কী ভাবো বল দেখি, মা? তোমার নিজের ছেলে একজন পাইলট, “সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর” আর আরও নানা খেতাব

আর মেডেল পেয়েছে সে, আর তুমি কিনা যাত্রীবাহী সাধারণ একখানা এরোপ্লেনেই উড়তে ভয় পাও — যা নাকি নিজের বাড়িতে থাকার মতোই নিরাপদ? আর তাও আবার এমন একটা সময়ে যখন আমরা শব্দের গতিবেগের বাধা ডিঙিয়ে গেছি। — এই কথাগুলি যদি একটু লেখ তাহলে দিদা সঙ্গে সঙ্গে প্লেনে চেপে বসতে একটুও দুনোমন করবে না। তোমাকে নিয়ে দিদার ভারি গর্ব কিনা, তাই। আর ব্যাপারটা সত্যিই গর্ব করার মতো বটে। তোমার জন্যে আমারও খুব গর্ব হয়। মস্কো দেখার জন্যেও আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আচ্ছা, মামা, এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। প্রণত, আলেক্সান্দর।'

ইতিমধ্যে দিদিমা ওকে লিখে নেয়ার জন্যে বলেই চলেছেন:

'...আমরা গ্রীষ্মির একটু পরের দিকে, শরৎ ঘেঁষে, যাব। তদ্দিনে ব্যাঙের ছাতা কুড়নো শেষ হয়ে যাবে। আমি তোদের জন্যে খানিকটে ব্যাঙের ছাতার আচার আর শেয়াকুল-ফলের জ্যাম বানিয়ে নিয়ে যাব'খন। মস্কোয় এ-সবই দোকানে বোতলে ভরে বিক্রি হয় জানি। কিন্তু বাড়িতে আমি যেমনটি বানাই তেমনটি ওরা কখনোই বানাতে পারবে না। তাইলে বাছা, এই হল গিয়ে অবস্তা। তোর বউ আর ছেলেপিলেকে আমার আদর জানাস। শুরকার হয়েও ভক্তি-ভালোবাসা জানিয়ে দিস। আপাতত এই পর্যন্ত... কী রে শুরকা, সব নিখে নিয়েচিস তো?'

'হ্যাঁ, নিয়েছি।'

কাগজখানা শুরকার কাছ থেকে নিয়ে পরিপাটি করে ভাঁজ করে একখানা খামে ভরলেন দিদিমা। তারপর নিজের হাতে ঠিকানা লিখলেন: 'মস্কো, লেনিনস্কি প্রসপেক্ট, ৭৮, ফ্ল্যাট নম্বর — ১৫৬। সাইবেরিয়াবাসিনী মায়ের নিকট হইতে "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" খেতাবধারী লিউবাভিন, পাভেল ইগনাতিয়েভিচ সমীপে।'

ঠিকানাটা সর্বদা তিনি নিজেই লেখেন। কারণ তিনি জানেন যে নিজে তিনি ঠিকানা লিখলে চিঠি ঠিকমতো পেঁছনোর সম্ভাবনা বেশি।

'ব্যাস, কাজ শেষ। শুরকা, নাকে কাঁদিস নে, গ্রীষ্মিকালেই আমরা যাব।'

'কে আবার নাকে কাঁদছে? তবে দিদা, এখন থেকেই একটু-একটু করে জিনিসপত্তর গোছাতে থাকলে কিন্তু ভালো করতে। কে জানে, হয়তো হঠাৎ তুমি মত বদলে এরোপ্লেনে উড়ে যেতে রাজি হয়ে যেতে পার।'

শুনে দিদিমা নাতির দিকে তাকালেন শুধু, তবে কোনো কথা বললেন না।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুর্কা শুনতে পেল যে প্রকাণ্ড রুশী চুল্লির ওপর তাঁর বিছানায় শুয়ে দিদিমা খালি এপাশ-ওপাশ করছেন, ছটফট করছেন খালি। আর থেকে-থেকে চুপিচুপি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন আর বিড়বিড় করে কী-যেন বলছেন নিজের মনে।

শুর্কারও ঘুম আসছিল না। সে খালি ভেবে চলেছিল। অদূর ভবিষ্যতে, একেবারে দিন-কয়েকের মধ্যেই তার জীবনে নানা আজব কাণ্ড ঘটতে চলেছে। ঘটতে চলেছে এমন সব অ্যাড্ভেঞ্চার যা ঘটার কথা ও আগে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি।

হঠাৎ দিদিমা ডাকলেন, 'শুর্কা!'

'কী?'

'মনে লিচ্ছে পাভেলরে ওরা ক্রেমলিনে ঢুকতে দেয়। তাই-না রে?'

'তা-ই তো মনে হয়। তো তাতে কী হল?'

'আচ্ছা, ভাব্, একবারের জন্যে আমাদেরে যদি ভেতরে যেতে দেয়... ঘুরে দেখতে দেয় সব।'

'আজকাল সবাইকে ওরা ভেতরে ঢুকতে দেয়।'

শুনে অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন দিদিমা।

পরে অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'হ্যাঃ, বললেই হল, সবাইরে ঢুকতে দেয়!'

'বাঃ, নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ সেদিন-যে বললেন!'

এরপর মিনিটখানেক কি মিনিট-দুয়েক দু'জনেই চুপ।

'দিদা, এমনিতে তো দেখি তোমার সাহস খুব, আর এবার যে বড় ভয় পেয়ে গেলে?' অসন্তুষ্টভাবে বলল শুর্কা। 'এবার এত ভয় ধরল কিসে?'

'চুপ যা, ঘুমো দেখি,' দিদিমা হুকুমজারি করলেন। 'ওঃ, মস্ত আমার বীরপুরুষ এয়েচেন রে! ঝামেলায় পড়লে তুই-ই তো পের্থমে পাত্লুন হল্দে করে ফেলবি।'

'ঠিক আছে, বাজি ধর, দ্যাখো আমি ভয় পাই কিনা!'

'যা-যা, ঘুমো দেখি ছোঁড়া। কাল সকালে ইশ্কুল যাবার জন্যে কখনোই ঠিক সময়ে উঠতে পারবি নে তা বলে রাখচি।'

এবার চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল শুর্কা।



স্তেপানের প্রেম

এপ্রিল মাসের এক বসন্তের দিনে স্তেপান ইয়েমেলিয়ানভ প্রেমে পড়ে গেল। প্রেমে পড়ল এল্‌লোচ্‌কার — অহল্যাভূমি উদ্ধারের কর্মসূচি উপলক্ষে আল্‌তাই-অঞ্চলে আসা একটি মেয়ের। মাত্র দু'বারই মেয়েটিকে চোখের দেখা দেখেছে স্তেপান। প্রথমবার নিজের লরিতে করে মেয়েটিকে শহর থেকে গ্রামে পৌঁছে দেবার সময় দেখে সে। সে-সময়ে ওর মনে হয়েছিল, এমন আহামরি কিছু নয়। এমন কি সারা রাস্তা একটা কথারও লেনদেন হয় নি দু'জনের মধ্যে। লরিটা রাস্তার গর্তগার্তার ওপর দিয়ে লাফাতে-লাফাতে আসছিল আর যতবার মেয়েটা স্তেপানের গায়ের ওপর এসে পড়ছিল ততবার সলজ্জভাবে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। যেন বলতে চাইছিল, 'বুঝতেই তো পারছ, ইচ্ছে করে আমি তোমার গায়ে এসে পড়ি নি।' আর এর পরই মেয়েটা সিটের অপর প্রান্তে সরে-সরে বসছিল। স্তেপানের কিন্তু ওদিকে একেবারে ভ্রূক্ষেপই ছিল না। মেয়েটার দিকে এমন কি একবারও তাকাচ্ছিল না পর্যন্ত, কেবল নিজের মনে শিস দিয়ে 'আমুরের ঢেউ রে' গানটার সুর ভাঁজছিল আর নিজের গাড়ির ব্যাটারিটার (সেটার জোর কমে এসেছিল) কথা চিন্তা করছিল।

গাঁয়ে পৌঁছনোর পর মেয়েটাকে পয়সার জন্যে ব্যাগ হাতড়াতে দেখা গেল।

এতে স্তেপানের চোয়ালের দুই হাড়ের চারপাশটা অল্প-একটু লাল হয়ে উঠল। ও বলল:

'না-না, থাক…'

'কেন? কেন?' সবুজাভ, স্বচ্ছ চোখদুটো তুলে মেয়েটি ওর দিকে তাকাল। 'কী হল আবার?'

'কিছু না। থাক-না।' বলে গিয়ার ঠেলে পা দিয়ে অ্যাক্সিলারেটর চেপে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল স্তেপান।

সহযাত্রিনীর কথা ভেবে এক-মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল ওর যে কিছু-কিছু মেয়ে আছে দেখতেশুনতে মন্দ নয় কিন্তু, দিব্যি খাসাই। তবে, ওই পর্যন্তই। তারপর বেমালুম ভুলে গিয়েছিল মেয়েটির কথা।

এর পর কয়েকটা সপ্তাহ স্তেপানকে কাটাতে হল গাঁ-ছাড়া হয়ে, আল্‌তাইয়ের এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি রাস্তায়। যেখানে সুবিধে হোত রাত কাটাত সেখানে। অন্য অনেক মেয়ের দেখা পেল পথেঘাটে, তাদের কেউ-বা সুন্দরী, কেউ আবার তেমন সুন্দরী নয় — এমনি নানা ধরনের। ভাবল, দুনিয়ায় মেয়ের দেখছি ছড়াছড়ি! ওদের সকলের কথা ভাবতে গেলে মাথা ধরে মাথার দফারফা হবে আর-কি।

জাঁকিয়ে এপ্রিল মাস এসে পড়ল এরপর।

এক শনিবার লরি নিয়ে বাড়ি ফিরল স্তেপান। গাঁয়ের এজমালি স্নানঘরে গরম ভাপে ভালোরকম গা জারিয়ে এমব্রয়ডারি-করা উঁচু কলারওয়ালা পরিষ্কার একখানা কামিজ গায়ে চাপাল সে, পায়ে দিল নরম চামড়ার নতুন একজোড়া বুটজুতো। তারপর একমগ কড়া মধুগাঁজানো মদ গিলে গাঁয়ের ক্লাবে থিয়েটর দেখতে গেল।

সে-রাত্রে স্থানীয় নাট্যগোষ্ঠীর একখানা নাটকের অভিনয় ছিল। চেনা লোকজনকে স্টেজে উঠে অভিনয় করতে দেখলে স্তেপান ভারি খুশি হয়। ওর কাছে দারুণ ঠেকে ব্যাপারটা। ধর, একজন লোককে তুমি বহু বছর ধরে জানো, আর একদিন ক্লাবে এসে দেখলে কী — না, সেই লোকটাই কোমর পর্যন্ত লম্বা দাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে আর ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচামেচি করছে এই বলে যে 'ওরে অমুক, ওরে অমুক, তোরে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব!'

এই সমস্ত দৃশ্য দেখে হৈহৈ করে না-হেসে পারে না স্তেপান। আর এতে আশপাশের লোকজন সর্বদাই শ্‌-শ্‌ করে থামিয়ে দেয় ওকে, বলে যে নাটকের বিন্দুবিসর্গও ও নাকি বোঝে না।

সামনের একটা সারিতে জায়গা করে নিয়ে নাটক দেখতে গুছিয়ে বসল স্তেপান। কিন্তু কী দেখল সে? দেখল, যাকে সে শহর থেকে লরিতে গাঁয়ে পেঁৗছে দিয়েছিল সেই মেয়েটিই স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছে। একই রকম সুন্দরী, তবে এখন ধীরস্থির আর কেমন যেন অত্যন্ত গুরুগম্ভীর দেখতে লাগছে

তাকে। মাথাটা একটুখানি পেছনে হেলিয়ে দিয়েছে, হালকা বাদামিরঙের চুলের বিনুনিদুটো দুই কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এসে পড়েছে আর পায়ে দিয়েছে লালরঙের একজোড়া বুট। আস্তে-আস্তে হাঁটছে ও, ঘাড় ফেরাচ্ছে ধীরেসুস্থে লীলায়িত ভঙ্গিতে আর গলায় ঝরে পড়ছে কেমন একটা নরম-নরম, সোহাগের সুর। স্তেপান ভেতরে-ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। স্টেজে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ওকে চিনেছিল সে। কিন্তু মেয়েটি যে এত সুন্দরী তা আগে কখনও মনে হয় নি তার — অর্থাৎ মেয়েটি যে সুন্দরী তা সে জানত, কিন্তু জানত না যে সে এমনধারা রঙ্‌ঢঙে ভরা।

এবার স্টেজে এসে ঢুকল এক নির্লজ্জ ছোকরা — যৌথখামারের খাজাঞ্চি ভাস্‌কা সেমিওনভ। মাথায় উ'চু টুপি আর চোখে চশমা-আঁটা ভাস্‌কাকেও ভারি গুরুগম্ভীর ঠেকছিল। অন্য যে-কোনো সময় হলে স্তেপান ওকে এই বেশে দেখে হাসিতে ফেটে পড়ত, কিন্তু এখন কেন যেন ওর হাসি পেল না। একাগ্র দৃষ্টিতে ও খালি মেয়েটিকে দেখছিল, ওর আর ভাস্‌কার মধ্যে এরপর কী ঘটে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল শুধু। ও দেখল মেয়েটার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, দেখল মেয়েটা পিছু হটে যাচ্ছে যেন কী কারণে ভয় পেয়েছে এমন ভাব করে। মেয়েটার জন্যে ও রীতিমতো কষ্টবোধ করল মনে-মনে।

'কেন এসেছ তুমি?' মেয়েটা শুধোল।

'তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না!' গর্দভ ছোকরা হে'কে বলল। এত জোরে কথাটা বলল যে হলের সবাই তা শুনতে পেল।

মেয়েটি বলল, 'যাও, চলে যাও।' কিন্তু এমনভাবে বলল যেন মনে হল আসলে বলতে চাইছে 'যেও না গো।'

'না, আমি যাব না,' ভাস্‌কা ঘোষণা করল। তারপর মেয়েটির কাছে ঘে'ষে এল।

বেঞ্চির ধারটা সজোরে আঁকড়ে ধরল স্তেপান। ও জানে ওই ভাস্‌কা ছোকরা অত সহজে ছাড়ান দেবার পাত্র নয়। আর চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে, এ-সবের শেষ পরিণতি কী হতে পারে তা ভেবে ওঠার আগেই ও দেখল খাজাঞ্চি তার হাতদুটো দিয়ে কৌশলে মেয়েটার কাঁধদুটো জড়িয়ে নিল, বাঁ-হাতের ওপর মেয়েটাকে কাত করে ফেলল, তারপর চুমো খেল ওকে। চুমো খাওয়ার পর মেয়েটার ঠোঁটদুটো লক্ষ্য করল স্তেপান — দেখল ঠোঁটদুটো একটু যেন ফোলা আর ভিজে-ভিজে ঠেকছে আর সে-দুটো অল্প-একটু ফাঁক

হয়ে আছে। একটা কোমল সুখের হাসিতে তিরতির করে কাঁপছে ঠোঁটদুটো। আর স্তেপান চোখে অন্ধকার দেখল। উঠে পড়ে ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে এল সে।

বাইরে এসে একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বাহ্যজ্ঞান ফিরতে অনেকক্ষণ সময় লাগল তার।

'এটা কী করে হতে পারে! কী করে হতে পারে এটা!..' বিড়বিড় করে বকতে লাগল সে।

...তিনদিন ধরে স্তেপান এমনি বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াল। (ওর লরিটা ওই সময়ে মেরামত করা হচ্ছিল)। খোঁজখবর করে ও জানল যে মেয়েটার নাম এল্‌লা, বাড়ি ভরোনেজ শহরে আর এখানে একটা ট্রাক্টরচালক দলের সময়রক্ষক ও। ব্যস, এই-ই সব। একবার ভাবল ভাস্‌কা সেমিওনভের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেয় স্টেজের ওই ব্যাপারটাকে ও সত্যিই বেশিদূর গড়াতে দিয়েছে কিনা। তবে সময় থাকতে বুঝল যে এমন কাজ করা উচিত হবে না। কেননা, যতই যাই হোক, বাস্তব জীবনে-যে ব্যাপারস্যাপার ওইভাবে নাটকের মতো করে ঘটে না — এ বোধ ছিল ওর। বুঝল, এমন প্রশ্ন করলে নিজেই ও হাসির খোরাক যোগাবে।

একদিন সন্ধেবেলা নরম চামড়ার বুটজোড়া দারুণ ঝকঝকে করে তুলে ও রওনা দিল — এল্‌লোচ্‌কার সঙ্গে দেখা করতে। ওর বাড়ির ফটক (মেয়েটি বৃদ্ধ কুক্‌সিন-দম্পতির সঙ্গে থাকছিল) পর্যন্ত গেলও স্তেপান, কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করল সেখানে, তারপর ফিরে চলে এল। এরপর উদ্দেশ্যহীনভাবে গাঁয়ের বাইরে এদিক-সেদিক ঘুরে নদীর ধারে এসে থামল, তারপর বসে পড়ল ভিজে মাটির ওপরেই। হাত দুখানা দিয়ে হাঁটুদুটো জড়িয়ে মাথাটা হাঁটুর ওপর রেখে ভাবতে-ভাবতে ওখানে বসেই রাত ভোর করে দিল সে।

ওই ক'দিনেই ও রোগা হয়ে গেল, চোখের কোলে কালি পড়ল মনোকষ্টে। খাওয়াদাওয়াও প্রায় বন্ধ করে দিল, খালি সিগারেট খাওয়া আর চিন্তা করা ছাড়া আর কিছুই করল না ক'দিন...

বাপ শুধোলেন, 'কী হল তোর, খোকা?'

'কই, কিছু না তো...' বলে সিগারেটের শেষাংশটা বুটের নিচে পিষে ফেলে আরেকটা সিগারেট নিতে হাত বাড়াল স্তেপান। বাপের দিকে না-তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে রইল।

এই সময়ের মধ্যে একবারের তরেও এল্‌লোচ্‌কার দেখা পায় নি ও। ক্লাবে যাওয়াও ও ছেড়ে দিয়েছিল।

অবশেষে চারদিনের দিন স্তেপান এসে সরাসরি বাপকে বলল, 'আমি বে করতে চাই।'

'বটে? তা, কারে বে করবি?' বাপ ইয়েগোর সেভেরিয়ানিচ কৌতূহলী হয়ে শুধোলেন।

'ওই-যে... ওই নতুন মেয়েটা... সময়ের হিসাব রাখে যে,' বাপের পেছনদিকে একটা জানলার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে শান্তভাবে জবাব দিল স্তেপান।

শুনে ইয়েগোর সেভেরিয়ানিচকে চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখা গেল। উনি বললেন:

'তুই কি ওরে মোট্টেও চিনিস?'

'হ্যাঁ, চিনি তো...' ইতস্তত করতে লাগল স্তেপান। 'না, মানে... তেমন চিনি না।'

'তাইলে বে'র ঘটকালি করতে আমারে তুই পাবি না,' দৃঢ়ভাবে সাফ জবাব দিয়ে দিলেন ইয়েগোর।

'কেন পাব না?'

'বুড়া বয়সে আমি আর অপমান হতে চাই না, এই আর-কি। ব্যাপারখান কেমন দাঁড়াবে তা আমি বেশ জানি। আমরা ওর বাড়িতে গিয়ে পরস্তাব করব আর দেখা যাবে মেয়েটা আকাশ থেকে পড়বে। না-না, তুই বরং আগে গিয়ে নিজে ওর সাথে কথাবাত্তা বল্‌। অন্য লোকে যেমন করে তেমন কর্‌, এক-আধটুক ভাবসাব কর্‌। তাপ্পর আমরা তোর বে'র সম্বন্ধ লিয়ে যাব'খন। নইলে... তুই সব্বদাই এমনিধারা, স্তেপান। কোনোকিছু দেখলেই ষাঁড়ের মতন তাড়া করিস গিয়ে। কত-যে তোরে শিখাতে চেষ্টা পেয়েছি, কিন্তু কিচ্ছুটি ফল হয় নাই।'

ইয়েগোরের বাপ ঠাকুর্দা সেভেরিয়ানের কানে কথাগুলো গিয়েছিল। সামান্য অসুস্থ হয়ে চুল্লির ওপরে বিছানায় শুয়ে ছিলেন তিনি। এবার অসন্তুষ্টভাবে তিনি বলে উঠলেন:

'ইঃ, কী আমার মান্যিগন্যি মানুষ এয়েচেন রে! শোন একবার ওঁয়ার কথা! উনি নাকি সম্বন্ধ করতে যাবেন না! ওরে হতভাগা, তুই কি ভুলে গেলি কীভাবে আমি হন্যে হয়ে তোর জন্যে মেয়ে খুঁজে বেইড়েছেলাম?'

শুনে ভুরু কঁচকে একটা সিগারেট ধরালেন ইয়েগোর। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। সত্যি, কী-ই বা তাঁর বলার আছে? অল্পবয়সে তিনিও ছিলেন হুবহু স্তেপানের মতো — কোনো মেয়ের চোখে-চোখে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পেতেন।

অবশেষে বললেন, 'আমার আর কী, আমি খুবই যেতে পারি। তবে... তবে আমার মনে লিচ্চে ও-মেয়ে তোরে কোনোমতেই বে করবে না।'

'ইঃ, করবে না আবার! লিচ্চয় করবে!' ঠাকুর্দা সেভেরিয়ান সজোরে ঘোষণা করলেন। 'ওরে বে করতে পেলে যে-কোনো মেয়ে বত্তে যাবে।'

'কিন্তু কেন তোমার মনে হল যে ও-মেয়ে আমারে বে করবে না?' স্তেপান শুধোল। ওর ভেতরটা আতঙ্কে হিম হয়ে গিয়েছিল।

'ও ছুঁড়ি হল গিয়ে শহুরে বিবি··· ওরা-যে কী চায় আর না-চায় তা একমাত্তর শয়তানই ঠাহর করতে পারে। ও হয়তো তোরে কবে: তুই এট্টা পিছিয়ে-পড়া গেঁয়ো।'

'তুই নিজেই এট্টা গেঁয়োভুত,' ঠাকুর্দা সেভেরিয়ান ফের ফোড়ন কাটলেন। 'আজকাল আর ওসব লিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, তা জানিস? আজকালকার মেয়েরা বহুত্ সেয়ানা হয়ে উঠেচে। আমি বলে গোরের মড়া, তবু আমিও এটা জানি।'

পরের বেস্পতিবার ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই বাপ আর ছেলে তাদের অভিযানে যাত্রা করার জন্যে তৈরি হতে লাগল।

স্তেপান ফের তার এমব্রয়ডারি-করা কামিজটা পরল। তারপর আয়নার সামনে অনেকটা সময় কাটাল তার সোজা-সোজা খাড়া চুলগুলোকে পরিপাটি সুবিন্যস্ত করে তুলতে।

ইয়েগোর ততক্ষণ মুখখানাকে যথাসম্ভব বিকৃত করে তাঁর সদ্যবানানো ট্রাউজার্সের বোতামপটিতে-বসানো ছোট্ট একটা পেছল বোতাম পাকড়ে ধরার জন্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে গাঁটওয়ালা দুই আঙুলে বোতামটাকে ধরতে পেরে তিনি সেটাকে আঁটসাঁট বোতামের ফুটোয় ঢোকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'কেমন সব পোশাক বানায় দ্যাখো আহাম্মকগুলা! দেহখান চৌচির হয়ে যাবে তবু বোতাম লাগাতে লারবে। একবারে চৌচির হয়ে যাবে দেহখান!' দর্জিদের উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে লাগলেন তিনি।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে স্তেপান তখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ভাবছে, সাজপোশাকটা আরেকটু খোল্‌তাই করে তোলা যায় কীভাবে।

ঠাকুর্দা সেভেরিয়ান পরামর্শ দিলেন, 'এট্টা টাই গলায় দিয়ে নে, দাদু।'

'না-না, এমব্রয়ডারি-করা কামিজের সাথে টাই চলবে না,' বুঝিয়ে বলল স্তেপান।

অবশেষে যাত্রা করার জন্যে তৈরি হল ওরা।

প্রকাণ্ড হাতের থাবা দিয়ে মাথার পেছনটায় চাপ দিলেন ইয়োগোর, তারপর ধাঁধায় পড়ে গিয়ে বুড়ো বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'আমরা কি সাথে করে এট্টা মদের বোতল লিয়ে যাব, না না? আজকাল তো এসব কাজকম্মো অন্যভাবে করা হয়। কী-যে করা উচিত আজকাল ভেবে ঠিক পাওয়া যায় না।'

কথাটা নিয়ে বুড়োও চিন্তা করতে লাগলেন।

শেষে পরামর্শ দিলেন, 'এট্টা বোতল পাকিটে ভরে লিয়ে যা। যদি প্রেয়জন হয় তাইলে বার করে দিতে পারবি।'

অতঃপর বাপ-ছেলে রওনা হয়ে গেল।

দিনটা ছিল রোদ্দুরে ভরা, চন্‌মনে। সর্বত্রই বরফগলা ছোট-ছোট জলের স্রোত বইছে। জমা জলে ছায়া পড়েছে আকাশের; কালো মাটির ওপর এখানে-সেখানে ঝলমল করছে নীল আকাশের একেকটা টুকরো। রাস্তাগুলোয় এপ্রিলের কারসাজি চলেছে পুরোদমে।

নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে ওরা। জমা জলের গর্তগুলো সাবধানে এড়িয়ে চলেছে যাতে পায়ের বুটজোড়া পরিষ্কার থাকে।

কুক্‌সিনরা থাকতেন নিজেদের তৈরি একখানা বড় বাড়িতে। প্রথম দু'খানা ঘর দেখা গেল খালি। এতে ইয়েগোরের মনটা একটু দমে গেল। তিনি ভেবেছিলেন আগে বুড়ো কুক্‌সিনের সঙ্গে আলাপ জুড়বেন, তারপর একসময় কথায়-কথায় বলবেন, 'সামান্য এট্টা ব্যাপারে আমাদের এখেনে আসা...' বুড়ো কুক্‌সিন নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই, সরাসরি তাদের যেতে হবে বাড়ির অতিথি-অভ্যাগত থাকবার ঘরখানায়। এল্‌লা সে-ঘরেই থাকে।

বাপ-ছেলে পরস্পর তাকাতাকি করে সোজা অতিথির ঘরের দিকে চলল। আঙুলের একটা গাঁট দিয়ে বন্ধ দরজায় সাবধানে টোকা দিলেন ইয়েগোর...

সাড়া এল, 'ভেতরে আসুন!'

শুনে স্তেপানের বুকটা ধক করে উঠল।

দরজার একটা পাল্লা অল্প-একটু ফাঁক করে ইয়েগোর ঠেসেঠুসে নিজের দেহটা তার মধ্যে দিয়ে গলালেন। স্তেপানও ঢুকল তাঁর পিছুপিছু। তারপর দু'জনেই দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদের সামনে একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল ভাস্‌কা সেমিওনভ। আর তার পাশে, ঠিক একেবারে পাশটিতেই, বসে ছিল এল্‌লোচ্‌কা।

ওরা বসে চা খাচ্ছিল। ভাস্‌কা তার জ্যাকেটটা খুলে রেখে হল্‌দে সিল্‌কের একটা শার্ট গায়ে বসে ছিল। ওর চমৎকার কামানো গালদুটো জ্বলজ্বল করছিল রীতিমতো। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন নিজের বাড়িতেই রয়েছে। তেমনি সহজ স্বাভাবিকভাবে, প্রায় যেন আরাম করছে বসে। বেশ প্রীতিভরে আর বোকার মতো ও তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল ইয়েমেলিয়ানভদের বাপবেটাকে।

হালকা চালে উঠে দাঁড়িয়ে এল্‌লোচ্‌কা অতিথিদের বসার জন্যে টেবিলের কাছে দু'খানা চেয়ার টেনে আনল। বলল:

'আসুন, আসুন। বসুন।'

ভাস্‌কার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ইয়েগোর চেয়ারে বসে পড়লেন, তারপর ঘুরে ছেলের দিকে তাকালেন। স্তেপানের গালদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে ও যেন জমে গেছে।

'কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন!' খুশির সুরে বলে উঠল এল্‌লোচ্‌কা। 'আপনি কি ওকে আগে কখনও দেখেন নি?'

এতক্ষণে চেয়ারে বসে টুপিটা হাঁটুর ওপর রাখল স্তেপান।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল।

এল্‌লোচ্‌কা একবার স্তেপান, একবার ইয়েগোর আর একবার ভাস্‌কার দিকে তাকাতে লাগল। মনে হল ওর দম ফেটে হাসি পাচ্ছে। ভাস্‌কাও কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করছিল।

'আপনাদের জন্যে আমি কী করতে পারি, কমরেডস? আর আপনাকে তো আমি চিনিই,' এবার স্তেপানকে উদ্দেশ করে খুশির সুরে বলল এল্‌লোচ্‌কা। 'আপনি আমায় শহর থেকে গাড়ি করে এখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে আপনি কিন্তু তখন ভারি রেগে ছিলেন।'

শুনে খুব কষ্ট করে স্তেপান একটু মুখ টিপে হাসল।

ভাস্‌কা ভাবল, একটু রসিকতা করে আসরটা জমিয়ে দেয়া যাক। বলল:

'তাইলে আমরা চুপিচুপি লরিতে যাত্রীও চালান দিয়ে থাকি, তাই তো স্তেপান ইয়েগোরিচ? উঁহু, এটা কিন্তু মোটেই ভালো কথা না...'

ইয়েগোর আবার ভাস্‌কার চকচকে মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ষাঁড়ের মতো মাথাটা নিচু করে সটান বলে বসলেন, 'আমরা কিন্তু বে'র সম্বন্ধ করতে এয়েচি এখেনে।'

বিস্ময়ে এল্‌লোচ্‌কার মুখখানা এবার সত্যিসত্যিই হাঁ হয়ে গেল। সে শুধু বলতে পারল:

'কিন্তু কেমন করে?..'

'কেমন করে? যেমন করে লোকে বে'র সম্বন্ধ করে! এই হল গে আমার ছেলে,' স্তেপানের দিকে মাথা হেলিয়ে বলতে লাগলেন ইয়েগোর। 'ও চায় তুমি ওরে বে কর। অবিশ্যি যদি তুমি রাজি থাক তবেই।'

শুনে এল্‌লা স্তেপানের দিকে এক-পলক তাকাল।

দেখল, স্তেপান নিজের হাতদুটো এমন সজোরে মুঠি পাকিয়েছে যে হাতের তেলোদুটো শাদা হয়ে গেছে। আর সেই মুঠি-পাকানো হাতদুটো দুই হাঁটুর ওপর রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেদিকে। ওদিকে কপালে ওর ঘাম জমে উঠেছে আর তা মোছবারও চেষ্টা করছে না।

'বিয়ে করব?..' বলতে-বলতে লাল হয়ে উঠল এল্‌লা।

'তাছাড়া কী?' বলে স্তেপান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, তারপর ভাস্‌কার দিকে তাকাল। ও তাকাতেই খিকখিক করে হেসে উঠল ভাস্‌কা, তারপর চেয়ারের ওপর বসা অবস্থাতেই শরীরটা ঘুরিয়ে এল্‌লার দিকে ফিরল। অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এল্‌লা আর ফরসা সুঠাম আঙুল দিয়ে পোশাক থেকে তুলোর একটা আল্‌গা আঁশ সযত্নে তুলতে মন দিয়েছিল।

'কথাটা মনে আনতে বড্ড বেশি দেরি করে ফেলেচ হে স্তেপান,' সজোরে কথাটা বলে শরীরটাকে ফের ঘুরিয়ে বসল ভাস্‌কা। 'বড্ড দেরি করে ফেলেচ।'

এবার কিন্তু স্তেপান ওর দিকে এক-মুহূর্তের তরেও ফিরে তাকাল না। কেবল দু'চোখে সাংঘাতিক প্রত্যাশা ফুটিয়ে তুলে মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। স্তেপান অপেক্ষা করে ছিল। কী কারণে যেন এখন ওর বিভ্রান্ত ভাবটা কেটে গিয়েছিল।

হঠাৎ মাথা তুলল এল্‌লোচ্‌কা, তারপর স্বচ্ছ, সবুজাভ চোখদুটি মেলে স্তেপানের দিকে তাকাল। সে-দৃষ্টিতে মিশে ছিল লাজুক-লাজুক ভাব, স্নেহ, ভর্ৎসনা, সম্মতি এবং আরও কিছু, দুর্নিরীক্ষ্য একটা আবেদন, ভীরুতা আর বেপরোয়া ভাব। স্তেপানের বুকটা দুলে উঠল আনন্দে। ওই মুহূর্তে ওদের দুজনের মধ্যে কী-যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল আর কেনই-বা তা ঘটল তা বোঝা যে-কারো পক্ষেই দুঃসাধ্য ছিল। কেবল ওরা দুজনেই তা বুঝেছিল, কিংবা বলা যায়, অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিল তা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভাস্‌কা বলে বসল, 'আমাদের শিগ্‌গিরি বে হতে চলেচে, স্তেপান।'

কিন্তু কথাটা এত বোকা-বোকা শোনাল যে বলার পর ও নিজেও বুঝল যে কথাটা না-বললেই ছিল ভালো।

ইয়েগোর উঠে দাঁড়ালেন, তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু এল্‌লোচ্‌কা হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, একটু বেশি তাড়াতাড়িই যেন বলে ফেলল, 'চললেন কোথায়? ওমা, এই বুঝি আপনি বিয়ের ঘটক! কই, আমি তো এখনও আপনার কথার জবাব দিই নি?'

তাড়াতাড়ি অবশ্য ধাতস্থ হয়ে উঠে স্তেপানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল ও। কিন্তু স্তেপান! তার অবস্থা কী?.. এল্‌লা ওর দিকে তাকাচ্ছে কিনা স্তেপানের তাতে কিছু যায়-আসে না। সে তখন লজ্জায় আর আনন্দে বিভোর হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা তখন ওকে জায়গা ছেড়ে নড়াতে কিংবা ঘর থেকে বের করতে পারে।

ইয়েগোর থমকে দাঁড়ালেন। ওদিকে ভাস্‌কা তখন অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠেছে। সে-ও যেন আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে শুরু করেছে মনে হল।

'বসুন, বসুন। এককাপ করে চা খাওয়া যাক, কী বলেন?'

প্রথমটায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল এল্‌লা। কিন্তু এখন সে কথা বলছিল বেশ একটা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আর খানিকটা অন্য এক ধরনের — যাকে বলে স্থিরসংকল্প থেকে জাত — উৎফুল্ল ভাব নিয়ে।

অবশ্যম্ভাবী কী একটা যেন ঘটতে যাচ্ছে, আর তার জন্যে ঘরের সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষায় আছে।

'আমি বোধহয় চলে গেলে ভালো হয়, তাই-না?' ভাস্‌কা চেঁচিয়ে বলল। ওর গলাটা হতাশায় কেঁপে গেল একটু। ভাস্‌কা তলিয়ে যাচ্ছিল, অত্যন্ত

সহজে তলিয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু তবু নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা পর্যন্ত করছিল না।

'মনে নিচ্ছে চলে গেলেই ভালো হয়,' স্তেপানও চেঁচিয়ে জবাব দিল। ও-ও একটু তড়িঘড়ি বলে বসল কথাটা। ওভাবে তাড়াহুড়ো করাটা ওর উচিত হয় নি... তবে তা না-করে ওর উপায়ও ছিল না। ওদের দু'জনের মধ্যে একজনকে যেতেই হোত। দু'জনেই ঝগড়া করে চলেছিল আর একজনই মাত্র তার জন্যে এল্‌লার কাছে মার্জনা পেতে পারত।

এবার ভাস্‌কার পালা। সে-ও স্তেপানকে উপেক্ষা করে সোজা এল্‌লার দিকে তাকাল। আর এল্‌লাও ফের লাল হয়ে উঠে তাকাল ইয়েগোরের দিকে। ইয়েগোর তখনও ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে একবার এর একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চলেছেন। পুরোপুরি ধাঁধায় পড়ে গিয়েছেন তিনি। বিষণ্ণভাবে অল্প-একটু হেসে এবার এল্‌লা বলল:

'কী পরিস্থিতিতেই-না পড়া গেছে! কেউ যদি এ থেকে উদ্ধার করতে পারত। তা, আপনি অমন দাঁড়িয়ে আছেনই-বা কেন? বসুন-না!'

হাল্‌কা করে ও পা-টা একটু ঠুকলও বটে। পরিস্থিতিটা ওর পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে ভাস্‌কা এবার জ্যাকেট পরতে শুরু করল। কেন যেন ও খুব গড়িমসি করে জামাটা পরছিল। সকলেই ওর জামা পরার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল।

ভাস্‌কা বলল, 'তোমার জন্যে আমার করুণা হচ্ছে, স্তেপান।'

বলে ঘরের বাইরে চলে গেল। যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকাল ও, সবার দিকে চটুল বিদ্বেষভরা চোখে তাকাল একপলক, তারপর পেছনে দরজাটা দড়াম করে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

কপালের ঘামটুকু আস্তে-আস্তে মুছে ফেলল স্তেপান, তারপর মুখ টিপে হাসল।

'যা ইচ্ছা কর বাপু তোমরা আমি কেবল একফোঁটা মদ খেতে চাই,' টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে ইয়েগোর বললেন। 'এখেনে এই বে'র ঘটকালি করতে-করতে এসে আমি রীতিমতো দুব্বল হয়ে পড়েচি। সত্যি!'



পরীক্ষা

'কী ব্যাপার, এত দেরি কেন?' কড়াস্বরে শুধোলেন অধ্যাপক।

'আমি, মানে... আমি দুঃখিত... কাজ থেকে সোজা আসছি কিনা... একটা জরুরি অর্ডার ছিল...,' ছাত্রটি জবাব দিল। শাদাসিধে সরল মুখ, প্রকাণ্ড চেহারার ছেলেটি লেকচার-রুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। অকপট দুটি চোখ, তবে বোঝা যাচ্ছিল কোনোক্রমেই বোকা নয় ও।

'এস। একখানা প্রশ্নপত্র টেনে নিয়ে নম্বরটা আমায় বল।'

'সতেরো।'

'কী-কী প্রশ্ন আছে ওতে?'

'প্রথম প্রশ্ন হল "ইগরের অভিযাত্রার কাহিনী" সম্বন্ধে। দ্বিতীয় প্রশ্ন...'

'প্রশ্নপত্র তো ভালোই,' আগে অত কড়া ব্যবহারের জন্যে অধ্যাপক যেন একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, উত্তরগুলো তৈরি করে ফেল।'

প্রশ্নপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছাত্রটি ভাবতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ অধ্যাপক ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ জীবনে এমন কত হাজার তরুণ ছেলে-যে দেখেছেন তিনি তার ইয়ত্তা নেই। এদের শুধু ছাত্র হিসেবে ভাবতেই তিনি অভ্যস্ত। অথচ বাস্তবে এই বিশাল ছাত্র-বাহিনীর একজনও একেবারেই আরেকজনের মতো নয়, কখনও ছিলও না তা। এরা সবাই ভিন্ন-ভিন্ন, সবাই পৃথক।

'জীবন সমানে চলেছে অথচ সবকিছুই বদলে যাচ্ছে,' মনে-মনে ভাবলেন অধ্যাপক। 'সেকালে অধ্যাপকরা সত্যিসত্যিই নিজেদের শিক্ষাগুরু বলে গর্ব করতে পারতেন... কিন্তু এখন আমরা খালি প্রোফেসর, আর কিছু নই।'

'কী? আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?'

'না... না, ধন্যবাদ।'

পেছনদিকে জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন অধ্যাপক, তারপর একটা সিগারেট ধরালেন। সেকালের অধ্যাপকদের নিয়ে এই ধারণাটাকে আরও একটু বিশদ করতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু তার বদলে তাঁর চোখ পড়ল নিচে রাস্তার দিকে।

সন্ধে ঘনিয়ে আসছিল। রাস্তাটা যথারীতি কর্মব্যস্ত। একটা ট্রাম সাঁ-সাঁ করে চলে গেল, আর রাস্তার মোড় ফেরার সময় ট্রলির ডান্ডাটা থেকে লাল আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে গেল। একসার গাড়ি ট্র্যাফিক-আলোর কাছে জড় হয়ে ছিল, আলোগুলি চোখ-পিট্‌পিট করতেই সেগুলো ফের দৌড় লাগাল রাস্তা-বরাবর। ফুটপাথ ধরে লোক চলাচল করছিল। সকলেই ছুটে চলেছিল যেন।

অধ্যাপক ভাবলেন, 'আশ্চর্য তো! আমরা সর্বদাই এত ছুটে চলছি কোথায়? মনে হয় কোথাও-ই নয়। তবু ছুটছি-যে এটা তো ঠিক...'

'হুঁ...,' ছাত্রটি একটু নড়েচড়ে উঠল।

'কী? তৈরি হয়েছ তো? বল তাহলে,' জানলার কাছ থেকে সরে এলেন অধ্যাপক। 'বল, আমি শুনছি।'

মোটা-মোটা কড়া আঙুলে সরু কাগজের স্লিপখানা চেপে ধরেছিল ছাত্রটি। হাতে-ধরা কাগজখানা কাঁপছিল।

অধ্যাপক ভাবলেন, 'ছেলেটি নার্ভাস বোধ করছে। তা হোক, ওতে কোনো ক্ষতি হবে না ওর।'

ছাত্রটি শুরু করল, '"ইগরের অভিযাত্রার কাহিনী" — এক মহৎ শিল্পসৃষ্টি। এটি এক... এটি এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে রচিত হয় এই গ্রন্থ... হুঁ। গ্রন্থটিতে লেখক প্রকাশ করেছেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা...'

ছাত্রটির দিকে, তার কাটা-কাটা নাক-মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অধ্যাপকের খেয়াল হল যে কখন নিজের অজান্তে তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে 'কাহিনী'র অজানা লেখকও নিশ্চয়ই বয়সে তরুণ ছিলেন... খুবই অল্পবয়স ছিল তাঁর। লের্মন্তভের মতোই ব্যঙ্গবিদ্রূপে আর ধারালো উক্তিতে ঝলমলে ছিলেন তিনি।

'সেকালে ছোট-ছোট রাজ্যের রাজারা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছিলেন, অনৈক্যে

ভুগছিলেন তাঁরা, আর তাই... সাধারণভাবে বলতে গেলে গোটা রাশিয়াই তখন অনৈক্যে ভুগছিল। আর তাই যখন পোলভ্‌ত্‌সি রাশিয়া আক্রমণ করল...' বলতে-বলতে থেমে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভুরু কোঁচ্‌কাল ছেলেটি। ও নিজেই নিশ্চয় বুঝছিল যে বিবরণটা তেমন যুতের হচ্ছে না, কেমন শাদামাটা আর নীরস হয়ে যাচ্ছে। অল্প-একটু লাল হয়ে উঠেছিল ও।

'বোঝা যাচ্ছে, ও পড়াশুনো করে আসে নি।' তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অধ্যাপক ছাত্রের চোখের দিকে তাকালেন। 'না, বিষয়টা ও কখনোই পড়ে আসে নি। শুধু মুখবন্ধটুকু পড়েছে হয়ত! চুলোয় যাক এমন সব ছাত্র। "পত্রযোগে শিক্ষাদানের" গতি এছাড়া আর কীই-বা হতে পারে!' অধ্যাপক নিজে শিক্ষা-দানের এই পদ্ধতির বিরোধী। এ-সম্বন্ধে নিজের মতামত জানিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ ছাপাতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তা ছাপায় নি। কিছু-কিছু লোক তো তাঁর মতামত শুনে রীতিমতো মর্মাহতই হয়েছিলেন। 'কিন্তু এই ব্যাপারটা কি আরও বেশি মর্মাহত হওয়ার মতো নয়? শোন একবার ছোকরার কথা, অনৈক্যে-ভোগা ছোট-ছোট রাজাদের নিয়ে ওর জ্ঞানের বহরটা দ্যাখো একবার!'

'"কাহিনী"টা তুমি কি পড়েছ?'

'হ্যাঁ, মানে দেখেছিলাম একবার... হুঁ, মানে...'

'লজ্জা করে না তোমার?' অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ অসম্ভব জ্বালা-ধরানো। উত্তরের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

ছেলেটি টকটকে লাল হয়ে উঠল।

'যথেষ্ট সময় পাই নি, প্রোফেসর। আমার কাজটা খুবই জরুরি ছিল। জিনিসটা বানানোর জন্যে একটা বিশেষ ফর্‌মাশ ছিল...'

'তোমার কাজের কী ফরমায়েশ ছিল না-ছিল তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। যদি তুমি জানতে চাও তো বলি, আমার যাতে যায়-আসে তা হল সেই ব্যক্তি, সেই রুশ ব্যক্তিটি, যে নাকি তার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গ্রন্থটি পড়ে ওঠার সময় পায় না, তাকে নিয়ে। তাকে নিয়েই আমার যত মাথাব্যথা, বুঝলে?' প্রকাণ্ড, বড়সড় চেহারার ছোকরাটির প্রতি কেমন একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা বোধ করলেন অধ্যাপক। বললেন, 'তুমি কি নিজের ইচ্ছেয় এই কোর্সে ভর্‌তি হয়েছিলে?'

বিষণ্ণভাবে ছাত্রটি ওঁর দিকে মুখ তুলে তাকাল। বলল:

'নিশ্চয়ই।'

'এ থেকে তুমি কী পাবে বলে আশা করেছিলে?'

'কিসের থেকে?'

'এই কোর্সটা থেকে। নাকি, এতে ভর্তি হয়েছিলে কাজের জায়গায় পদোন্নতি ঘটতে পারে এই আশায়?'

কিছুক্ষণ ওঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরে ছাত্রটি মৃদুস্বরে বলল, 'এর কোনো দরকার ছিল না।' মাথাটা নামিয়ে নিল ও।

'কিসের দরকার ছিল না বলছ?'

'আপনার এতসব কথা বলার...'

'বাঃ, চমৎকার!' উরুতে চাপড় মেরে বলে উঠলেন অধ্যাপক। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। 'চমৎকার! ঠিক আছে, আমি নয় কোনো কথা না-বললুম। কিন্তু তুমি তোমার কাজের জন্যে লজ্জিত তো, নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি লজ্জিত।'

'যাক, অন্তত সে-জন্যেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

মিনিটখানেক দু'জনেই চুপ করে রইলেন। ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে পায়চারি করতে-করতে অধ্যাপক ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে আর মাথা নাড়তে লাগলেন। চটে যাওয়ায় তাঁর বয়স সত্যিসত্যিই কমে গেছে বলে বোধ হচ্ছিল।

এদিকে ছাত্রটি তার জায়গায় নিস্পন্দ হয়ে বসে 'ভালো' প্রশ্নপত্রটির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল... মিনিটখানেকের জন্যে এ-সবকিছুই যেন খানিকটা তামাসা বলে মনে হল তার।

'আমাকে অন্য কিছু জিজ্ঞেস করুন-না।'

'আচ্ছা, বল দেখি, "কাহিনী"টি কোন শতাব্দীতে লেখা?' দেখা গেল চটে গেলে শিশুর মতোই একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারেন অধ্যাপক।

'দ্বাদশ শতাব্দীতে — দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে।'

'বেশ। আচ্ছা, রাজা ইগরের কী পরিণতি ঘটেছিল?'

'রাজা ইগর বন্দী হয়েছিলেন।'

'বেশ। রাজা ইগর বন্দী হয়েছিলেন। ধেৎ, চুলোয় যাক সব!' ফের উরুতে চাপড় দিয়ে দাড়ির গোছা নাড়লেন অধ্যাপক। সম্ভবত রাজা ইগর বন্দী হয়েছিলেন বলে, কিংবা হয়তো আরও বেশি করে এমন বোকার মতো কথাবার্তা চালাচ্ছেন বলেই অমন দারুণ বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি।

পরিহাস করা তাঁর ধাতে ছিল না, তাছাড়া তিনি সত্যিই সাংঘাতিক

চটে গিয়েছিলেন। আরও বিরক্ত হচ্ছিলেন এইজন্যে যে নিজেকে আর ছাত্রটিকে তিনি এমন উদ্ভট 'পড়া-পড়া' খেলায় জড়িয়ে ফেলেছিলেন যে বলার নয়! অদ্ভুত ঠেকলেও ওই মুহূর্তে তরুণ ছেলেটির ওপর একই সঙ্গে তিনি যেমন চটে গিয়েছিলেন তেমনই সহানুভূতিও বোধ করছিলেন।

'ভারি বিরক্তিকর! আচ্ছা বল, ইগর কী করে বন্দী হলেন?'

'নিজেকে অত বিচলিত করে না-তুলে আমাকে যা মার্কা দেবার দিয়ে দিন,' হঠাৎ বলে উঠল ছাত্রটি। তারপর উঠে দাঁড়াল।

ওর এই ঠেস-মারা কথায় এবার ধাতস্থ হলেন অধ্যাপক। ফের চেয়ারে বসলেন তিনি।

'আচ্ছা, আচ্ছা। রাজা ইগর সম্বন্ধেই আলাপ করা যাক। বল দেখি, বন্দী হওয়ার পর তাঁর মনের ভাব কেমন হয়েছিল? কী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো!'

ছাত্রটি তবু বসল না। বলল:

'আমাকে ফেল করিয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিন দয়া করে।'

'বন্দী হওয়ার পর রাজা ইগরের মনোভাব কেমন হয়েছিল?' ফের ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক। 'যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পর একজন রুশী কেমন বোধ করে? এটুকুও তুমি বোঝ না নাকি?'

স্বচ্ছ ধূসর চোখদুটো মেলে অদ্ভুতভাবে অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ছাত্রটি।

পরে বলল, 'বুঝি বৈকি।'

'ও, বোঝ তাহলে... তারপর?'

'আমি নিজেই বন্দী হয়েছিলাম।'

'ও... তার মানে? কোথায়?'

'জার্মানদের হাতে।'

ছাত্রের দিকে তীক্ষ্নচোখে এক-নজর তাকালেন অধ্যাপক। আর আবারও হঠাৎ তাঁর মনে হল যে 'কাহিনী'র কথাকারও নিশ্চয় বয়সে তরুণ ছিলেন, অত্যন্ত স্বচ্ছ হালকা-নীল চোখওয়ালা তরুণ ছেলে।

'বেশিদিন বন্দী হয়ে ছিলে নাকি?'

'তিন মাস ছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী?'

ছাত্রটি তাকাল অধ্যাপকের দিকে, অধ্যাপক — ছাত্রের দিকে। দু'জনেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

'বোসো, বোসো। দাঁড়িয়ে আছ কেন?' অধ্যাপক বললেন। 'তুমি কি ক্যাম্প থেকে পালিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' বলে ছাত্রটি বসল। প্রশ্নপত্রটা হাতে তুলে নিয়ে ফের সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। ভাবছিল, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়া যায় ততই ভালো।

'কীভাবে পালালে তুমি? গল্পটা বল, শুনি।'

'রাত্তিরবেলা। আমরা তখন মার্চ করে এক-জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছিলাম।'

'আরও বিশদে বল,' অধ্যাপক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'কীভাবে গল্প বলতে হয় শেখ, ছোকরা! গুছিয়ে গল্প বলতে পারা প্রত্যেকেরই উচিত। বল দেখি, কীভাবে পালালে তুমি? সত্যি বলতে কী, এ-ব্যাপারের টেক্‌নিক্যাল দিকটা জানতে আমি তত বেশি উৎসাহী নই। আমি জানতে চাই ব্যাপারটার... ব্যাপারটার মনস্তাত্ত্বিক দিকটা। কেমন বোধ করছিলে তুমি? বন্দী হওয়াটা মনের দিক থেকে নিশ্চয়ই ভারি যন্ত্রণাদায়ক, তাই-না?' অধ্যাপকের চাউনিটা কঠোর আবার সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা তোমার বেলায় ঘটল কী করে? যুদ্ধে আহত হয়েছিলে?'

'না। আমরা ঘেরাও হয়ে গিয়েছিলাম... সে এক মস্ত লম্বা কাহিনী, প্রোফেসর।'

'তাতে কী! তুমি-যে দেখছি মহা ব্যস্ত লোক হে!'

'না, ব্যস্ত বলে নয়, তবে...'

'তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?'

'নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, ভয় পাওয়ারই কথা,' কী কারণে যেন ছাত্রের উত্তরটা অধ্যাপকের মনে ধরে গেল। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, বোধহয় গাঁয়ের কথা তোমার মনে পড়ে গিয়েছিল তখন, তাই-না? আর মায়ের কথা?.. তখন বয়স কত ছিল তোমার?'

'আঠারো বছর।'

'গাঁয়ের কথা মনে পড়ে নি তোমার?'

'আমি শহরের ছেলে।'

'সত্যি? কেন যেন আমার মনে হয়েছিল তুমি গাঁয়ের ছেলে। তাই বল...'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। ছাত্রটি তাকিয়ে ছিল তার অপয়া প্রশ্নপত্রটার দিকে। অধ্যাপক তাঁর অ্যাম্বারের সিগারেট-হোল্ডার নিয়ে লোফালুফি করছিলেন আর লক্ষ্য করছিলেন ছাত্রটিকে।

'নিজেদের মধ্যে ওখানে কী নিয়ে কথাবার্তা বলতে তোমরা?'

'কোথায়?' মুখ তুলে তাকাল ছেলেটি। স্পষ্ট বোঝা গেল, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে তার কষ্ট হচ্ছে।

'বন্দীশিবিরে।'

'কিছু নিয়েই নয়। কীই-বা কথা বলার ছিল ওখানে?'

'আঃ, সত্যিই তো, খুব খাঁটি কথা!' বলতে-বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক। দাঁড়িয়ে উঠে সিগারেট-হোল্ডারটা এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান করে দিয়ে বক্তৃতামঞ্চের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত লম্বা-লম্বা পা ফেলে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। বললেন, 'খু-উ-ব খাঁটি কথা। তা, তোমার নাম কী হে?'

'আজ্ঞে, নিকোলাই।'

'কথাটা-যে খাঁটি তা তুমি বুঝতে পেরেছ?'

'কোন কথাটা খাঁটি?' বলে বিনীতভাবে হাসল ছাত্রটি, তারপর প্রশ্নপত্রটা ডেস্কে নামিয়ে রাখল। কথাবার্তাটা কেমন যেন অদ্ভুত দিকে মোড় নিয়েছে, কেমন-যে আচরণ করা উচিত ও নিজেই তা ঠিকঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'তুমি-যে সে-সময়ে কথা বল নি এটা খুবই ন্যায্য ব্যাপার। সত্যিই তো, কীই-বা বলবার ছিল? একেবারে খাঁটি কথা। শত্রুর হাতে বন্দী অবস্থায় মানুষের চুপচাপ থাকাই উচিত অবশ্য। তাতেই বুদ্ধির পরিচয় দেয়া হয়। আচ্ছা, তুমি কখনও কিয়েভ গেছ?'

'না তো।'

'ওই শহরে একটা মহল্লা আছে, তার নাম পদোল। মহল্লাটার একটা অংশ পাহাড়ি আর ভারি উঁচু। ওখানে দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। যখনই আমি ওই দৃশ্য দেখেছি তখনই মনে হয়েছে যেন আমি ওখানে আগে কখনও গেছি। ঠিক এ-জীবনে নয়, যেন কয়েক শো বছর আগে গেছি। কথাটা বুঝতে পেরেছ?' অধ্যাপকের মুখে জটিল অনুভবের আলোছায়ার খেলা চলছিল। প্রায় দৈবক্রমেই বলা যায়, মনের গোপন কথাটুকু তিনি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। আর এখন, ছেলেটি তাঁর

কথা বুঝছে না ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত, ভাবছেন কথাটা না-বললেই বুঝি ভালো করতেন। একই সঙ্গে কঠোর আবার সহৃদয় হবার চেষ্টা করতে-করতে ভয়ে-ভয়ে ছাত্রের দিকে তাকালেন তিনি।

ছেলেটি কাঁধদুটো ঝাঁকাল। স্বীকার করল, 'ব্যাপারটা একটু জটিল ঠেকছে।'

'কেন? এতে জটিলতার কী আছে?' লেকচার-রুমের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হেঁটে গেলেন অধ্যাপক। নিজের ওপর সাংঘাতিক চটে গেছেন তিনি, কিন্তু যে-কথা বলতে শুরু করেছেন তা শেষ না-করেও উপায় নেই। স্পষ্ট করে জোরে-জোরে তিনি বলে চললেন, 'আমার মনে হয়েছে ওই দূরের পথ ধরে বহু-বহুদিন আগে আমি যেন হেঁটে গেছি। হেঁটে গেছি সেই ইগরের কালে। একথা যদি এখন এই বয়সে আমার মনে হোত তাহলে ভাবতুম বার্ধক্যের ভীমরতির ফল এটা। কিন্তু তা তো নয়, সেই তরুণ বয়সেও আমার এমন অনুভূতি হয়েছে। তা, তুমি কী বল?'

এরপর কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। পরস্পরের দিকে দু'জন তাকিয়ে রইলেন শুধু। আলোচনার সূত্রটা দু'জনেই হারিয়ে ফেলেছেন মনে হল।

'ঠিক বুঝলাম না,' আলতোভাবে বলল ছাত্রটি। 'পদোলের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক কী?'

'পদোলের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক এই দিক থেকে যে বন্দী অবস্থায় তুমি-যে কথা বলতে না তোমার এই মন্তব্যটা আমার কাছে অত্যন্ত সঠিক বলে মনে হল। কেন বল তো? আমি তো নিজে কখনও বন্দী হই নি, কোনোদিন যুদ্ধেই যাই নি বলে, কিন্তু ওখানে — পদোলের ওই উঁচু জায়গাটায় উঠে কী যেন এক অদ্ভুত উপায়ে যুদ্ধের সবকিছু ধরনধারণ বুঝতে পেরে গেছি। যেমন ধর, আমি বুঝেছি যে যুদ্ধে বন্দী হলে মানুষ চুপ করে থাকে। শত্রুর জেরার মুখে নয় — সে-সম্বন্ধে সবকিছুই তো বই বা কাগজপত্র পড়ে জানা যায় — আমি বলছি বন্দীদের নিজেদের মধ্যে। আসলে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, এই আর-কি। পাহারাদার রক্ষীদের সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করা দরকার, সে-সমস্যাটা নিয়েও প্রায়ই চিন্তা করেছি। সবচেয়ে ভালো উপায় নিশ্চয়ই তাদের সন্ত্রস্ত করে তোলা। চুপিচুপি ওদের কারও কাছে ঘেঁষে এসে খুব শান্তভাবে তাকে কিছু-একটা প্রশ্ন করা দরকার। যেমন ধর, প্রশ্ন করতে পার, "বলতে পারেন এখন ক'টা বেজেছে?" শুনে

সে তো হতভম্ব হয়ে পড়বে, আর সেই সুযোগে তুমি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পার।'

শুনে ছেলেটি হাসল।

'কী? আমি আবোলতাবোল বকছি?' ছাত্রের মুখের দিকে সন্ধানী চোখে তাকালেন অধ্যাপক। তিনি আশা করছিলেন যে এ-কথার জবাবে দারুণ খুশির সুরে জোরগলায় সে বলে উঠবে, 'নিশ্চয়ই না, প্রোফেসর! আপনি একেবারে যথার্থ বলেছেন।'

কিন্তু ছেলেটি একটু বেশি তাড়াতাড়িই যেন বলে উঠল, 'তা কেন?.. আপনি কী বলতে চাইছেন মনে হয় আমি তা বুঝেছি।'

অধ্যাপক বুঝলেন যে ছাত্র তাঁর কথা মোটেই বোঝে নি। কেমন যেন চুপসে গেলেন তিনি, তবু মনে হল কথাটা আরও খানিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো দরকার। বললেন:

'এর কারণ হল এই যে আমাদের দেশকে অনেক-অনেক লড়াই করতে হয়েছে। আর সংঘাতিক সব কঠিন লড়াই। এইসব যুদ্ধের প্রায় সব ক'টাই ছিল জনযুদ্ধ আর এদের জন্যে গোটা দেশের মানুষকে অসম্ভব দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছে। এমন কি যে-লোক এই ধরনের যুদ্ধে সরাসরি যোগ দেয় নি সে-ও দেশের মানুষের মনোকষ্ট আর দুঃখদুর্দশার শরিক হতে বাধ্য হয়েছে। এসব আমি বই পড়ে শিখি নি, বুঝেছ! এসব মর্মে-মর্মে অনুভব করেছি, বিশ্বাস করেছি এসব।'

অধ্যাপক কথাগুলো বলার পর দু'জনেই ওঁরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সামলে উঠতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। যেভাবেই হোক ওঁদের সেই মূল প্রশ্নের আলোচনায় ফিরে আসার দরকার ছিল, সেই 'ইগরের অভিযাত্রার কাহিনী'তে, ছাত্রটি এই মহৎ সাহিত্যকৃতি পড়ার ব্যাপারে যে-লজ্জাজনক অবহেলার পরিচয় দিয়েছে সেই বিষয়টিতে ফিরে আসার দরকার ছিল ফের। তবু অধ্যাপক তাঁর শেষ দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস না-করে কিছুতেই পারলেন না। শুধোলেন:

'তুমি কি একা পালিয়েছিলে?'

'না। দলে আমরা সাতজন ছিলাম।'

'বোধহয় তুমি ভাবছ, আচ্ছা কৌতূহলী আর ঘ্যানঘেনে বুড়োর পাল্লায় পড়া গেছে, তাই-না?'

'না-না, মোটেই নয়! একেবারেই নয় তা,' বলতে-বলতে ছেলেটি লাল হয়ে

উঠল, যেন ঠিক ওই কথাটাই সে ভাবছিল। 'সত্যি, প্রোফেসর, আপনি যা বললেন তা দারুণ ইণ্টারেস্টিং।'

বৃদ্ধ অধ্যাপকের বুকখানা অল্প-একটু দুলে উঠল এ-কথায়। বললেন:

'ভালো হোক তোমার, সৈনিক। তুমি-যে আমায় বুঝেছ এজন্যে আমি খুশি। "কাহিনী"টা অবশ্য তোমার পড়ে ফেলা উচিত। আমি তোমাকে বইখানা উপহার দেব... আমার সঙ্গে একখানা বাড়তি কপি আছে...' ব্রিফকেস খুলে অধ্যাপক 'ইগরের অভিযাত্রার কাহিনী'র একখানা কপি বের করলেন, একমুহূর্ত কী ভাবলেন, তারপর মুচকি হেসে ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'তুমি আমায় ভীমরতি-ধরা বুড়ো ভাবছ না তো? ঠিক বলছ?'

'না-না, নিশ্চয়ই না, প্রোফেসর!' ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠল ছাত্রটি।

'ভালো,' বলে বইয়ের মলাটের ওপর দ্রুতহাতে কী যেন লিখলেন অধ্যাপক, তারপর ছাত্রকে বইখানা দিলেন। বললেন, 'এখনই এটা পোড়ো না, বাড়ি গিয়ে ধীরেসুস্থে পোড়ো। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ যে অপটু প্রণয়ীর মতো আজ আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। কখনও-কখনও এর জের খুবই অপ্রীতিকর হয়ে থাকে।'

এ-কথার জবাবে কী-যে বলা উচিত তা ভেবে পেল না ছাত্রটি। সে কেবল অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাঁকাল একটু।

'আচ্ছা, তোমরা সাতজনই কি প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও কি তোমরা নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র লেখালেখি কর?'

'না। বোঝেন তো যে-কোনো কারণেই হোক সেটা...'

'নিশ্চয়ই, বুঝি বৈকি। অবশ্যই। বুঝলে হে, এটাই হল গিয়ে আমাদের রুশী ধরন। আর দ্যাখো, তুমি কিনা এখনও সেই 'কাহিনী'খানাই পড়তে চাও না। অন্য সমস্ত কথা-কাহিনীর মধ্যে এটাই হল গিয়ে সবচেয়ে চমৎকার, সবচেয়ে বেশি রুশী মেজাজের! যেমন ধর, "সুলার ওপার অশ্বহ্রেষায় মুখর; বিজয়ঘণ্টা ধ্বনিত হতেছে কিয়েভে; নভ্গোরদ উত্তাল ভেরীধ্বনিতে; পতাকায়-পতাকায় হিল্লোলিত পুতিভ্ল।" কী? কেমন মনে হয়?' বলতে-বলতে একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরলেন অধ্যাপক, যেন এই আশ্চর্য কাহিনীর শেষ পংক্তিগুলোর গমগমে আওয়াজ তখনও কান পেতে শুনছেন। হঠাৎ বললেন, 'দাও দেখি তোমার প্রোগ্রেস-কার্ডখানা।' কার্ডখানায় কী-একটা

লিখে সেটা বন্ধ করে ছাত্রটিকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর নীরসকণ্ঠে বললেন, 'বিদায়।'

লেকচার-রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল ছেলেটি। কপাল থেকে ঘামের ফোঁটাগুলো মুছে ফেলে নির্জন করিডরটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তখনও হাতে তার প্রোগ্রেস-কার্ডখানা ধরা। সেখানা খুলে দেখতে ভয় পাচ্ছিল সে, ভয় পাচ্ছিল পাছে তাতে 'ভালো' কিংবা আরও সাংঘাতিক 'চমৎকার'এর মার্কা থাকে। নিজের কাছেই সে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

ভাবল, 'মন্দ নয়'এর মার্কা পেলেই বর্তে যাব।' লেকচার-রুমের দরজার দিকে একবার ফিরে তাকাল, কার্ডখানা খুলে সেদিকে তাকিয়ে রইল অনুভূতিহীন ভোঁতা চোখে, তারপর ফের একবার ফিরে লেকচার-রুমের দরজার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে এক-ঝলক হেসে হাঁটতে শুরু করল। কার্ডে মার্কা দেয়া হয়েছিল 'খারাপ'এর।

বাইরে এসে উপহার-পাওয়া বইখানার কথা মনে পড়ল তার। খুলে দেখল তাতে লেখা আছে:

'পড়াশুনো কর, সৈনিক। পড়াশুনোটাও বড় সহজ কাজ নয়। — অধ্যাপক গ্রিগোরিয়েভ।'

ছেলেটি এবার ইন্‌স্টিটিউটের জানলাগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার মনে হল অধ্যাপককে যেন একটা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

সত্যিই জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অধ্যাপক। নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে জানলার কাচে আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন।



একই মাটির মানুষ

রাত্রে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, দূর থেকে শোনা গেছে মেঘের গর্জন... কিন্তু তারপর চন্‌মনে সকাল কুয়াশার মতো মেঘের ভেতর থেকে তাড়িয়ে বের করে এনেছে সূর্যকে, কাঁপাকাঁপা ভিজে পাতার ওপর থেকে এখন গড়িয়ে পড়ছে তরল রুপোর ধারা। খোয়াইয়ের খোঁদলগুলোয় এতক্ষণ স্তূপ-স্তূপ কুয়াশা জড় হয়ে ছিল, এবার সেগুলো একান্ত অনিচ্ছায় মাটি ছেড়ে উঠে যাচ্ছে।

মৃত্যুর কথা শান্তভাবে চিন্তা করা হল একমাত্র বুড়ো মানুষের কাজ। আর তখনই জীবনের যা-কিছু মনোরম আর চিরন্তন সৌন্দর্য এতকাল অজানা ছিল তার কাছে তা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। কেউ যেন তাকে দিয়ে সেই সবকিছু মর্মন্তুদভাবে অনুভব করিয়ে নিতে চায় শেষবারের মতো। আর তারপর চলে যায় অক্লেশে।

সত্যি, সবাই ওরা চলে যায়। আর ওদের চলে যাওয়ার বিলীয়মান আওয়াজটুকু ভারি নরম আর মন্থর শোনায়, পথক্লান্ত ঘোড়ার মুখে-পরানো লাগামের প্রান্তের ঝুন্‌ঝুন আওয়াজের মতো। জীবনটা কী ভালো, কী পাগল-করা ভালো ছিল জীবনটা। আঃ, কেবল যদি যাওয়ার সময়টা ঘনিয়ে না-আসত!

ভিজে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিল পাকাচুলো এক বুড়ো। গোরুর জন্যে ঘাস কাটতে যাচ্ছিল ও।

গ্রামখানা ওর পেছনে পাহাড়ি জমির খোঁদলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। বুড়ো চলেছিল কুচুগুরির দিকে। আল্‌তাইয়ের পাহাড়তলিতে প্রকাণ্ড, উঁচুনিচু ঢেউখেলানো একটা উপত্যকার নাম কুচুগুরি। কাছাকাছি কোনো-

একটা টিলার মাথায় পৌঁছুলে হঠাৎ দেখা যায় গোটা উপত্যকাটা ছড়িয়ে আছে চোখের সামনে আর তার তিনদিকে নিঃশব্দ পাহাড়ের দেয়াল তোলা। অবাধ সবুজের মস্ত একটা এলাকা, যেখানে মানুষ গোরুর ঘাস কেটেছে কত শতাব্দী ধরে কে জানে।

পাহাড়গুলোর 'কপালে' আর 'ঘাড়ে', অর্থাৎ চুড়োর ধার থেকে তাদের ঢালু গড়ানে অংশে, যে-ঘাস্ জন্মায় তা এত উঁচু হয় যে ঘোড়ার পেট ছুঁই-ছুঁই করে। আর সেই ঢালুর গুহা-গহ্বরগুলো হিমেল ঠাণ্ডা হয়ে থাকে আর গহ্বরের তলাকার ঘন ঝোপগুলো থেকে কেমন একটা স্যাঁতসেতে ছাতাপড়া গন্ধ ওঠে। স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জলের ঝর্নাগুলো সেখানকার মরচে-রঙ উর্বর মাটি ফুঁড়ে ফুঁসে বেরিয়েছে। আঃ, কী মিষ্টি জল ঝর্নাগুলোর! ইচ্ছে যায় ওখানে দুদণ্ড বসে থাকতে, ওই কনকনে আধো-অন্ধকারে, আর ওখানে বসলে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়, কেমন একা-একা ঠেকে। অবশ্য আপনি বেঁচে আছেন না নেই তা নিয়ে কোথাও কারো-না-কারো মাথাব্যথা তো থাকবেই... ব্যাপারটা তা নয়, তবু কেমন যেন... সে যাই হোক, এ বড় রহস্য কিন্তু। প্রকৃতির এই-যে অসহ রূপ, এ কিসের জন্যে? এ নিয়ে কীই-বা করবার আছে আপনার?... এ রূপ ভালো করে না-তাকিয়ে দেখেই চলে যেতে হয় আপনাকে, এটাই হল গিয়ে দুঃখের কথা...

আর তারপর গুহা থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এলে পর আপনার মনখারাপ হয়ে যাবে, নিজের বিষণ্ণতার আমেজটুকু নষ্ট হয়ে গেল বলে। মনে হবে ভোরবেলাকার মতোই প্রশান্ত আর সুকুমার কী একটা ভাব যেন এইমাত্র আপনার মনকে অধিকার করে ছিল, মনটা আপনার ভরে উঠেছিল পুলক-শিহরণে, আপনি চাইছিলেন সেই শিহরণটুকু অন্তরের অন্তস্তলে ধরে রাখতে। কিন্তু না, তা হবার নয়। কত রকমের ভাবনা-যে ভিড় করে আসবে মাথার মধ্যে আর আপনি ভুলে যাবেন পুলকিত হতে...

সূর্য আকাশে চড়ছে ক্রমশ। কুয়াশার রাশ ওপরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাটির গা থেকে ভাপ উঠছে একটু-একটু। কিন্তু এই ভাপে সূর্যের আলো ঢেকে যাচ্ছে না, কেবল মাটিতে পৌঁছনোর আগে আলোর ফলাগুলোর দিক-পরিবর্তন ঘটছে, ফলাগুলো তির্যকভাবে ঘুরে যাচ্ছে অল্প-একটু ওপর দিকে।

বার্চগাছের পাতাগুলো এরিমধ্যে শুকিয়ে উঠেছে, তবে সদ্যধোয়া কচি কোমলতাটুকু এখনও মেখে রয়েছে সর্বাঙ্গে। উত্তাপে ঝলমল করছে তারা।

সকালের পরিব্যাপ্ত নিথরতা গানে-গানে চিরে দিচ্ছে অদৃশ্য পাখিরা।

ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে চারদিক। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে উত্তাপ নিথর স্যাঁতসেঁতে উপত্যকায় আর ঘন সবুজ গাছগাছালির মাতাল-করা গন্ধে ম'-ম' করছে মাটি।

বুড়ো আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল, তবে নিজেকে ক্লান্ত করে তোলার মতো তত তাড়াতাড়ি নয়। ওর দেহ এখন আর আগের মতো তেমন পোক্ত নয়, কাজেই বুঝেসুঝে শক্তিক্ষয় করা দরকার।

অবশেষে বুড়ো এসে পেঁছুল তার বরাদ্দ ঘাসকাটার জমিটাতে। রাস্তার ঠিক পাশেই পাহাড়ি খাদের অল্প-গড়ানে একটা ধার আর তার নিচে ছোট্ট একটা জলাজমি আর একটা ঝর্না।

সূর্য এতক্ষণে দিক-চক্রবাল থেকে বিঘতখানেক ওপরে উঠে গেছে। তার মানে, একটু দেরিই করে ফেলেছে বুড়ো।

রুটি আর সদ্য নুনে-জারানো শশা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে সকালের জলখাবারের পাট চুকিয়ে বুড়ো তার কাস্তেখানা ঠিকঠাক করে নিল, তারপর কাস্তের ফলায় শান-পাথরখানা ঘষল বারকয়েক।

আঃ, ঘাসকাটার মতো এমন কাজ আর হয় না। একা ঘাসকাটার কাজ পেলে বুড়োও আর কিছু চায় না। কাজটা ভারি পছন্দ ওর। এ-কাজে একা-একা সারাদিন ধরে কত কী ভাবার সময় পাওয়া যায়।

কাস্তেটা সাঁ করে ওপর থেকে নেমে এসে ঘচাং করে কোপ দিচ্ছে, কেঁপে-কেঁপে উঠে লুটিয়ে পড়ছে ঘাসের গোছা। তিন পা দূরে হঠাৎ একটা সাপ মাথা জাগিয়ে তাকাল... তারপর ঘাসের মধ্যে দিয়েই এঁকেবেঁকে পালিয়ে গেল। ওর নরম, গা-ঘিনঘিনে দেহটা ঝলমলিয়ে উঠল এক-ঝলক। আর সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দিনের একটা স্মৃতি জেগে উঠল বুড়োর মনে। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় একদিন ও বেশ জোরেই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘোড়াটা একটা সাপ দেখতে পেয়ে নাকি তার উপস্থিতি টের পেয়েই কে জানে, লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। আর আনিসিম ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে সোজা মাটিতে বসে পড়ল, আর পড়্‌বি তো পড়্‌ একেবারে সাপটার ঘাড়ে। এ-ঘটনার পর গোটা একটা সপ্তা ওর 'কোনোকিছু পেটে তলায় নাই'।

অতীত জীবনের তলা থেকে বড় আকাঙ্ক্ষিত সেই ফুরফুরে উজ্জ্বল

দিনগুলো হাঁটকে তুলে আনতে লাগল স্মৃতি। নিথর হ্রদের ঘোলা জলের তলা থেকে যেমন মাথা জাগিয়ে ওঠে পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের ফোয়ারাগুলো, তেমনি করে। সাপ… হ্যাঁ, সাপের কথায় মনে পড়ল সেকালে গাঁয়ে বাস করতেন বুড়ো ঠাকুর্দা কুদিয়েল্‌কা। গাঁয়ের বাচ্চাদের তিনি বলতেন যে একটা করে সাপ মারলে তাদের প্রত্যেকের চল্লিশটা করে পাপের স্খালন হয়ে যাবে। আর বলতেন, সাপকে আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারলে তার পেটে ডজনকয়েক খুদে-খুদে পা দেখা যায়। ফলে বাচ্চারা মহা-উৎসাহে তখন নিজেদের পাপক্ষালনে লেগে গিয়েছিল। সাপগুলোকে তারা পুড়িয়ে মারত, আর সাপগুলো যখন আগুনে কুণ্ডলী পাকিয়ে ছটফট করত তখন সত্যিই তাদের চকচকে পেটের নিচে অসংখ্য খুদে-খুদে শাদা পায়ের মতো কিসের যেন সব ছাপছোপ দেখা যেত। আর বাচ্চারা তখন সমস্বরে চেঁচাতে থাকত, 'ওই-যে! ওই-যে আরও কতগুলা!' সবাই তখন সাপের পেটে পা দেখতে পেত।

দুপুরের খাওয়ার সময় পর্যন্ত, ঘাসের শিশির পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া অবধি, ঘাস কেটে চলল বুড়ো। সূর্য এতক্ষণে জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ড হয়ে উঠেছে, বুড়োর মনে হচ্ছে কে যেন ওর মাথায় আগুনগরম একখানা সরুচাকলি চাপিয়ে রেখেছে।

যে-জমিটুকুর ঘাস কাটা হয়ে গেছে এক-নজর সেটা ঠাহর করে দেখে বুড়ো বলে, 'ভাগ্যি ভালো আমার, বলতে হবে।' সত্যি, বেশ খানিকটা জায়গা সাফ করে ফেলেছে ও। নিজের সকালবেলাকার কাজে নিজেই ও ভারি খুশি হয়ে উঠল।

কিছুদিন আগে ওর জন্যে বরাদ্দ ঘাসকাটার এই জমিটা দেখতে আসার সময় ও নিজের জন্যে ছোট্ট একটা আস্তানা বানিয়ে রেখেছিল। এখন সেই আস্তানায় গিয়ে ঢুকল বুড়ো। ভাবল, 'এবার বেশ ধীরেসুস্থে মৌজ করে দুপুরের খানা খাওয়া যাবে'খন।'

শুকনো ঘাসের ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধে ম'-ম' করছে আস্তানার ভেতরটা। কোথায় যেন ছোট্ট একটা পোকা কানে-তালা-ধরানো ঝিঁঝিঁর ডাক ডেকে চলেছে। উষ্ণ স্তব্ধতা ভরে রেখেছে ঘাসফড়িঙের নীরস অক্লান্ত গুঞ্জন। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে থেকে-থেকে ঝাঁপ-খেয়ে-পড়া রুপোলি ভরতপাখির কাঁপা-কাঁপা গানের সুর।

আঃ, কী ভালোই-যে লাগছে এখন!.. ভালো লাগা আর ভালো-যে লাগছে

এটা বুঝতে পারার সুযোগ মানুষ কালেভদ্রে পায়। মানুষ যখন ভালো বোধ করে না একমাত্র তখনই সে ভাবে, 'না জানি অন্যেরা জীবনটা কতই-না উপভোগ করছে।' কিন্তু আমরা নিজেরা যখন জীবনটা ভোগ করি তখন একবার ভুলেও ভাবি না যে অন্য কারো পক্ষে জীবন হয়তো ততটা সুখের নয়। সবকিছু যখন ভালোভাবে চলে তখন সবই বেশ ভালো ঠেকে। ব্যস চুকে গেল, আর কিছু ভাববার দরকার নেই।

ঘাসের ওপর পরিষ্কার রঙ্‌চটা একটুকরো কাপড় বিছিয়ে বুড়ো তার ওপর একগাদা শশা, রুটি আর বসন্তের নতুন-ওঠা পরিষ্কার পেঁয়াজ রাখল... তারপর নেমে গেল নিচের ফোয়ারাটার কাছে। ফোয়ারার জলে ও ডুবিয়ে রেখে এসেছিল শক্ত করে ন্যাকড়ার ছিপি-আঁটা একবোতল দুধ। জলের ধারাটার ভিজে আঠালো মাটির পাড়ের ওপর দু'হাতের ভর রেখে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ল বুড়ো, তারপর অনেকক্ষণ ধরে জল খেল। তবে তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো চোঁ-চোঁ করে নয়। জল খেতে-খেতে ও দেখতে পাচ্ছিল জলের খাতের মরচে-লাল তলাটায় হালকা রঙিন বালির ছোট-ছোট কণাগুলো একে অপরের পেছনে কেমন দৌড়ুচ্ছে।

বুড়ো ভাবল, 'দ্যাখো কাণ্ড, এমনভাবে দৌড়ুচ্ছে ওগুলা যেন একবারে জ্যান্ত পেরানি।' কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে দুধের বোতলটা তুলে নিয়ে আস্তানায় ফিরল ও। দেখল, আস্তানাটার পাশে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর আরেকজন বুড়োমতো লোক বসে আছে। তার মাথায় নরম ফেল্টের টুপি আর দু'হাঁটুর ফাঁকে-গোঁজা একখানা ছড়ি। লোকটা সিগারেট খাচ্ছে বসে-বসে।

'শুভদিন,' টুপিপরা বুড়ো লোকটি আনিসিমকে সম্ভাষণ জানাল। 'দেখলাম কেউ একজন এখেনে আছে, তাই একটু বিশ্রাম করছিলাম জায়গাটায় বসে। আপনার এতে আপত্তি নেই তো? কী বলেন?'

'না-না, আপত্তি কিসের?' আনিসিম জবাব দিল। 'ভিত্‌রি আসেন। কুঁড়ের ভিত্‌রি তেমন গরম না।'

'সত্যি, আজ বড্ড গরম পড়েছে।' টুপি-মাথায় বুড়ো লোকটি আনিসিমের সঙ্গে আস্তানায় ঢুকল। তারপর ঘাসের ওপর বসে পড়ে বলল, 'দারুণ গরম, না কী বলেন?'

'ওর ভালো পেন্টুলটায় ঘাসের সবুজে ছোপ লেগে যাবে,' আনিসিম মনে-মনে ভাবল।

মুখে বলল, 'ইচ্ছা হলে আমার সাথে দু'এক গরাস খান-না কেনে।'

'না-না, ধন্যবাদ। খানা খেয়েছি বেশিক্ষণ হয় নি।' বলে টুপি-মাথায় বুড়ো এমন ধারালো চোখে একদৃষ্টে আনিসিমের দিকে তাকিয়ে রইল যে মুহূর্তের জন্যে কেমন অস্বস্তি বোধ করল ও। বুড়ো শুধোল, 'কী, ঘাস কাটতে লেগেছেন?'

'কী আর করা, কাটতে তো নাগবেই। মনে লিচ্চে আপনি এ-তল্লাটে লতুন নোক?'

'না, এ-তল্লাটেরই লোক আমি।'

শুনে আনিসিম একবার তার অতিথির দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

'কী, দেখে তা মনে হয় না বুঝি?'

'তা মনে হবে না কেনে? এ-তল্লাটে এখন হরেকরকম নোকের বাস।' শশা চিবুতে-চিবুতে আনিসিম লক্ষ্য করল যে অতিথির চোখ কাপড়ের টুকরোটার ওপর রাখা তার শাদামাটা চাষাড়ে খাবারের ওপর ঘুরছে। ভাবল, 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে লোকটার।'

ও আবার বলল, 'এক-আধ গরাস মুখে দ্যান-না কেনে।'

'না, আপনি খান। গোটা দুপুর আর বিকাল আপনারে এখন কাজ করতে হবে।'

'আরে না-না, অনেক বেশি খাবার আচে এখেনে!'

শহর-থেকে-আসা বুড়ো লোকটি এবার তার টুপি খুলে ফেলল, তারপর খাবারের কাছে ঘেঁষে বসল। টুপি খুলতেই মাথার চকচকে টাক বেরিয়ে পড়ল তার। আস্ত একটা শশা আর রুটির একটা টুকরো তুলে নিল লোকটি।

'আপনার সাথে খবরকাগজ নাই?' আনিসিম শুধোল।

'কেন বলেন তো?'

'সবুজে ছাপছোপ নেগে আপনার প্যান্ট লষ্ট হয়ে যাবে। অমন চমৎকার প্যান্টখান আপনার।'

'ও!.. তা, ছাপছোপ লাগুক গে যাক। আঃ, কী শশা!..'

'কেমন মনে লিচ্ছে?'

'ভারি মিষ্টি!'

'বলতেছেলেন আপনি এখেনকারই নোক... তা কোথাকার?'

'এই কাছাকাছির...

আনিসিমের বিশ্বাস হল না যে তার অতিথি ওদের তল্লাটেরই লোক। দেখতে-শুনতে ওকে মোটেই তেমন লাগছিল না।

অতিথি বলল, 'অবিশ্যি এখন আমি এখেনে থাকি না। তবে জন্ম আমার এ-অঞ্চলেই।'

'অ! তা, দেশ-গাঁ দেখতে এয়েচেন বুঝি?'

'দেশ-গাঁ একবার না-দেখলেই নয়... কোনদিন মরে যাব তার ঠিক নাই। তা, আপনার বাস কোন গাঁয়ে?'

'লোবিয়াজিয়েতে। এই রাস্তা ধরে সিধে গেলে পড়ে।'

'সংসারে মানুষ আপনারা দু'জনা?'

'হুঁহুঁ।'

'ছেলেপিলে নাই?'

'হ্যাঁ, আচে। তিনজনা। আরও দুইটা মারা পড়েচে নড়াইয়ে।'

'তা, সে তিনজনা থাকে কোথায়? শহরে?'

'কোল্‌কা থাকে শহরে। মেয়ে দু'টার বে হয়ে গেচে... এট্টা থাকে চেবুর্‌লাকে। তার বে হয়েচে ওখেনকার যৌথ খামারের এক কর্মিদলের নেতার সাথে। আরেট্টা মেয়ে আরও এট্টু দূরে থাকে।' এই দ্বিতীয় মেয়ের স্বামী যে রুশী নয় সে-কথাটা চেপে গেল আনিসিম। খালি বলল, 'গতবার বসন্তে নিন্‌কা বাপের বাড়ি এয়েছেল... ওর বাচ্চারা বেশ বড়সড় হয়ে উঠেচে এখন।'

'তা, কোল্‌কা কোন শহরে থাকে?'

'মানে, কখনও সে শহরে থাকে, আবার কখনও থাকে বাইরি। সবসময় ঘুরেফিরে বেড়াচ্চে আর-কি। ধাতু খুঁজে বেড়ানো ওদের কাজ।'

'কিন্তু কোল্‌কার শহরের নামটা কী?'

'লেনিনগ্রাদ। ও আমাদেরে পত্তর নেখে, ট্যাকাও পাঠায় মাঝেমাঝে... অবস্তা খারাপ না, বোঝলেন তো। খালি নেখে যে আমাদেরে দেখতে আসবে একদিন, কিন্তু কিছুতে সময় করে উঠতে পারে না এই যা দুঃখু। কে জানে, হয়তো আসবে কোনোদিন।'

শহরের বুড়ো লোকটি অল্প একটু দুধও খেল, তারপর রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছল।

'ধন্যবাদ। দিব্যি খাওয়া হল।'

'আরে, কী-যে বলেন!'

'এখন কি আপনি ফের ঘাস কাটতে যাবেন?'

'নাঃ, বিশ্রাম করব এট্টু।'

'আচ্ছা, কোল্‌কার বয়েস কত হল?' লোকটি ফের প্রশ্ন শুরু করল।

'ও জন্মেছেল বিশে...' কথাটার জবাব দেয়ার পর হঠাৎ আনিসিম এই ভেবে অবাক হল যে তার অতিথি এতসব প্রশ্ন শুধিয়ে চলেছে কেন। অতিথির দিকে একপলক তাকাল ও...

এই তাকানোর জবাবে লোকটি অল্প-একটু হাসল। সে হাসি বিশেষ খুশিরও নয়, আবার দুঃখেরও নয়।

'হ্যাঁ, আমরা একই মাটির মানুষ...,' বলল লোকটি।

'লোকটা অদ্ভুত তো,' আনিসিম ভাবল। 'ঠাট্টা করছে না নিশ্চয়, যথেষ্ট বয়স হয়েছে লোকটার।'

'আপনার শরীরগতিক কেমন?' শহুরে লোকটি প্রশ্ন করেই চলেছে।

'পের্‌ভুর কৃপায় তেমন এট্টা খারাপ না... মাঝেমাঝে মাথায় যন্তন্না হয় অবিশ্যি। তা, গাঁয়ের আদ্ধেক লোকের, ছেলেপিলেগুলারও ওই এক রোগ।'

'আত্মীয়স্বজন কাছাকাছি কেউ থাকে? ধরেন, ভাই কিংবা বোন?..'

'বহুকাল যাবৎ ওসবের বালাই নাই...'

'কী? মারা গেছে সব?'

'বোনেরা মারা গ্যাচে। আর ভাইটা আমার সেই পের্‌থম নড়াই থেকেই ফেরে নাই।'

'মারা গিইছিল?'

'লিচ্চয় তাই। যুদ্ধু থেকে না-ফেরার আর কী কারণ থাকতে পারে, বলেন?'

শহরের লোকটি সিগারেট ধরাল এবার। ধোঁয়ার নীলচে কুণ্ডলী ভেসে-ভেসে যেতে লাগল কুঁড়ের দরজার দিকে। কুঁড়ের সবুজাভ অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটাকে, কিন্তু দরজায় এসে খোলা হাওয়ার ঔজ্জ্বল্যে সঙ্গে সঙ্গে উবে গেল সেটা। অথচ বাইরে তখন একবিন্দু বাতাস ছিল না। কেবল ঘাসফড়িংগুলো চিঁচিঁ করে ডেকে চলেছিল, ঝোপে-ঝোপে কিচিরমিচির করছিল পাখিগুলো, আর ঝুঁটিওয়ালা ভরতপাখি পৃথিবীর উত্তপ্ত বুকে ঢেলে চলেছিল অঝোরঝরন গানের ঝর্না।

আস্তানার দরজাটার মুখে লম্বা একটা ঘাসের ডাঁটা বেয়ে একটা

গয়ালপোকা ওপরে উঠছিল। অটলভাবে নির্ভয়ে উঠে চলেছিল পোকাটা... আর দুই বুড়ো তা একমনে লক্ষ্য করছিল। গয়ালপোকাটা ঘাসের শিষের একেবারে ডগায় গিয়ে পেঁছুল, ডগায় পেঁছে এক-মুহূর্তের জন্যে একটু টলে উঠল, তারপর পাখা ছড়িয়ে দিয়ে পাশ করে উড়ে গেল ঘাসের ওপর দিয়ে।

'যদ্দুর বাঁচবার বেঁচে নিয়েছি আমরা,' শহরের বুড়ো লোকটি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল।

আনিসিম চমকে উঠল শুনে। কথাটা অদ্ভুতরকম চেনা ঠেকল তার। না, ঠিক কথাটা-যে তা নয়, বলার ধরনটা ভারি চেনা। চিন্তা করার সময় আনিসিমের বাবা কথা বলতেন ওইভাবে — সেইসঙ্গে হাসতেন ছোট্ট করে। কেমন যেন অবাক হওয়ার মতো হাসি। তারপর সবশেষে স্নেহভরে এক-আধটা গাল পাড়তেন।

'কথাটা ভাবলে আপনার মনখারাপ হয় না, দাদা?'

'তা হয়তো হয়। কিন্তু মনখারাপ করে মিথ্যে নাভ কী?'

'এ-বয়েসে হাতের কাছে সাহায্য করার মতন এক-আধজনা থাকা দরকার।'

'আপনার কি কোনো কষ্ট আচে?'

'আছে বৈকি। অনুশোচনা আছে... জীবনটা যথেষ্ট ভোগ করতে পারি নাই। ক্লান্ত হয়ে পড়ি নাই এখনও। মরার জন্যে তৈরি নই আমি।'

'হুঃ, কী কথাই বললেন!.. কবে কে জেবনটা যথেষ্ট ভোগ করতে পেরেচে তাই শুনি? কে ওখেনে সাধ করে শুতে চায় বলেন দিনি, ওই বুড়া মাটি-মায়ের বুকে?'

'কেন? কিছু-কিছু লোক তো আত্মহত্যাও করে।'

'যারা করে বোঝা নাগবে যে তারা অসুস্থ। মান্‌ষের ভিতরি কতকিছু গোলমাল হয়ে যেতে পারে। বাইরি থেকে তারে হয়তো খাসা দেখায়, কিন্তু তার মধ্যি আর পরান বলে পদাত্থ থাকে না। ভিত্‌রি-ভিত্‌রি সে তখন শেষ হয়ে গ্যাচে।'

'কেমন যেন মনে হয় আমরা সবকিছুর মূলে পেঁছাতে পারি নাই... বুঝি, এটা ভাবা মুর্খামি ছাড়া কিছু নয়। যতদূর পেরেছি ততদূর ঢুঁড়ে দেখেছি আমি।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শহরবাসী। পরে বলল, 'এমনধারা শান্তির জন্যে মনটা আমার হু-হু করে... বড্ড বেশি দাপাদাপি

করে জীবনটা কেটেছে। তবে অন্যেরে তো একদিন-না-একদিন জায়গা ছেড়ে দিতেই হয়, না কী বলেন?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই... হুঃ!'

'এমন একটা জায়গা খুঁজে পেতে চাই আমি যেখেনে থাকলে সবাই আমার কথা ভুলে যাবে আর সেখেনে আমি আরও শ-দুই বছর সব্বাইরে কলা দেখিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব। ইচ্ছাটা কেমন মনে করেন?' বলে বুড়ো আনন্দে হেসে উঠল। ওর মধ্যে, ওর হাসিতে কী যেন একটা ছিল যা আনিসিমের কাছে ভারি পরিচিত, একেবারে সচকিত করে তোলার মতো চেনা-চেনা ঠেকছিল। লোকটি ফের বলল, 'এমন একটা জায়গা খুঁজে পেতে ইচ্ছা হয় যেখেনে সবকিছু চিরকাল একই রকম থাকবে। আপনি কী বলেন?'

'আমার তো মনে লেয় অমন জেবন পেলে আপনি বিরক্ত হয়ে ওঠতেন।'

'কই, এখনও তো এ-জীবন আমার কাছে একটুকুনও অসহ্য হয়ে ওঠে নি!'

'মিত্যুর কথা আগে থেকে অত বেশি ভাববেন না, তাইলে ডরও নাগবে না আপনার। যখন আসার তখন আসবে মিত্যু... হয়তো তার আগে অল্প-একটুকুন অসুস্থ হবেন, তবে ভুগবেন না বেশিদিন!.. কত নোক তো হপ্তাখানেক ভুগতে-না-ভুগতেই কাবার হয়ে যায়।'

'তা অবিশ্যি যায়...'

'আপনি ভাবতেছেন আসচে দিনের কথা আর আমি খালি পেছন ফিরে-ফিরে জেবনটারে দেখচি। সেটাও খুব খারাপ, তাতে মেজাজ বিগড়ে যায়।'

'কী? পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো ভালোই।'

'ভালো হতে পারে, তবে তাতে বুকটাতে বড় খামচি নাগে। শুধু-শুধু নিজেরে উতলা করে নাভ কী, বলেন?'

'তা হলেও এটা ভালো কথা। তা, কোন সব দিনের কথা আপনার মনে পড়ে? ছেলেবয়েসের?'

'বেশির ভাগ ছেলেবয়েসেরই।'

'তা, আমাকেও কিছু-কিছু বলেন না! খুব দুষ্টামি করতেন বুঝি ছেলেবয়েসে?'

'দুষ্টামি করত আমার ভাই গ্রিন্‌কা। সে ছেল এক তাজ্জব ছেলে, ভারি তাজ্জব।' ভাইয়ের রকমসকম মনে পড়ায় হাসল আনিসিম। 'কোত্থেকে-যে

নানানধারা ফন্দিফিকির তার মাথায় আসত কে জানে!.. মনে লিচ্চে নড়াইয়ে গিয়েও সে লিচ্চয় অমনধারা করত — সবার আগভাগে এগিয়ে-এগিয়ে যেত...'

'ছেলেবয়েসে কী করত সে?' শহরের বুড়ো হঠাৎ ভারি কৌতূহলী হয়ে উঠে শুধোল। 'সে সম্বন্ধে কিছু বলেন-না... আপনি বিশ্রাম করছেন কিনা, তাই বলা আর-কি।'

'হুঃ!..' মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আনিসিম। পরে বলতে শুরু করল, 'ভারি চটপটে ছেলে ছেল ভাইটা, ভারি চটপটে ছেল... একদিন হয়েচে কী, আমাদের পড়শি ইয়েগোর চালিশেভ তার সব্জিখেতে পাকড়াও করল আমাদের দু'জনরে। তাম্পর চাব্কে পিঠের ছাল-চামড়া দিল তুলে। তবে সত্যি কথা বলব, শুধু-শুধু গায়ের ঝাল মেটাতে মোটেও না। তার খেতের তরমুজগুলা তখনও কাঁচা ছেল, আর আমরা যতটা না খেয়েছেলাম লন্ট করেছেলাম তার চেয়ে বেশি। আঁধারে ঠাহর করা যাচ্ছিল না কিছু। হাঁটুর গুঁতা দে' একেট্টা তরমুজ ভেঙে, তাম্পর একেক কামড় খেয়ে তরমুজটা কাঁচা দেখে সেটারে ফেলে দিচ্ছিলাম। এই হল গে ব্যাপার। ওঃ, যা রামধোলাই দিল আমাদেরে নোকটা, দেখবার মতন ধোলাই বটে একপ্রস্থ। তাম্পর বাপের হাতে আরেক প্রস্থ ভালোরকম জুটল কপালে। এতে গ্রিন্কার মেজাজ ওঠল টং হয়ে। মাথা খাটিয়ে সে কী ফিকির বার করল জানেন? বাড়িতে তখন সদ্য এট্টা শোর জবাই করা হয়েচে, সেই শোরের পেচ্ছাপের থলিটে নে' গ্রিন্কা সেটারে ছাইয়ের গাদায় ঘষতে নাগল... শোরের পেচ্ছাপের থলি দে' কী করে বেলুন বানায় আপনি জানেন তো?'

'জানি বৈকি।'

'তাম্পর থলিটে শুকিয়ে ফুঁ দে' ফুলিয়ে তুলল সেটারে, আর তার উপর ভয়ঙ্কর একখান মুখের পট আঁকল...' বলতে-বলতে খুক-খুক করে হেসে ফেলল আনিসিম। 'কোন ঠেঁয়ে-যে অমন একখান থোপনা দেখেছেল সে তা ভগাই জানে! তাম্পর সাঁঝবেলা অবধি অপিক্ষে করলাম দু'জনে। সাঁঝের আঁধারে চুপিসারে ইয়েগোরের বার-দরজায় গুঁড়ি মেরে গে' পেচ্ছাপের থলিখান দড়ি দে দরজার আড়ায় দেলাম বেঁধে... সক্কালবেলা ইয়েগোর দোর খুলতেই দ্যাখে সেই বীভৎস থোপনাখান একবারে সামনেই তার মুখের পানে প্যাঁটপ্যাঁট করে তাইকে আছে। দেখে তো বেচারার পাত্লুন-

ফাত্‌লুন নোংরা হয়ে যাবার যোগাড়। সজোরে দরজা বন্ধ করে দে' ঘরের মধ্যি গা-ঢাকা দিল সে, তাম্পর চুল্লির চিমনির মধ্যি দে' চিচ্‌কার পাড়তে নাগল, "মলাম! মলাম! বাঁচাও! বাঁচাও! আমার দরজায় শয়তান এসে হাজির হয়েচে!" '

শুনে শহরের বুড়ো প্রচণ্ড জোরে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে চোখে জল এসে গেল ওর...

'দারুণ ভয় পেয়ে গিইছিল লোকটা, তাই-না? হা-হা-হা!..'

'তা আর বলতে! এর পর থেকে গাঁয়ের নোকে তার নাম দেছিল "দুয়োরে শয়তান-বাঁধা ইয়েগোর!" '

'আবার একবার — তখন আমরা আরেট্টু বড় হইচি — সেটাও ঘটেছেল এমনি ঘাসকাটার মরশুমে... আমাদের গাঁয়ে মিকোলাই রগোদিন নামে একজনা ছেল। ভারি ধুত্ত নোক সে, আর এক-আধটুকুন হাত-সাফাইতেও পাকা ছেল বেশ। তা, একদিন সাঁঝবেলায় সে বলে কী, "গ্রিন্‌কা, এক কাজ কর্‌, এট্টা ঘোড়ারে জিন পরা দেখি — ইচ্ছা হলে আমারটাও লিতে পারিস। তাম্পর ঘোড়া দাবড়িয়ে গাঁয়ে যা আর কারও এট্টা খোঁয়াড় থেকে গোটা কয় মুরগি ধরে আন্‌ দিনি। মুরগি খেতে বড্ড সাধ যাচ্চে আমার।" ব্যাস, যে কথা সেই কাজ! কোনো কিছু না-ভেবে চক্ষের পলকে এট্টা ঘোড়ারে জিন পরিয়ে গ্রিন্‌কা দৌড়ুল গাঁয়ের পানে। অল্পেক্ষণের মধ্যিই সে ফিরে এল পাঁচ-পাঁচটে মুরগি লিয়ে। তাদের গলার নলিগুলা মুচড়িয়ে ভেঙে এনেছেল সে। ওঃ, মুরগি পেয়ে আমরা তো খুব খুশি! শিগ্‌গিরই সেগুলারে কেটেকুটে পাত্তরে চাপিয়ে দেয়া হল। তাম্পর যা-একখান ভোজ হল-না, কী বলি! খেতে-খেতে মিকোলাই তো সাতখানা করে ভাইয়ের আমার সুখ্যাতি করতে নাগল। বলতে নাগল, "সোনার চাঁদ ছেলে, আমাদের গ্রিন্‌কা!" আর গ্রিন্‌কা খালি বলল, "খেয়ে লাও, মিকোলাই-খুড়ো, পেট পুরে খেয়ে লাও। লিজের খোঁয়াড়ের মুরগি মনে করে যত ইচ্ছা খেয়ে লাও!" '

প্রাণ খুলে হাসতে লাগল দুই বুড়ো। শহরের বুড়ো ফের একটা সিগারেট ধরাল।

'মিকোলাই যখন ধরতে পারল যে মুরগিগুলা সবই তার ছেল, তখন সে কী নম্ফঝম্ফ গালিগালাজ তার! কিন্তু তার কীই-বা করার ছেল? সে-ই তো মুরগি আনতে পাঠিয়েছেল গ্রিন্‌কারে।'

‘তা বটে…’ শহরের বুড়ো চোখদুটো মুছল, তারপর কেমন আনমনা হয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু’জনেই, প্রত্যেকে নিজের-নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে। ওদিকে আস্তানার বাইরে — বাইরের জগৎ গরমে, পোকামাকড়ের ভন্‌ভনানিতে, পাখির গানে মুখর হয়ে রইল আর কী এক রহস্যময় কারণে ঝলমলে রোদ্দুরে অপব্যয়ীর মতো আরও বেশি করে নিজের সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে চলল।

‘এবার তাইলে উঠতে হয় আমাবে…,’ আনিসিম বলল। ‘মনে লিচ্চে এট্টু যেন ঠান্ডা হয়েচে এখন।’

‘এখনও বেশ গরম আছে কিন্তু…’

‘তা হোক।’

‘আপনারে কি গোরু পুষতে হয়?’

‘লিচ্চয়।’

কাস্তেখানা তুলে নিয়ে শান-পাথরটা ফলার ওপর ঘষতে লাগল আনিসিম। ওর চোখ গিয়ে পড়ল কাটাঘাসের টুকরো জমিগুলোর ওপর। ভাবল, সকাল থেকে কাজ নেহাত মন্দ করে নি ও। শহরের বুড়ো লোকটি এই সময়ে ওর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে, বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে ছিল।

‘আচ্ছা, চলি তাইলে,’ ফের বলল আনিসিম।

‘ঠিক আছে,’ শহুরে লোকটিও সায় দিল। বলল, ‘বিদায়, তাইলে।’ আনিসিমের চোখের দিকে সরাসরি এক-লহমা তাকাল সে, কোনো কথা না-বলে শক্ত করে হাত ধরে করমর্দন করল, তারপর পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ওপরে রাস্তার দিকে উঠে গেল। রাস্তায় পৌঁছুবার পর দাঁড়িয়ে এক-মুহূর্ত পেছন ফিরে তাকাল সে, তারপর হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তার মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসা পর্যন্ত সেদিন সারাদিন ঘাস কাটল বুড়ো আনিসিম।

অবশেষে ঘরে ফিরল সে।

বাড়ি ফিরে আনিসিম দেখে ওর স্ত্রী ওর জন্যে এতক্ষণ ছটফট করছিল, অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

ফটক দিয়ে ঢুকতেই স্ত্রী হড়বড় করে বলতে শুরু করল, 'আমাদের বাড়ি একজনা অতিথ্ এয়েছেল গো!.. মস্ত নম্বা একখান হাওয়াগাড়ি হাঁকিয়ে এয়েছেল। তোমার কথা শুধোল। বলল, "কত্তা কোথায় আপনার?" '

বাড়ির দরজার সিঁড়িতে থমকে বসে পড়ল আনিসিম। হাতের পুঁটুলিটা নামিয়ে রাখল মাটিতে।

শুধোল, 'টুপি মাথায় দে এয়েছেল কি নোকটা? বুড়োমতন এট্টা নোক?..'

'হ্যাঁ, টুপি মাথায় দে এয়েছেল। আর কী সোন্দর তার পোশাক... একবারে ইশ্কুল-ম্যাস্টারের মতন।'

মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল বুড়ো। কয়েক ঘণ্টা আগে যে-আশ্চর্য মিল দেখে সে অবাক হয়েছিল তার কারণটা এখন যেন ধরতে পারছে সে। মিলটা-যে কী জন্যে বোধহয় তা বুঝতে পারছে। কিন্তু সত্যিই কি তা হতে পারে? তা কী হওয়া সম্ভব?!

'গ্রিন্কা এয়েছেল কি? তুমি কিছু ঠাহর করে দ্যাখ নাই?'

'হা ভগমান, বলে কী!.. মাথা-টাথা বিগড়ে গেল নাকি তোমার? গ্রিন্কা আসবে, বলচ কী? মরা মানুষে জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসবে?'

নাঃ, অস্পষ্ট কোনো ধারণা বা আন্দাজ নিয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে আলাপ করা বৃথা। কখনও কিছুই বুঝতে চাইবে না সে। অল্পবয়সে তার মোটামাথায় যা খুশি আজগবি আষাঢ়ে গপ্পো তুমি ঢুকিয়ে দিতে পার, সবকিছু নির্বিবাদে মেনে নেবে সে। কিন্তু যখন সে বুড়ো হবে তখন তোমার হঠাৎ-মনে-হওয়া কোনো ভাবনার ভাগ তাকে দেবার চেষ্টা করে দেখো — দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বোকা সাব্যস্ত না-করে কিছুতেই ছাড়বে না সে।

'নোকটা চলে গ্যাচে?'

'বলে, কখন চলে গ্যাচে সেই দুক্কুরের খাবার পর...'

'লোকটা কি গ্রিন্কা হতে পারে? না-না, নিশ্চয়ই সে নয়!'

সে-রাত্রে বুড়ো দু'চোখের পাতা বড়-একটা এক করতে পারল না। অবশেষে সকালবেলায় সে এই সিদ্ধান্তে পেঁছিুল যে ও কিছু না, হয়তো সামান্য একটু মিল আছে এইমাত্র।

কত লোকই তো অমন একরকম দেখতে হয়! তাছাড়া লোকটা যে কে তা সে কবুলই-বা করল না কেন? নাকি, গাঁয়ে সে একটা সোরগোল তুলতে

চায় নি, সেইজন্যেই কী? অল্পবয়সে গ্রিন্‌কা কিন্তু এইরকমই অদ্ভুত ধরনের, মজার ছেলে ছিল...

'আচ্ছা, ও কি সত্যিই গ্রিন্‌কা হতে পারে? কে জানে!'

এর এক সপ্তাহ পরে বুড়োবুড়ি একখানা টেলিগ্রাম পেল। তাতে লেখা:

'আর্নিসিম কভাসভ সমীপে —

'আপনার ভাই গ্রিগোরি ১২ই তারিখে গত হয়েছেন। মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের বলে গিয়েছিলেন আপনাদের খবরটা জানাতে। কভাসভ পরিবারের তরফে।'

ওঃ, তাহলে লোকটি সত্যিই ছিল ওর ভাই। গ্রিন্‌কা।



বাঁচতে চাওয়া

জমিটা অল্প একটু উ'চু হয়ে উঠেছে যেখানে সেখানে গাছপালার ফাঁকে দেখা যায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা আর সেই জায়গাটায় গাছের গঃড়ি-দিয়ে-তৈরি ছোট্ট একটা কংড়ে। এমন কিছু আহামরি কুড়ে নয়, তেরো-চোদ্দটা গাছের গংড়ি আড়াআড়িভাবে ওপরে-ওপরে গে'থে বানানো দেয়াল-তোলা নিছক মাথাগোঁজার ঘরখানায় থাকে একটামাত্র জানলা আর একটাই দরজা। নিছক আস্তানা একটা। তার না-আছে সামনে কোনো ছাউনি-দেয়া দাওয়া, এমন কি কখনও-কখনও চালা পর্যন্ত থাকে না তার। যেমন-তেমন করে তৈরি এমন ধরনের আস্তানা অনাদি কাল থেকে তাইগা-র গভীরে বানানো হয়ে আসছে। বসন্তকালে একদিন হয়তো দেখা যাবে কোথা থেকে যেন জনাকয়েক লোক এসে হাজির হয়েছে এমনি একটা পোড়ো ফাঁকা জমিতে, আর তারপর তারা সরল দেখে গোটা কয়েক পাইনগাছ কেটে সেগুলোর ছাল-বাকলা ছাড়িয়ে ফেলছে। পরে শরতের প্রথম মনোরম দিন-গুলোয় গোটা তিন-চার কুড়ুলের সাহায্যে ওই শুকিয়ে-রাখা পাইন-গংড়িগুলোকে চিরেফে'ড়ে ঠিকঠাক করে আর সেগুলোতে পেরেক ঠুকে ঘর বানিয়ে ফেলতে লোকগুলোর সপ্তাহখানেকের চেয়ে বেশি সময় লাগছে না। তারপর কাছাকাছিই কোথাও হাতের কাছে জুটে যায় তাদের কাদামাটি আর পাথর, আর তাই দিয়ে তারা বানিয়ে নেয় চিমনিওলা ছোট্ট একটা চুল্লি আর শোওয়ার জন্যে যেমন-তেমন একটা উ'চু মাচা। ব্যস, এইভাবে তৈরি হয়ে যায় একখানা কংড়ে আর যতদিন খুশি মাথা গংজে থাকা যায় সেই আস্তানায়।

শীতকালে যদি কেউ এমন একটা কংড়েয় থাকতে চায় তাহলে এমনিতে কিন্তু তেমন আরাম বোধ হবে না। সে দেখবে দেয়ালের গায়ে আর প্রতিটি

ফোকরে-ফাটলে একহাত পুরু হয়ে বরফ জমে আছে আর ঘরখানা ভরে আছে আগের বছরের ধোঁয়ার কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধে।

কিন্তু তারপর যেই সে ঘরের চুল্লিতে খানকয় চ্যালাকাঠ জ্বালিয়ে নেবে অমনি ঘরখানা ভরে উঠতে থাকবে গলা মাটির বোটকা গন্ধে, দেয়ালগুলো থেকে টিপটিপ করে ঝরতে থাকবে জলের ফোঁটা। দেখতে-দেখতে ঘর এমন ধোঁয়ায় ভরে উঠবে যে আগুনটা ভালোরকম উস্কে তুলে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে চলে যাওয়া ভালো হবে। সেখানে গিয়ে বরং ঘরের বাসিন্দা এক-চালান জ্বালানি কাঠ কেটে ফেলতে পারবে সেই সুযোগে। আধঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য দেখা যাবে যে ছোট্ট কুঁড়েখানা দিব্যি গরম হয়ে উঠেছে আর ভেতরটাও অতটা দম-আটকানো নয়। এবার লোকটি সচ্ছন্দে গায়ের কোট খুলে ফেলতে পারে, তারপর চুল্লিতে গুঁজে দিতে পারে আরও খানকয়েক কাঠ। দেয়ালগুলো অবশ্য তখনও এক-আধটুকু ঘামতে থাকবে, তবে চুল্লিতে জ্বলবে তখন গন্‌গনে আগুন। এমন একটা সময়েই মানুষের মন ভরে ওঠে ভারি একটা শান্তির আমেজে। দরাজ গলায় তার বলতে ইচ্ছে যায়, 'আ — ঃ, এই না-হলে জীবন!' যাই হোক, শিগ্‌গিরই গোটা ঘরখানা প্রায় শুকিয়ে উঠবে, তবে শোবার মাচার তক্তাগুলো তখনও ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে একটু-আধটু। অবশ্য তাতে কিছু যাবে-আসবে না — তার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করে থাকারও দরকার পড়বে না ঘরের মালিকের। সে অনায়াসেই ভেড়ার চামড়ার ঝুল-কোটখানা মাচার ওপর পেতে আর রুকস্যাকখানা মাথার নিচে রেখে মাচায় লম্বা হয়ে পা-দুখানা ছড়িয়ে দিতে পারবে চুল্লির আগুনের দিকে। আর দেখতে-দেখতে ঝিমুনি এসে যাবে তার। তখন ফের উঠে চুল্লিতে আরও কয়েকখানা চ্যালাকাঠ গুঁজে দেয়ার ঝক্কি পোয়ানোও বড় কষ্টকর ঠেকবে। তবে এই কষ্টটুকু করলে ভালোই করবে লোকটি।

ইতিমধ্যে চুল্লির খাঁচায় মস্ত একবোঝা জ্বলন্ত কাঠ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে। বার্চের বাকলের মতো এইসব চ্যালাকাঠও চট করে ধরে ওঠে। চুল্লির ঠিক সামনেই একটা মোটা কাটা গুঁড়ি রাখা আছে। লোকটি এখানে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিতে পারে — তারপর ভাবতে পারে বসে-বসে। একা থাকলে আকাশ-পাতাল কত কিছু ভাবা যায় নিজের মনে। চুল্লির আগুনের আলো চমকে-চমকে খেলা করে বেড়ায় মেঝেয়, দেয়ালের গায়ে, ছাদে। এছাড়া বাকি ঘরটুকু থাকে অন্ধকারে ডুবে। আর তখন কত কী-যে মনে পড়তে থাকে লোকটির — তা শুধু ঈশ্বরই জানেন! হঠাৎ হয়তো তার মনে পড়ে যায়

কোনো মেয়েকে আলাপের প্রথম দিন সঙ্গে করে বাড়ি পেঁাছে দেয়ার কথা। মনে পড়ে, মেয়েটির পাশে-পাশে মুখ বুজিয়ে চুপটি করে কীভাবেই-না সেদিন হেঁটেছিল ও, একেবারে রাম বুদ্ধুর মতো... আর তারপর নিজের অজ্ঞাতসারেই ওখানে বসে একেবারে কান-এঁটো-করা নিঃশব্দ হাসি হাসতে থাকে লোকটি। সত্যি, কী চমৎকারই-না জীবন!

ইতিমধ্যে ঘর বেশ গরম হয়ে উঠেছে। একটু চা করে খাওয়ার সময় হয়েছে বোধহয় — ঘন সবুজ চা। কেমন একটা ঘাস-ঘাস গন্ধ সে-চায়ের। আর সে-গন্ধে মনে পড়ে যায় গ্রীষ্মকালের কথা।

...এক সন্ধেবেলা এমনিই এক চুল্লির সামনে বসে আধো আলো-অন্ধকারে পাইপ টানছিল বুড়ো নিকিতিচ।

কুঁড়ের ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছিল। আর বাইরেটা ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তুষারে ছাওয়া। সেদিন নিকিতিচের মেজাজটা ছিল ভারি খুশ হয়ে। বলতে গেলে প্রায় ছেলেবেলা থেকেই তাইগায় চরাবরা করে বেড়িয়েছে ও, পেট চালিয়েছে শিকার করে। সাধারণত কাঠবিড়ালী মারাই ছিল ওর কাজ, তবে কখনও-কখনও পথ ভুল করে এদিক-ওদিক চলে-আসা এক-আধটা শীতের ভাল্লুকও শিকার করেছে। পাছে এরকম ভাল্লুকের মুখোমুখি পড়ে যায় এই ভয়ে সর্বদাই সঙ্গে কোটের বাঁ-দিকের পকেটে ও পাঁচটা কি ছ'টা 'বাক্‌শট' কার্তুজ রেখে দেয়। তাইগা ওর ভারি প্রিয়। বিশেষ করে শীতকালের তাইগা। তবে চারিদিক তখন এত ভরপুর নিস্তব্ধ থাকে যে মাঝে-মাঝে ওর এক-আধটুকু মন-খারাপও হয়ে যায়। তবে নির্জনতা কিন্তু ওকে মনমরা করে না, বরং কেমন একটা মুক্ত, স্বাধীন ভাব জাগে মনে। নিকিতিচ তখন চোখদুটো কুঁচকে ইতিউতি চাইতে থাকে আর মনে-মনে ভাবে এই বিশাল শুভ্র তুষার-রাজ্যের ও-ই একমাত্র রাজা।

...যাই হোক, সেদিন সন্ধেয় নিকিতিচ পাইপ টানছিল বসে-বসে।

বাইরে বরফের ওপর হঠাৎ একবার স্কি চলার খশ্‌খশ আওয়াজ উঠল, তারপর ফের সব চুপচাপ। ওর কেমন যেন মনে হল যে কেউ একজন জানলাটা দিয়ে বুঝি ভেতরে উঁকি দিল। এরপর ফের সজোরে স্কি'র খড়খড় আওয়াজ উঠল। মনে হল, আওয়াজটা ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। এবার দরজায় ঘা পড়ল পরপর দু'বার — শব্দ শুনে মনে হল কেউ স্কি চালানোর লাঠি দিয়ে যেন ঘা দিচ্ছে।

'কেউ আছেন?'

গলার স্বরটা অল্পবয়সী মানুষের। তবে বরফের মধ্যে অনেকক্ষণ কাটানোর ফলে ও বেশ কিছুক্ষণ মুখ বুজিয়ে থাকার জন্যে আওয়াজটা কেমন ধরা-ধরা। বোঝা গেল, নিজের মনে কথা বলতে জানে এমন কোনো লোক নয় ও।

নিকিতিচ মনে-মনে ভাবল, 'এ নিশ্চয়ই শিকারী নয়। শিকারী হলে ও বাইরে থেকে অমন করে প্রশ্ন করত না, সোজা ঢুকে পড়ত কুঁড়েয়।'

'হ্যাঁ, আচে বৈকি।'

দরজার ওধারের লোকটা এবার তার স্কি-জোড়া খুলে ফেলল, তারপর দেয়ালের গায়ে হেলান দিইয়ে রাখল সে-দুটো। এরপর কাঠের সিঁড়ি মচমচ করে উঠল, আর দরজা খুলতেই বাইরের ধোঁয়া-ধোঁয়া শাদাটে বাতাস ভেদ করে নিকিতিচের শুধু নজরে পড়ল লেপের মতো তুলোভরা প্যান্ট আর জ্যাকেট পরনে, কোমরে বেল্ট-বাঁধা আর ছাগুলে কান-ঝোলানো পুরনো ফৌজী টুপি-মাথায় বেশ লম্বা একটি অল্পবয়সী ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে।

'কে আপনি?'

'কে আবার? মানুষ,' বলে নিকিতিচ কাঠের একটা চটায় আগুন ধরিয়ে নিজের মাথার ওপর তুলে ধরল সেটা।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। নিরীক্ষণ করতে লাগল একে অপরকে।

'কী, একা আছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, একাই।'

ছোকরা এবার চুল্লির কাছে এগিয়ে এল, তারপর হাত থেকে আঙুলের-খোপছাড়া দস্তানা দুটো খুলে দুই বগলে গুঁজে নিল। পরে হাত দুখানা ছড়িয়ে দিল আগুনের ওপর।

'সাংঘাতিক ঠাণ্ডা বাইরে।'

'হ্যাঁ, তা ঠাণ্ডা বটে।' এতক্ষণে নিকিতিচের খেয়াল হল যে ছোকরার সঙ্গে বন্দুক নেই। তাহলে শিকারী ও কখ্খনো নয়। একদমই শিকারী-শিকারী দেখতে লাগছে না ওকে। না মুখচোখের চেহারায়, না পোশাকে-আশাকে। বলল, 'মার্চমাস খতম হওয়ার আগে আরও ঠাণ্ডা পড়বে।'

'কোথায় মার্চমাস? এখন তো এপ্রিল!'

'না, পুরানো পঞ্জিকা অনুসারে না। এখনও মার্চমাসই চলচে। "এলে মার্চমাস, পরো সবচে' গরম বাস" — এই হল গে আমাদের এ-তল্লাটের

বুলি। তা, তুমি কিন্তু বাপু হাল্‌কা পোশাক পরেচ।' অবশ্য ওর সঙ্গে বন্দুক না-থাকার কথাটা নির্কিতিচ বলল না।

'তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই,' ছোকরা জবাব দিল। 'আপনি কি একেবারে একাই এখানে আছেন?'

'লিচ্চয়। কথাটা তুমি কিন্তু আগেই একবার শুধিয়েচ।'

এর জবাবে আর ছেলেটির বলার কিছু রইল না।

'বোসো। চা করচি।'

'দাঁড়ান, প্রথমে আমি নিজেকে একটু সেঁকে নি...।' না, ও মোটেই এ-তল্লাটের নোক না, এখেনকার নোকজনের মতন কথাবাত্তার ধাঁচ নয় ওর। ওর সম্বন্ধে আরও বেশি জানার জন্যে নির্কিতিচ ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছিল, কিন্তু তবু কৌতূহলের চেয়ে এসব প্রশ্ন হড়বড় করে না-শুধনোর মজ্জাগত অভ্যেসটাই ওর বড় হয়ে দাঁড়াল।

হাতদুটো গরম হলে পর ছোকরা একটা সিগারেট ধরাল।

'আপনার এ-আস্তানাটা ভারি চমৎকার, বেশ গরম।'

ও যতক্ষণে সিগারেট ধরাচ্ছিল বুড়ো সেই ফাঁকে ওকে ভালো করে এক-নজর ঠাহর করে দেখার সুযোগ পেল। সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল ওর ফ্যাকাশে সুশ্রী মুখ আর ঘন চোখের পাতা। ব্যগ্রভাবে সিগারেটে টান দিয়ে ছোকরা যখন ঠোঁটদুটো একেকবার ফাঁক করছিল তখন ওর সামনের দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠতেও দেখা গেল। নিশ্চয়ই ছোকরা বেশ কয়েক দিন দাড়ি কামানোর সময় পায় নি। তবে দাড়িটা ওর বেশ পরিচ্ছন্নই ঠেকল, ওপর-চোয়ালের কাছটায় অল্প-একটু কুঁকড়ে আছে দু'দিকের দাড়ি... মুখখানা দেখতে ভারি রোগা লাগছিল ছেলেটার... ছেলেটা হঠাৎ লক্ষ্য করল যে বুড়ো ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আধপোড়া জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠিটা একটু ওপরে তুলে ধরে ও-ও মনোযোগ দিয়ে বুড়োকে দেখল একবার, তারপর কাঠিটা ছুড়ে ফেলে দিল। ওর এই চাউনিটা কেমন মনে ধরে গেল নির্কিতিচের। সরাসরি, অপ্রতিহত সে চাউনি — বুড়োর মতে চাউনিটা 'ঠান্ডা হিম'। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বুড়োর মনে হল, এমন ছোকরারাই মেয়েদের মজায়।

'তুমি বস-না কেনে বাপু?'

শুনে ছোকরা হাসল। বলল:

'ওভাবে বলতে নেই, খুড়ো। বলতে হয়, তুমি কি বসবে?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আচে, তা তুমি কি বসবে? তফাত-যে কোথা কে জানে বাপ্‌!'

'ঠিক আছে, বসছি। তা, আপনার কাছে আর কেউ আসবে না তো, না কী বলেন?'

'না, এত রেতে কেউ আসবে না। তবে যদি কেউ আসেই তো মাথা গোঁজার মতন যথেষ্ট জায়গা আচে।' একটু সরে বসল নিকিতিচ। ছেলেটা ওর পাশে কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে ফের হাতদুটো আগুনের ওপর মেলে ধরল। ওর হাত দু'খানা খেটে-খাওয়া মানুষের হাত নয়, তবে তা সত্ত্বেও ছোকরাকে বেশ শক্তসমর্থ ঠেকল। নিকিতিচের ভারি ভালো লাগল ছেলেটার হাসি — সে-হাসিতে 'উ'চকপালে ভাব' এতটুকু নেই। হাসিটা নেহাতই সংযত, বন্ধুর হাসি। আর ওর সোনার দাঁতগুলোরই-বা কত বাহার — সত্যি, ভারি সুশ্রী ছোকরা বটে। দাড়িটা কামিয়ে ওকে একপ্রস্থ স্যুট পরতে দিলে সত্যিকার ইশ্‌কুল-মাস্টারের মতো দেখতে লাগবে। ইশ্‌কুল-মাস্টারদের ওপর বড্ড দুর্বলতা নিকিতিচের।

শুধোল, 'কী করা হয় — ভূতত্ত্ববিদের কাজ?'

'কিসের কাজ বললেন?'

'না, এই বলছেলাম কী — যারা খনির খোঁজ করে-করে ঘুরে বেড়ায় তাদের কাজ?'

'ও!.. হ্যাঁ, তা-ই বলতে পারেন।'

'কিন্তু বন্দুক ছাড়া কাজ-কারবার চালাচ্চ কেমন করে? কত বিপদ-আপদ ঘটতে পারে তার ঠিক আচে!'

'দলছাড়া হয়ে পেছনে পড়ে গেছি আমি,' ছেলেটা জবাব দিল, তবে কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'আপনার গাঁ কি অনেক দূর?'

'তা পেরায় শ'দেড়েক ভের্স্তা হবে।'

ছেলেটা মাথা নাড়ল, তারপর চোখদুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে আগুনের উত্তাপ উপভোগ করতে লাগল। শেষে গা ঝাড়া দিয়ে বসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'একদম জেরবার হয়ে গেছি।'

'অনেক দিন একা-একা ঘোরচ বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা অনেক দিন হবে। আচ্ছা, আপনার কাছে মদটদ কিছু হবে না বোধহয়?'

‘কী জানি, থাকলেও থাকতে পারে কোনো ঠেঁয়ে।’

শুনে ছোকরা এবার চন্‌মনিয়ে উঠল। বলল:

‘ওঃ, তাহলে তো খুব ভালো হয়! ঠান্ডায় হাত-পা একবারে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। জমে কাঠ হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ঠান্ডা। আর লোকে বলছে এটা নাকি এপ্রিল মাস...’

কুঁড়ের বাইরে গিয়ে নির্কিতিচ এবার নিজের রুক্‌স্যাকটা ভেতরে নিয়ে এল। রুক্‌স্যাকে বড় একদলা শুয়োরের চর্বি ছিল। তারপর ছাদ থেকে ঝোলানো লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দিল সে।

‘তাইগায় একা-একা কী করে বেঁচেবর্তে থাকতে হয় কেউ যদি আগে থাকতে তোমাদেরে তা শিক্ষে দিত তো ভালো হোত। এমন অবস্তায় এখেনে পাঠাবার কী মানে হয় তোমাদেরে... এখেনকার রকমসকম কী জানোটা তোমরা! এই তো গতবছর একজনার দেখা পেয়েছেলাম আমি নিজে — তখন বসন্তের বরফগলা শেষ হয়েচে। কচি বয়স, এক ছোকরা। একগাছা দাড়িও ছেল তার গালে। একখান কম্বল মুড়ি দে’ পড়ে ছেল বাইরি। ব্যাস, ওইখেনেই সে খতম।’ চর্বির দলাটা খাটের মাচার ধারে রেখে তা থেকে পাতলা-পাতলা টুকরো কাটতে লাগল নির্কিতিচ। ‘কিন্তু ধর, আমারে যদি তুমি তাইগায় ছেড়ে দ্যাও তাইলে আমি গোটা শীতকালটা একা কাটাতে পারব, মুখে রা-টি কাড়ব না। কেবল যথেষ্ট গুলিবারুদ সাথে থাকলেই হল, আর কিছু দিয়াশলাই।’

‘তা হলেও আস্তানাটাতেই থাকেন তো। আপনার ভাবনা কী!’

‘তা তো বটেই। এমন এট্টা জায়গা থাকতে বরফে কম্বল মুড়ি দে’ শুতে যাব কোন দুঃখে? আমি কি নিজের শত্তুর নাকি?’

ছেলেটা এবার কোমরের বেল্‌ট খুলে ফেলল, তারপর গায়ের সোয়েটারটাও খুলল... কুঁড়ের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল এবার সে। দেখা গেল, কাঁধদুটো বেশ চওড়া তার আর দিব্যি সুগঠিত। শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে, চোখদুটোও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে। এমন একটা উষ্ণ আস্তানা আর জীবন্ত মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই ও মনে-মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। ইতিমধ্যে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছে ছেলেটা। সিগারেটের গন্ধটা ওর বেড়ে। শহুরে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে মন্দ লাগে না নির্কিতিচের, তবে তাইগায় পড়ে অসহায় ভাবগতিকের জন্যে দু’চক্ষে দেখতে পারে না তাদের। মাঝেসাঝে খনিজসন্ধানী এক-আধটা দলের গাইড হিসেবে কাজ করে দুটো বাড়তি পয়সা কামাতে কসুর

করে না সে। শহুরে বাবুদের দেখলে মনে-মনে হাসে সে, তবু ওদের কথাবার্তা শুনতে ভারি মজা লাগে। ওদের কথায় যোগ দিতে পারলে সে খুশিই হয়। যেরকম বন্ধুভাবে ওরা তার সঙ্গে কথা বলে আর যেরকম সদয়ভাবে হাসে তাতে বুড়োর মনটা বড় মায়ায় ভরে ওঠে। কিন্তু যদি সে হাল ছেড়ে দিয়ে বাবুদের নিজেদের খুশিমতো চলতে দেয় তাহলে ওদের যা অবস্থা হবে-না তা বলার নয়, ওদের অবস্থা হবে তাহলে চোখ-না-ফোটা একগণ্ডা কুকুরছানার মতো। এইসব দলে গোটা কয়েক মেয়ে থাকলে দলটা বুড়োর কাছে আরও অনেক মজাদার হয়ে ওঠে। মেয়েগুলো সবরকম কষ্টদুঃখ সহ্য করতে রাজি, তবু এতটুকু ঘ্যানঘ্যান করে না। তারা চায় সবসময়ে তাদের সঙ্গে ছেলেদের মতোই আচরণ করা হোক, সাহায্যটাহায্য চায় না তারা। সত্যি! আরও আশ্চর্য, তারা ছেলেদের সঙ্গে এক জায়গায় দলা পাকিয়ে ঘুমোয়। মনে হয়, এতে তাদের কিছু এসে-যায় না — কোনোরকম ছলাকলার ধার ধারে না তারা। কিন্তু এই যদি গাঁয়ের ছোঁড়াছুঁড়িরা হোত, তাহলে কত-যে ঝামেলা বাধত তা আর কহতব্য নয়। শহুরে ছোঁড়াছুঁড়িদের বেলায় কিন্তু এ-সবের বালাই নেই। অথচ ইচ্ছে করলেই তারা ছবির মতো ফুট্‌ফুটে বনে যেতে পারে। পা-চাপা প্যান্ট ও আঁটো পশমি জামা গায়ে দিয়ে আর ডাঁশমশার উৎপাত ঠেকাতে মাথামুড় রুমালে ঢেকে যখন তারা ঘুরে বেড়ায় তখন সত্যিসত্যিই রূপসী বলা চলে তাদের। অথচ তাদের সঙ্গী ছেলেরা কিন্তু সেদিকে বড়-একটা নজর দেয় না। তাদের ভাবখানা এমন যেন এটা একটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

'তা, তুমি খুঁজে বেড়াচ্চ কারে?'

'কোথায়?'

'না, এই বলচি কী, এখেনে এয়েচ তুমি কিসের লেগে?'

শুনে ছোকরা আপনমনে খুক করে একটু হাসল।

'এসেছি ভাগ্যের সন্ধানে।'

'হুঁঃ, ভাগ্য... বাছা, মানুষের ভাগ্য হল গে পাঁকালমাছের মতন পেছল। তুমি হয়তো মনে করচ, ভাগ্যরে বুঝি দু'হাতে সাপ্‌টে ধরলে, কিন্তু তাম্পর দেখলে সে তোমার হাত এইড়ে কখন পাইলে গেছে।' কথাবলার মেজাজ এসে গিয়েছিল নিকিতিচের। সাধারণত শহুরে লোকেদের সঙ্গে যেভাবে সে কথা বলত সেই একবারে নিজস্ব বিশিষ্ট ধরনে কথা শুরু করেছিল সে। শহুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় সে দেখেছে ওরা তার কথা না-শুনে পারে না আর খালি-খালি নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে। আবার কেউ হয়তো তার

কিছুকিছু নোটবইয়ে টুকেও নেয়। এ-ধরনের কথা সারা রাত্তির চালিয়ে যেতে পারে নিকিতিচ — লম্বকর্ণগুলো যতক্ষণ শুনতে চায় ততক্ষণ। তার নিজের গাঁয়ের লোক বাচাল বুড়ো বিবেচনা করে তার কথা হয়তো বেশিক্ষণ শুনতে চাইবে না, কিন্তু বাইরের লোক তার কথা শুনতে চায়। আর ভারি ভালো লাগে তখন। কখনও-কখনও নিজের মনেই ও ভাবে, ধুঃ শালা, আমি তো দেখি মহা বক্তার! পুরনো দিনের পাদ্রিরা যেমন পারত ও-ও তেমনি অনর্গল বকে যেতে পারে। যেমন, ধরা যাক, বনের কী ব্যাখ্যানই-না দিতে পারে ও। বলে, 'বনটার কিন্তু আত্মা বলে এট্টা পদাত্থ আচে। এয়ার কোনো ক্ষেতি কইরেন না, মিছামিছি কুড়োল দিয়ে কোপায়েন না এয়ারে, তাইলে কিন্তু অরণ্য যাবে শুকিয়ে। আর অরণ্য যদি শুকায় তো আপনেও যাবেন শুকিয়ে। সত্যি! দেখতে-দেখতে আপনার পরানটা ভরে ওঠবে দুঃখুকষ্টে, আর ভিত্‌রে-ভিত্‌রে আপনেও যাবেন শুকিয়ে। কেনে-যে শুকিয়ে যাচ্চেন তা টেরটিও পাবেন না।' ভাবতে-ভাবতে ফের বর্তমানে ফিরে আসে নিকিতিচ। বলতে থাকে, 'বুইলে, এমন কিছু নোক আছে যারা শহর থেকে বন্দুক সাথে লিয়ে আসে আর এলোপাতাড়ি এদিক-সেদিক গুলি চালাতে থাকে। কারে-যে মারচে — মদ্দা না মাদী, তার হুঁশটুক থাকে না পর্যন্ত। এট্টা কিছু মারতে পারলেই হল। এমন বে-সরম কাজ করার জন্যে ওয়াদের হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলা উচিত। আমি জানি এয়ার আগে একবার ওয়াদের একজনা এট্টা মাদী-ভালুকরে মারে। ভালুকটার দুটা ছ্যানা ছেল। তা, দুটা ছ্যানাই যে মরবে এ তো জানা কথা। এখন, এতে ফায়দাটা কী হল নোকটার? তুই তো এট্টা মাত্তর চামড়া পেলি। কিন্তু যদি তুই আরও এটু সবুর করতি তো তিন-তিনখান চামড়া পেতে পারতি। সত্যি, মজা করার লেগে জানোয়ার মেরে ফায়দাটা কী? কোনো ফায়দা নাই। এই তো হল গে তোমার ভাগ্যের সন্ধান।'

ছোকরার কিন্তু এতসব শোনার ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। জানলার কাছে গিয়ে সে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন চমক ভেঙেছে এমনভাবে বলল, 'শিগ্‌গিরই বসন্ত আসছে দেখছি।'

'হ্যাঁ, বসন্ত আসবেই তো। এয়ার কি আর অন্যথা হতে পারে? তা, বাছা, বোসো-না কেনে। ভগমান যা জুটিয়ে দেছেন তাই ভাগ করে খাওয়া যাক। এস।'

খানিকটা বরফ গলিয়ে নিয়ে খাঁটি মদটুকু একটু পাতলা করে নিল ওরা। তারপর চর্বির জমানো টুকরোগুলোর সঙ্গে মদ গিলতে লাগল। নিকিতিচ ক্রমশ ভারি ভালো বোধ করতে লাগল। আরও খানকয়েক চ্যালাকাঠ চুল্লির

মধ্যে গ‍ুঁজে দিল ও। কিন্তু দেখল ছেলেটা আবার জানলার কাছে এগিয়ে গেছে। বরফজমা জানলার কাচে ফ‍ুঁ দিয়ে-দিয়ে ছোট্ট একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে তা-ই দিয়ে বারবার বাইরেটা দেখছে।

'এমন রেতে বাইরে কারে দেখবে বলে ঠাওরেচ? অ্যাঁ?' অবাক হয়ে শুধোল নিকিতিচ। কথাবলায় পেয়ে বসেছিল ওকে।

'স্বাধীনতাকে,' হঠাৎ বলে উঠল ছেলেটা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তবে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস নয় তা। 'স্বাধীনতাকে' কথাটা বলার সময় ওর গলার আওয়াজটা কেমন কঠোর আর তীব্র শোনাল। হঠাৎ ও জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল।

'আরেক পাত্তর মদ দাও, খুড়ো।' কালো সুতীর শার্টের গলার বোতাম-কটা খুলে চওড়া ভারি হাতের তেলো দিয়ে বুকে একটা চাপড় মারল ছেলেটা, তারপর বুকটা ডলতে লাগল। বলল, 'আরেক পাত্তর চাই আমার।'

'আগে কিছু তোমার খেয়ে লেয়া দরকার, বুইলে। নইলে খালি পেটে তোমারে কাবু করে ফেলবে-নে।'

'না, কিছু হবে না। অত সহজে আমায় কাবু করতে পারবে না।' এই বলে দুই হাত দিয়ে শক্ত করে আদরভরে বুড়োর গলাটা জড়িয়ে ধরে গান ধরে দিল ছোকরা —

মৃত্যু-কুঠুরিতে যেথায় ছিনু শুয়ে
পশে নি দিবালোক আর্দ্র হিম ভুঁয়ে
সেথায় এল এক বৃদ্ধ জরাতুর...

কোমলভাবে হেসে গান থামিয়ে দিল ও। চোখদুটো ওর স্বচ্ছ আর আনন্দোজ্জ্বল দেখাল।

'এস, এক-পাত্তর খাওয়া যাক, খুড়ো!'

নিকিতিচও হাসল। বলল, 'বড্ড একা-একা ঠেকচে, তাই না?' যত দেখছিল ততই ছেলেটাকে ভালো লেগে যাচ্ছিল ওর। আহা, কী বাচ্চা, কত শক্তসমর্থ, কী সুপুরুষ দেখতে ছেলেটা। অথচ বেচারা বেঘোরে মারাও পড়তে পারত। 'আহা, বাছারে, তুইও অমনি খতম হয়ে যেতে পারতি, বুইলি। তাইগায় বন্দুক ছাড়া ঘুরে বেড়াবার মতন নচ্ছার বেপার আর হয় না।'

'আমাদের কিচ্ছুটি হবে না খুড়ো, বুঝলে? আমরা ঠিক বেঁচে থাকব!' আবার ওর গলাটা বেশ জোরালো শোনাল আর এক-মুহূর্তের জন্যে

চোখে খেলে গেল দূরে-হারিয়ে-যাওয়া চাউনি। তারপর ফের একবার চমকে গেল সেই 'ঠান্ডা হিম' চাউনিটা... ওই মুহূর্তে ও-যে কী ভাবছিল তা বলা শক্ত, তবে মনে হল কী যেন একটা মনে পড়ে গেছে ওর। কী একটা ব্যাপার যেন, যা ও মনে করতে চায় নি। গ্লাসটা হাতে তুলে এক-চুমুকে সবটুকু শেষ করে ফেলল ও, তারপর খুশির একটা ঘোঁত্‌ঘোঁত আওয়াজ তুলে মাথাটা নাড়ল, শেষে কয়েক টুকরো চর্বি মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল। অবশেষে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা — কিছুতেই ও চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকতে পারছিল না। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল ও। তারপর একসময় ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে পাছার দু'দিকে দুই হাত রেখে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। আর ফের একবার ওর চোখে ফুটে উঠল সেই দূরে-হারিয়ে-যাওয়া চাউনি।

'খুড়ো, আমি বাঁচতে চাই।'

'আরে, সব্বাই তো তাই চায়। তুমি কি ভাবো, আমি বাঁচতে চাই না? অথচ দ্যাখো, শিগ্‌গিরই আমার...'

'আমি বাঁচতে চাই!' বুড়োর কথা কানে না-তুলে খুশিভরা তীব্র গলায় প্রকান্ড বড়সড় সুশ্রী চেহারার ছেলেটা ফের একবার বলল। 'তুমি জানো না খুড়ো, জীবন কী জিনিস। জীবন হল...' এক-মুহূর্ত ভেবে নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে ফের বলল, 'জীবন হল... জীবন হল প্রাণের প্রিয় — প্রাণের প্রিয় জীবন।'

নিকিতিচের নেশা ধরে গিয়েছিল। খিকখিক করে হাসল সে। বলল:

'এমনভাবে তুমি জেবনের কথা বলচ যেন জেবন এট্টা মেয়েছেলে।'

'মেয়েছেলে হল গিয়ে শস্তা ভুসিমাল।' মনে হল এক ধরনের পাগলামি-ভরা উল্লাস পেয়ে বসেছে ছোকরাকে। বুড়োর প্রতি সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না রেখে বকে যেতে লাগল সে। আর নিকিতিচেরও এখন ওর কথা শুনতে ভালো লাগছিল। ছেলেটার অদম্য তীব্রতায় ও-ও যেন অভিভূত হয়ে পড়ছিল।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, মেয়েছেলে হল গে... তবে ওদেরে ছাড়াও তো চলে না দেখি...'

'প্রাণের প্রিয় আমার, ওকে আমি পাকড়াও করবই,' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতদুটো মুঠি পাকাল ছোকরা। 'প্রাণের প্রিয়কে টুঁটি টিপে পাকড়াও করব... কী, আমায় মনে পড়ে না তোমার, সোনামনি? আমি তো অধ্যাপক কোলিয়া! তুমি কি ভুলে গেলে আমাকে?' যেন সত্যিই কোনো মেয়ের সঙ্গে

কথা বলছে আর সে ওকে চিনতে না-পারায় ভারি অবাক হয়েছে এমন ভাব করতে লাগল ছেলেটা। 'হ্যাঁ, কোলিয়াই তো তার নাম... কোলিয়া কিন্তু তোমায় মনে রেখেছে। কোলিয়া তোমায় ভোলে নি।' হঠাৎ মনে হল কোনো কারণে ভারি খুশি হয়েছে ও, কিংবা কে জানে হয়তো কোনো সাংঘাতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মতলব ভাঁজছে। ও বলে চলল, 'এই তো আমি এখানে। এইদিকে আসুন, মহাশয়া। চমৎকার একটু আলাপ করা যাক দু'জনে মিলে। না-না, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না। তবে আপনাকে কিন্তু সবকিছু দিতে হবে আমায়। বুঝলেন, সবকিছু! কারণ, আমি তা আদায় করে তবে ছাড়ব!'

'সত্যি কোনো মেয়েছেলে তোমারে এমন খেপিয়ে তুলেচে নাকি?' ধাঁধায় পড়ে শুধোল নিকিতিচ।

শুনে ছেলেটা মাথা নাড়ল। বলল:

'না। এ-মেয়েছেলের নাম হল স্বাধীনতা। তবে একেও তুমি চেনো না, বুঝলে খুড়ো। তুমি একটা জন্তুর সামিল। তোমার এই বনে দিন কাটাতে ভালো লাগে। কিন্তু বড় শহরের আলোর ঝল্‌কানি-যে কী বস্তু, তার প্রলোভন-যে কী সাংঘাতিক তা তুমি জানো না। ওখানকার লোকজন এত মিহি-মোলায়েম যে কী বলি! ভারি মিষ্টি-মিষ্টি আরাম বোধ হয় ওখানে, আর মিষ্টি বাজনা বাজছে তো বাজছেই। লোকজন ওখানে সবাই ভারি ভদ্দরলোক, আর মরতে বড্ড ভয় পায় ওরা। আর আমি যখন শহরে থাকি তখন আমিই বনে যাই শহরের রাজা। তাহলে? তাহলে ওরা আর-সবাই ওখানে আর আমি এখানে কেন? বুঝলে আমার কথা?'

'কিন্তু তুমি তো চেরকালের লেগে এখেনে থাকচ না...'

'আমার কথাটা বুঝলে না তুমি।' ছোকরা এতক্ষণে আত্মস্থ হয়ে উঠেছিল, মুখেচোখে কঠোরতা প্রকাশ পাচ্ছিল ওর। বলল, 'আমার ওখানেই থাকা উচিত, কেননা আমি কাউকে ভয় পাই না। মরণকেও আমি থোড়াই কেয়ার করি। আর তার মানে, জীবন আমারই হাতের মুঠোয়।'

বুঝতে না-পেরে মাথা নাড়ল নিকিতিচ।

'তুমি কী বলতে চাইচ ধরতে লারচি, ছেলে।'

খাটের একটা মাচার কাছে গিয়ে ছোকরা গ্লাসদুটোয় ফের মদ ঢালল। হঠাৎ ওকে কেমন ক্লান্ত দেখাল।

'আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি, খুড়ো,' নীরস গলায় বলল ও। 'মদ খাওয়া যাক তাহলে, কেমন? কী, আমার জেল-পালানো উপলক্ষে খাবে নাকি মদ?'

যন্ত্রের মতো নিকিতিচ গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে ঠুন করে আওয়াজ তুলল। ছোকরা মদটুকু গলায় ঢেলে বুড়োর দিকে তাকাল... নিকিতিচ তখনও আগের মতোই গ্লাসটা তুলে ধরে ছেলেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'হল কী?'

'কথাটা তোমার ধরতে লারলাম।'

'খেয়ে নাও,' ছেলেটা হুকুম করল যেন। আরেকটা সিগারেট বের করতে গিয়ে দেখল প্যাকেটটা খালি। বলল, 'তোমার একটা সিগ্রেট দাও দেখি।'

'আমার তো তামাকপাতা।'

'তাই সই। কিছু এসে-যায় না ওতে।'

পাইপ ধরাল নিকিতিচ আর কাগজে তামাক পাকিয়ে ছোকরা সিগারেট ধরাল। ছেলেটা এসে বসল গাছের কাটা গুঁড়িটার ওপর, আগুনের আরেকটু কাছ ঘেঁষে।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু'জনেই।

'ওয়ারা তোমারে ধরে ফ্যালবে, লিচ্চয় করে বলতে পারি,' নিকিতিচ বলল। ছেলেটার কথা ভেবে তার-যে ঠিক দুঃখ হচ্ছিল তা নয়, তবে হঠাৎই তার চোখের সামনে ছবিটা ভেসে উঠল — অমন একটা বড়সড় সুন্দর দেখতে ছেলে, তাকে কিনা পাহারাওলারা পাকড়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটার উঠতি যৌবন, শক্তিসামর্থ্য আর সুপুরুষ চেহারাটার কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছিল তার। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে রাখবে তারা, আর এই সবকিছু বৃথা নষ্ট হবে, সবকিছু জলাঞ্জলি যাবে একেবারে। ও যেখানে যেতে চলেছে সেখানে সুন্দর চেহারায় কারও মন ভিজবে না। সত্যি, কী অপচয়! 'এমনধারা কাজ করা তোমার উচিত হয় নাই,' গম্ভীরভাবে বলল নিকিতিচ। ওর মদের নেশা কেটে গিয়েছিল।

'কী করা উচিত হয় নি?'

'এই, পালাবার চেষ্টা করা আর-কি। দিনকাল পাল্‌টেচে এখন — তুমি নিঘ্‌ঘাত ধরা পড়ে যাবে।'

ছেলেটা জবাব দিল না। চিন্তিতভাবে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সে। তারপর একসময় ঝুঁকে পড়ে এক-টুকরো চ্যালাকাঠ আগুনে ছুড়ে ফেলল।

'মানিয়ে-বনিয়ে তোমার থেকে যাওয়া উচিত ছেল... এয়াতে কোনো ফায়দা নাই।'

'আচ্ছা-আচ্ছা, হয়েছে, থামো!' আচমকা চড়াগলায় বলে উঠল ছোকরা। ওরও নেশা আশ্চর্যরকম ছুটে গিয়েছিল। 'আমিও একটু-আধটু বুদ্ধি রাখি, বুঝলে!'

'হ্যাঁ, এটা এট্টা ভাববার মতন কথা বটে', নির্কিতিচ সায় দিল। 'তা, তোমারে কি অনেক দূর যেতে হবে ?'

'আঃ, একটু চুপ কর দেখি!'

ছেলেটার মাথার পেছন দিকটা তাকিয়ে দেখতে-দেখতে নির্কিতিচ নিজের মনে ভাবল, 'ছোঁড়ার লিচ্চয় বাপ-মা আচে। তা, ফিরে গিয়ে তাদের কী সুখবরটাই দেবেন উনি! বেজম্মা কোথাকার!'

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ রইল দু'জনে। পাইপ থেকে পোড়া তামাকের ছাইটুকু ঠুকে-ঠুকে বের করে ফেলে ফের পাইপটা ভরল বুড়ো। ছেলেটা তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে।

সেদিক থেকে মাথা না-ঘুরিয়েই সে শুধোল, 'তোমার গাঁ কি এ-তল্লাটের সদর?'

'মনে তো নেয় না! সদর হল আমাদের গাঁ থেকে ভের্স্তা লব্বুইটাক দূর। সেখেনে তোমার যাওয়া সম্ভব না। তাইগার ভিত্রি দিয়ে শীতকালে অতটা পথ যাওয়া...

'তোমার এখানে আমি দিন-তিনেকের মতো থাকব। শরীরটায় আরেকটু বল পাওয়া দরকার...।' থাকতে পারে কিনা তা শুধোল না, শুধু মনের কথাটা জানিয়ে দিল।

'তা, থাকতে ইচ্ছা হলে থাক, আমার তাতে কী। মনে লিচ্চে, তোমার আরও বেশ কয়বছরের মেয়াদ ছেল। তা, জেলের ভিত্রি সহ্যি হল না, কেমন?'

'তা, বেশ অনেক বছর তো বটেই।'

'তা, জেলে যেতে হল কেনে?'

'আর কাউকে এমন প্রশ্ন শুধিও না খুড়ো, বুঝলে!'

জোরে-জোরে টেনে পাইপের আগুনটা ফের উস্কে নিল নির্কিতিচ, তারপর গলায় ধোঁয়া বেধে যাওয়ায় কাশতে শুরু করল খকখক করে। আর কাশির দমকের ফাঁকে-ফাঁকে বলতে লাগল, 'না, আমার দরকার কী!.. তবে কিনা দুঃখুর কথা এই... তুমি বাপু ধরা পড়ে যাবে-যে...'

'কে বলতে পারে, ভাগ্য ভালো হতেও তো পারে, ধরা না-ও পড়তে

পারি। যাই হোক, ওরা আমাকে মিনি-মাগনা ধরতে পারবে না। এস, খুড়ো, এবার ঘুমনো যাক।'

'তুমি বাপু বরং শুয়ে পড়। আমারে আবার আঙরাগুলা পুড়ে ছাই না-হওয়া অব্দি আরও খানিক বসে থাকতে নাগবে। পরে আমারে চিম্‌নির মুখটা বন্ধ করতে নাগবে কিনা। চিম্‌নি না-বন্ধ করলে সকালের মধ্যি আমরা জমে কাঠপানা হয়ে থাকব-নে।'

একটা মাচার ওপর গায়ের জার্সিখানা বিছিয়ে মাথার নিচে কিছু একটা রাখার খোঁজে ছোকরা এবার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ দেয়ালে-ঝোলানো নিকিতিচের বন্দুকটার দিকে নজর পড়ায় সে কাছে গিয়ে দেয়াল থেকে বন্দুকটা নামাল, তারপর পরীক্ষা করে দেখে ফের সেটা যথাস্থানে রেখে দিল। বলল:

'খুব পুরনো বন্দুক।'

'আরও কিছুদিন ওতেই কাজ চলবে আমার। হ্যাঁ, ওই-যে ওই কোণে একখান কম্বল আচে। মাচার উপরি ওইটা বিছিয়ে লাও আর জার্সিটা মাথার নিচে দ্যাও। পা দুখান চুল্লির কাছে রেখো কিন্তু। ভোর নাগাদ দারুণ ঠান্ডা বোধ হবে-নে।'

মাচায় কম্বল বিছিয়ে ছোকরা এবার সজোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে শরীরটা এলিয়ে দিল কম্বলে।

কী কারণে যেন হঠাৎ বলে উঠল ও, 'ছোট্ট তাসখন্দ আমার!' তারপর শুধোল, 'আমাকে দেখে তোমার ভয় লাগছে না, খুড়ো?'

'তোমারে দেখে ডরাব?' বুড়োর গলায় বিস্ময়ের সুর ফুটল। 'তোমারে দেখে ডরাব কেনে কও দিনি?'

'মানে... আমি তো একজন সাজা-পাওয়া অপরাধী, তাই নয় কি? খুন করার জন্যে আমি-যে সাজা পাই নি তার ঠিক কী?'

'খুন করে থাকলে ভগমান তোমারে সাজা দেবেন, মানুষে না। মানুষের হাত এড়াতে তুমি পালাতে পার, কিন্তু তেনার হাত এইড়ে পালাবার কোনো রাস্তা নাই।'

'তুমি কি ধর্মে বিশ্বাস কর নাকি? বাজি রাখছি, নিশ্চয়ই তুমি একজন ওল্‌ড বিলিভার — সনাতন বিশ্বাসী।'

'সনাতন বিশ্বেসী!.. সনাতন বিশ্বেসী হলে তোমার সাথে বসে ভোদ্‌কা গেলতাম নাকি?'

'ঠিক, ঠিক। তবে তোমার ওই ভগবানের কথাবার্তা দিয়ে আমার মাথাটা গুলিয়ে দিও না দেখি। ওসব শুনলে আমার গা-বমি দেয়।' কথাগুলো আলগাভাবে বলে গেল ছোকরা, কিছুটা ঘ্যানঘেনে নিষ্প্রাণ গলায়। 'তোমার ওই যিশুখ্রীস্টের দেখা যদি কোনোদিন পেতাম, তাহলে নির্ঘাত তাকে ছুরি মেরে দিতাম।'

'কিসের লেগে?'

'কিসের জন্যে?.. যতসব আজগুবি আষাঢ়ে গপ্পো সে বলেছে বলে, আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলেছে তাই, আবার কিসের জন্যে! এ-দুনিয়ায় অন্যের ওপর দয়া দেখায় কে? কেউ না! আর তোমার সজ্জন যিশু লোককে কিনা শিক্ষা দিয়েছে নম্র, ধীরস্থির হতে। বেজন্মা কোথাকার!' ছোকরার গলায় আবার আগের কঠিন, ঝগড়াটে সুর ফুটে উঠছিল, তবে আগেকার সেই উল্লসিত ভাব আর ছিল না। 'আচ্ছা, বল তো, এ-দুনিয়ায় দয়ালুটা কে? আমি? তুমি?'

'আমি আমার জেবনে কাউর ক্ষেতি করি নাই...'

'কিন্তু তুমি তো জীবজন্তু মারো, তাই না? তা, যিশু কি তোমায় তা-ই শিক্ষা দিয়েছে?'

'অমন তুলনা দিতে পার না! মানুষ আর জন্তু কি সমান হল?'

'জন্তুরও তো প্রাণ আছে, নাকি? তোমরা চিরকালই এইসব যুক্তি দেখিয়ে বকরবকর করে থাক। তোমাদের সব জানা আছে, দুমুখো শোরের বাচ্চা কোথাকার!'

ছেলেটার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না নিকিতিচ, তবে মনে-মনে সে বেশ কল্পনা করতে পারছিল — ফ্যাকাশে, দাড়িওয়ালা একটা মুখ। ছোট্ট কাঠের ঘরখানার তপ্ত স্তব্ধতায় অমন টিকলো, সুশ্রী মুখের এক ছোকরা, যে নাকি এমন শোচনীয় রকমের ভাগ্যহত, তার এই উত্তেজিত উন্মত্ত কণ্ঠস্বর নিকিতিচের কাছে কেমন পাগলামি-ভরা আর আজগবি ঠেকল।

'তা, আমার 'পরে এমন খেপে উঠলে কেনে?'

'মিথ্যে কথা বোলো না, বুঝলে! ওহে বুকে-হাঁটা যিশু, লোক ঠকিয়ে বেড়িও না। ওরা যদি তোমায় ধৈর্য ধরতে শিখিয়ে থাকে তো ধৈর্য ধরে থাক! কিন্তু আসলে তুমি কী চিজ, তা জানো? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শেষ করতে না-করতে তুমি তো মেয়েমানুষের ঘাড়ে চাপতে প্যান্ট খুলতে থাক, নোংরা শোরের বাচ্চা কোথাকার! আমি এবার একালের জন্যে নতুন এক

যিশুখ্রীস্ট আবিষ্কার করব, নিশ্চয়ই করব, যে জানবে কী করে চোয়ালে বিরাশি সিক্কার একখানা ঘুসি ঝাড়তে হয়। বলবে আর মিথ্যে কথা, বাছাধন? তাহলে খাও একখানা ঘুসি, বুকে-হাঁটা কৃমিকীট কোথাকার!'

'দ্যাখো, গালিগালাজ কোরো না বলচি!' এবার কড়াসুরে বলল নিকিতিচ। 'ভালো মনে তোমারে আমি ঠাঁই দিয়েচি এখেনে, আর তুমি কিনা আমার' 'পরেই এখন চোটপাট করতে নেগেচ। আসলে কয়েদ করে রাখায় মেজাজ বিগড়ে গ্যাচে তোমার। তা, বিনিদোষে তোমারে তো মিছামিছি কয়েদ করে নাই বাপু। তাইলে কও, দোষটা কার?'

'হুম।' দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ছোকরা, তবে বলল না কিছু।

'দ্যাখো বাপু, আমি তোমার পাদ্রি-পুরোত নই আর এটাও গির্জে নয় যে মনের সুখে তুমি তোমার গায়ের ঝাল মেটাচ্চ। এয়া হল গে তাইগা, এখেনে সবাই সমান। কথাটা মনে রেখ, বাপু। নইলে কস্মিনকালেও তোমারে ওই স্বাধীনতা-ফাদিনতার ধারেকাছে ঘেঁষতে হচ্চে না — তার আগেই তোমার ঘাড়মুড়ো ভেঙে একশা হয়ে যাবে-নে। দুব্বলের যম আর সবলের কাছে কেঁচো কারে কয় জানো তো বাপু। তা, একদিন-না-একদিন সমকক্ষ যুগ্যি লোকের সাথে মোলাকাত হবে-নে তোমার। আর তখন যদি তুমি মিছামিছি তারে চটাও, তাইলে তোমার স্বাধীনতার খোঁজ ভালো করেই সে বাত্‌লে দেবে-নে।'

'আহা, খুড়ো, চটো কেন!' ছোকরা এবার তোয়াজের সুরে বলল। 'আসলে উপদেশ-টুপদেশ আমার ভারি অপছন্দ, বুঝলে না! উপদেশ শুনলে গায়েরে রক্ত কেমন ফুটতে থাকে! লোকে তোমার নাকের সামনে অনবরত একপাল কৃমির মতো মানুষকে নাচাতে থাকবে আর বলবে, আহা, ওরা কী ভালো, ওদের মতো করেই জীবন কাটানো উচিত। সত্যি, দেখে-দেখে ঘেন্না ধরে গেছে আমার!' বলতে-বলতে প্রায় চ্যাঁচাতে শুরু করল ছেলেটা। 'না, কৃমির জীবন কখনও কাটাব না আমি। ওরা সব পয়লা নম্বর মিথ্যেবাদী! অমন জীবন তো পচা মড়ার গন্ধ ছাড়ে! পরিষ্কার ধোয়ামোছা মড়ার জন্যে আমাদের সবারই সহানুভূতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু ভালোবাসা? বরং তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা কর জীবন্ত মানুষকে, তার দেহের সবকিছু ধুলো-ময়লা সমেত। দুনিয়ায় আবার সাধুসন্ত বলে কিছু আছে নাকি? অন্তত আমার চোখে তো এমন লোক পড়ে নি। তাহলে? তাহলে মাথা থেকে তাদের আবিষ্কার করে লাভ কী?' বলতে-বলতে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে ছোকরা উঁচু

হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারের মধ্যে আবছা শাদা ছোপমতো তার মুখখানায় ভয়ঙ্কর হিংস্রভাবে জ্বলজ্বল করছিল দুটো চোখ।

'মাথা এট্টু ঠাণ্ডা হলে ব্যাপারখান তুমিও বুঝবে, বাপু। আরে, দুনিয়ায় যদি ভালো নোক না-থাকত তাইলে মানুষের বাস কবে উঠে যেত দুনিয়া থেকে। আমরা তাইলে একে অন্যরে কাঁচা খেয়ে সারতাম, নয়তো নিজেরা-নিজেরা খুনখারাপি রক্তারক্তি করে উজাড় হয়ে যেতাম। কোনো যিশুখ্রিস্ট আমারে এমন শিক্ষে দেয় নাই, এয়া আমার নিজের মনের কথা। আর সাধুসন্ত? সাধুসন্ত কেউ নাই — তুমি ঠিক কথাই কয়েচ। এই ধর-না কেনে আমি। আমি মন্দ নোক না। কেউ বলবে না যে আমি কোনোদিন মন্দ কি শয়তান নোক ছেলাম। তবু যখন আমার বয়েস কাঁচা ছেল... পাহাড়ের অপর দিকে সনাতন বিশ্বেসীদের ছোটমতন একখান গির্জেবাড়ি ছেল তখন। এট্টা পরিবারের বাস ছেল সেখেনে — এক বুড়া, তার ইস্তিরি আর তাদের মেয়ে। বছর পঁচিশেক বয়েস ছেল মেয়েটার। হতে পারে মেয়েটার বাপ-মা'র বয়েস তত বেশি ছেল না, কিন্তু তখন আমার তাই মনে হয়েছেল। ওয়ারা অবিশ্যি পরে এ-তল্লাট ছেড়ে চলে যায়... হ্যাঁ, আমি যা বলছেলাম। ওয়াদের এট্টা মেয়ে ছেল। যতখানি ধম্মোভীরু হতে হয় গোটা পরিবার তাই ছেল। আর তাই ওয়ারা দুনিয়ার নোকজনের থেকে তফাত হয়ে থাকত। বুইলে না, পাপের ছোঁয়াচ এড়াতে, এই আর-কি। তা, একদিন হল কি, মেয়েটারে ফুসলিয়ে আমি লিয়ে গেলাম এক বার্চবনে আর তারপর — জানোই তো, আদ্যিকালের যা কারবার তাই সারলাম তার সাথে। মেয়েটা ছেল চমৎকার — যেমন নম্বা-চ্যাওড়া তেমনি সোমত্ত। তারপর যা হবার তাই হল, বাচ্চা বিয়োল মেয়েটা। ইদিকে আমার তখন বে-সাদি সারা হয়ে গেচে...'

'আর তুমি বলছিলে কিনা জীবনে কারও ক্ষতি কর নি?'

'হ্যাঁ, সেই হল গে কথা। তাইলে দেখা যাচ্চে, আমিও সাধুসন্ত না। তবে খেয়াল রেখো, আমি কিন্তু মেয়েটারে বলাৎকার করি নাই। গোটা বেপারটাই ঘটেছেল সোহাগ দেখাতে গিয়ে, তবু ফলটা তো একই ফলল... দুনিয়ায় এক বাপছাড়া অনাথ সন্তানরে টেনে আনলাম আমি। কথাটা ভাবলে আজও আমার দুঃখু হয়। ছোঁড়াটা লিচ্চয় অ্যাদ্দিনে লায়েক হয়ে উঠেচে, আর আমারে খুব কষে শাপমান্যি দিচ্চে।'

'কিন্তু তুমি তো কাউকে প্রাণে মার নি, তুমি মানুষের জন্ম দিয়েছ। কে জানে, তুমি হয়তো মেয়েটাকে বাঁচিয়েই দিয়েছ। এ-ব্যাপারের পর হয়তো

মেয়েটা বাপ-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কে বলতে পারে, এটা না-হলে মেয়েটা বাপ-মায়ের দিন'ভর হাঁটু-গেড়ে-বসা আর প্রার্থনার চোটে হয়তো একদিন পাগলই হয়ে যেত, গলায় দড়ি দিত শেষকালে। পুরুষমানুষের সঙ্গে সহবাস যে কী বস্তু তা জানতেই পারত না কোনোকালে। কাজেই তুমি তো ভালো কাজই করেছ। তবে দুঃখ কিসের?'

'ভালোমন্দ বুঝি নে, তবে বেপারটা অমনই ঘটেছেল। অবিশ্যি, কাজটারে ভালো বলারও বিশেষ কোনো কারণ নাই।'

'বোতলটায় তলানি আর কিছু আছে নাকি?'

'জোলো মদ? তা, আছে এটুখানি তলানিমতন। ওটুক তুমিই খেয়ে লাও, আমার আর দরকার নাই।'

মদটুকু খেয়ে ফেলল ছোকরা, ফের সেই খুশির দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে। তবে সঙ্গে কিচ্ছু খেল না।

'বেশি মদ টানা অভ্যেস বুঝি তোমার?'

'না, শরীরটা ঠান্ডায় কালিয়ে গিয়েছিল তাই একটু বেশি খেলাম। তবে এভাবে ঠিক মদ খাওয়া যায় না, বুঝলে খুড়ো। মদ খেতে হলে পরিবেশটা মনমতো হওয়া দরকার। গান-বাজনা... দামি-দামি সিগারেট, শ্যাম্পেন... মেয়েছেলে — এসব চাই। সবকিছু হওয়া দরকার ভদ্র, সভ্যমতো।' বলতে-বলতে ছোকরা ফের আন্‌মনা হয়ে পড়ল, হাতদুটো মাথার পেছনে রেখে পেছনে হেলে পড়ল আবার। 'বেশ্যাকে ঘেন্না লাগে আমার। বেশ্যাবাড়ি যাওয়া শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢোকার সামিল। জীবনটা তবু সুন্দর হতে বাধা নেই! মরণের সঙ্গে এক রাত্রে সাত-সাতবার যদি খেলতে পাই তো মন্দ কী — বুঝলে আমার কথাটা? — আমার কাঁধে যদি তার হাড়-বের-করা হাতের ছোঁয়াচ পাই, বরফের মতো হিম দুটো ঠোঁটে যদি সে আমার কপালে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করে — তাহলে বড্ড ক্লান্তি বোধ করি। কিন্তু এরপরই আমার বিশ্রাম। সব ক'টা সরকারি উকিল মিলে জীবনটাকে যতখানি ভালোবাসে আর উপভোগ করে তার চেয়ে বেশি করি আমি। বিপদের কথা বলছ? হ্যাঁ, বিপদ আছে বৈকি। বুক আমার যতই ধড়ফড় করুক, ভেড়ার ল্যাজের মতো দাপাতে থাক যতই, কিছুতেই কিছু এসে-যায় না আমার। সোজাসুজি আমি বিপদ বরণ করি গিয়ে, তাতে আমার পা হড়কায় না কখনও, কখনও আমি পেছন ফিরে তাকাই না।'

'এয়ার আগে তোমার পেশা কী ছেল?' নিকিতিচ জিজ্ঞাসা করল।

'আমি ছিলাম সরবরাহ বিভাগের মুৎসুদ্দি। রীতিমতো লেখাপড়া-জানা লোক ছিলাম। "কলোরাডোর গুবরে-পোকা কী বস্তু ও তার বিরুদ্ধে লড়তে হয় কীভাবে" এসব নিয়ে বক্তৃতাও দিতাম...।' বলতে-বলতে হঠাৎ ছেলেটার গলা ধরে এল কেমন। মিনিটখানেক চুপচাপ থেকে সে এবার ঘুমঘুম গলায় বলল, 'এই আর-কি, খুড়ো... আচ্ছা, এবার আমি ঘুমোচ্ছি।'

'হ্যাঁ, সুনিদ্রে হোক তোমার।'

লোহার একটা শিক দিয়ে আগুনটা উস্‌কে দিল নিকিতিচ। তারপর পাইপে তামাক ভরে নিয়ে ছোকরার সম্বন্ধে ভাবতে বসল। হায়রে, একেই বলে জীবন! এই-যে ছেলেটা, এর তো সবকিছুই ছিল — দেখতে-শুনতে দিব্যি ভালো, স্বাস্থ্যও বেশ তাগড়াই, কথাবার্তা শুনে মনে হয় মাথায় মগজেরও কিছুমাত্র কমতি নেই। তবু, সব সত্ত্বেও, পরিণাম কী দাঁড়াল? ভবিষ্যতে এর কপালেই-বা আছে কী? এই অজাগর বিজনবনের মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে পালাতে চাইছে ছেলেটা? নাঃ, এতে আর কোনো সন্দেহই নেই, শহুরে জীবন এদের সবাইকে পাগলা করে দিয়েছে। শহরে যারা থাকে তাদের সবার মাথায় ছিট আছে দেখছি। নিকিতিচের নাতিরা — ওর তিন নাতি — তারা সবাই থাকে বড় একটা শহরে। ওদের মধ্যে দু'জন এখনও লেখাপড়া করছে আর তৃতীয় জন ঢুকেছে চাকরিতে। বিয়েও হয়েছে তার। এই ছোকরার মতো তাদের অবিশ্যি হামবড়াই ভাব নেই, তবে তারাও শহরের কুহকে মজেছে। গ্রীষ্মকালে নাতিরা যখন বেড়াতে আসে এখানে, তখন একঘেয়ে জীবনে বিরক্তি ধরে যায় তাদের। নিকিতিচ অবিশ্যি তাদের শিকারের বন্দুক যুগিয়ে দেয়, তাইগার মধ্যে পথ দেখিয়ে এদিক-সেদিক নিয়ে যায়। ভাবে, এতে বুঝি তারা চন্‌মনে হয়ে উঠবে, পড়াশুনোর ভাবনাচিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তর্‌তাজা ভাব ফিরে পাবে। তারা অবিশ্যি ভান করবে এমন যেন সবকিছু খুবই উপভোগ করছে। আর এতে নিকিতিচ ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে, কেননা নাতিদের খুশি করার মতো আর কোনো সম্বল তার নেই বলে। তার খালি মনে হতে থাকে, নাতিদের যেন সে ঠকাচ্ছে। সত্যি, শহর ছাড়া আর কিছু তারা ভাবতেই পারে না। আর মাচায়-শোওয়া এই ছোকরা তো সেখানে যাবার জন্যে পাগলই। অথচ এর যা অবস্থা তাতে বনের গভীর কোনো এলাকায় লুকনোর আস্তানা বানিয়ে অন্তত পক্ষে বছর পাঁচেক এর গা-ঢাকা দিয়ে থাকা উচিত। কয়েদখানা যদি

এতই অসহ্য বোধ হয় তাহলে এ ছাড়া আর গতি কী! অথচ ছেলেটা কিন্তু সোজা সেইখানেই যেতে চাচ্ছে যেখানে প্রতি পদে ওর ধরা পড়ার সম্ভাবনা। ও-যে বোঝে না এটা মোটেই তা নয়, তবু ওকে যেতে হবেই। 'আচ্ছা, এই ছেলেপিলের উপর শহরগুলোর এতখানি মোহিনী মায়ার জাল ছড়ানোর বেপারটা আসলে কী? আমি অবিশ্যি বুড়ামানুষ, তাছাড়া শহরে গেচিও মাত্তর তিনবার গোটা জেবনে। হতে পারে ব্যাপারখান আমি ঠিক বুঝি না। অবিশ্যি অনুমান করতে পারি যে শহরে অঢেল মজা আর হাজারো ঝলমলে আলো আচে। তবু কিসের লেগে-যে এত টান তা ঠিক বুঝি না, তাই এরে দুয়ো দিতেও কিন্তু-কিন্তু ঠেকে। কেউ যদি শহরে গিয়ে থাকতে চায় তো থাকুক গে'। আমার অবিশ্যি এ-জায়গাটাই ভালো ঠেকে। কিন্তু শহুরে নোকজন এখেনে পা দিয়েই নাক তুলে-তুলে কথা কয়, বলে এয়া নাকি ভারি একঘেয়ে আর কষ্টের জায়গা। জায়গাটারে আরেট্টু ভালোমতন ঠাহর করে দেখে না কেনে ওয়ারা! চক্ষু মেলে ভালোমন্দ কিছু এট্টা দেখার আগেই শহরের হেন-তেন লিয়ে বারফট্টাই জুড়ে দেয়। আরে, ভালো করে দেখবি তো আগে পিঁপড়া বাঁচে কেমন করে, কিংবা ধরু, ছুঁচোর বাঁচার ধারাটা কী, কিংবা আর-সকল খুদ্দুর পেরানি বাঁচে কেমন করে! আর কিছু না, শুধু কৌতূহল মেটাবার লেগেই চেয়ে দ্যাখ্ একবার! তাম্পর নিজেরে শুধো জেবন সম্বন্ধে কতখানি জ্ঞান আচে তোদের। তোরা আমারে তোদের পেল্লায় শহরের পরীর গপ্পো শোনাতে চাস? কিন্তু আমি যা জানি তা যদি তোদেরে বলি তো কেমন হয়! গাঁয়ের নোকে আমার কথা শোনতে চায় না। শহর থেকে এয়েচিস বলে তোদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কিন্তু ওয়াতে আমার মন ভোলে না, বুয়েচিস! রাস্তা দিয়ে তোরা যখন বাহারে জুতা মস্‌মসিয়ে বড়াই দেখিয়ে হেঁটে যাস, তখন আমার তাতে কাঁচকলা এসে-যায়। এ-ছোঁড়া বহুত্ চাল মেরেছে জেবনে, আর তার সোন্দর জেবনটা ভোগ করতে গিয়ে ফাটকে আটকা পড়েচে বোধহয় বছর পনরোর লেগে। লিচ্চয় ছোঁড়া দোকানে সিঁদ কাটতে গেছিল। এককালে আচ্ছাসে ফুর্তি লুটেচে বাছাধন আর এখন পড়ে গ্যাচ ঘোর বিপাকে। তবু এখন ছোঁড়া আবার ওই জেবন ফিরে পেতে চায়। শহর বিনে ছোঁড়া বাঁচতেই পারে না দেখি। নাক-বরাবর সিধে গিয়ে কোনো দোকান বা আর কোথাও সেঁধোতে চায়। শ্যাম্পেন... হুঃ, যত্তোসব! কিন্তু চাইলেই কি তা পাওয়ার যো আছে? কেমন করে পাবে? যত্তোসব আহাম্মকের গুষ্টি... রাক্ষুসি শহর তোদেরে

খেয়ে থোবে-নে, হাড়মাস সবকিছু খাবে। তোদের আহাম্মকি দেখে দুঃখু নাগে, কিন্তু আমি তার কী করতে পারি। তোদের সাথে তক্কো করেই-বা নাভ কী।'

চ্যালাকাঠগুলো পুড়ে শেষ হয়ে আসছিল। ছাইয়ের মধ্যে আগুনের শেষ ধিকিধিকিটুকু নিবে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল নিকিতিচ, তারপর চিমনির মুখ বন্ধ করে লণ্ঠন নিবিয়ে ছোকরার পাশে শোবে বলে মাচায় উঠল। ঘুমের মধ্যে শান্তভাবে নিয়মিত নিশ্বাস পড়ছিল ছেলেটার, কাত হয়ে শোওয়ায় একখানা হাত অস্বস্তিকরভাবে দুমড়ে ছিল ওর দেহের নিচে। নিকিতিচ যখন হাতখানা টেনে সোজা করে দিল তখনও ছেলেটা বিশেষ নড়ল-চড়ল না।

'শরীলে আর আয় দিচ্চে না, তাই-না? মর্কট ছোঁড়া কোথাকার,' আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল নিকিতিচ। 'কিন্তু কে তোরে এমন কাজ করতে বলেছেল? ইঃ, একবার যদি লিজের পানে তাকিয়ে দেখতে পারতি কী হাল করেচিস লিজের!'

...মাঝরাত্রের পর কোনো এক সময়ে কুঁড়ের বাইরে কয়েকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে হল, জনা দুই-তিন লোক কথা বলছে।

ছেলেটা ইতিমধ্যে সটান খাড়া হয়ে বিছানায় উঠে বসেছিল। মনে হচ্ছিল যেন কখনোই ও ঘুমোয় নি। নিকিতিচও মাথাটা তুলে কথা শুনতে লাগল।

'কারা ওরা?' ছোকরা তড়বড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি শালা তার কী জানি!'

মাচা থেকে পিছলে নেমে ছেলেটা একটা কান সেঁটে রাখল দরজায় আর অন্ধকারে দেয়াল হাতড়াতে লাগল বন্দুকটার খোঁজে। নিকিতিচ ওর মতলবটা বুঝে ফেলল।

ফিস্‌ফিসিয়ে ধমকে উঠল সে, 'খবদ্দার, মুখ্যুমি কোরো না বাছা! এতে ঝামেলা আরও পাকিয়ে ওঠবে।'

'কারা ওরা?' ফের শুধোল ছেলেটা।

'বললাম তো, আমি জানি না।'

'ওদের ঢুকতে দিও না। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দাও।'

'ওরে গাধা, ওসবের রেওয়াজ নাই এ-তল্লাটে! দরজায় আগড়বাগড় কিছু নাই। এস, বিছানায় শুয়ে পড় আর লড়াচড়া একদম কোরো না।'

'খুড়ো, শোনো, আমি বলছি কী...'

কথাটা শেষ করতে পারল না ছোকরা। বাইরে কে যেন সিঁড়ি বেয়ে

উঠে ততক্ষণে দরজার হাতলটা হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে লেগেছিল। সরীসৃপের মতো পিছলে মাচায় উঠে পড়ল ছোকরা আর সেখান থেকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'খুড়ো, ভগবান আর শয়তানের নামে দিব্যি করে বলছি, যদি তুমি আমায় ধরিয়ে দাও তাহলে কিন্তু... দয়া কর বুড়োকত্তা, তোমার দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলব না...।'

'মাথা নাবিয়ে শোও বলচি,' হুকুম করল নিকিতিচ।

এমন সময় হাট করে খুলে গেল দরজাটা।

খুশিভরা গম্ভীর একটা গলা শোনা গেল, 'এই তো! কেমন বলছেলাম-না কেউ একজনা আচে এখেনে। ঘরের ভিত্‌রি তোফা গরম! চলে এস, চলে এস!'

'বলী, দরজাটা বন্ধ করবে, না না?' মাচা থেকে নামতে-নামতে বিরক্তিভরা গলায় বলল নিকিতিচ। 'ঘর গরম আচে বলে তো আহ্লাদে আটখানা! তা, দরজাটা আরেটু ফাঁক করে দ্যাও, তাইলে তোফা গরম থাকবে-নে ঘর!'

'আরে, ঠিক আচে, ঠিক আচে,' গম্ভীর গলাটা ফের গমগম করে উঠল। 'ঘরও গরম, আমরাও স্বাগতম!'

নিকিতিচ এবার লণ্ঠনটা জ্বালল।

আরও দু'জন লোক ঘরে ঢুকল। ওদের একজনকে চিনল নিকিতিচ, লোকটি জেলা-মিলিশিয়ার কর্তা। শিকারিরা সবাই ওকে চেনে। কারণ, লোকটি তাদের শিকারের অনুমতি-পত্র দেখতে চেয়ে জ্বালাতন করে মারে আর সেই অনুমতি-বাবদ পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিতে বাধ্য করে। বছর পঞ্চাশেক বয়সের লম্বা-চওড়া ষণ্ডা জোয়ান লোকটা।

নিকিতিচকে দেখে সে শুধোল, 'তোমার নাম তো ইয়েমেলিয়ানভ, তাই-না?'

'হ্যাঁ, কমরেড প্রতোকিন।'

'বহুত্‌ আচ্ছা, আমরা তাইলে তোমার অতিথ্‌।'

অতিথি তিনজন এবার তাদের ওভারকোট খুলতে লাগল।

'কী, শিকার করতে বেইরেচেন?' নিকিতিচ শুধোল। গলায়-যে একটু ঠাট্টার সুর লাগল না এমন নয়। এই ধরনের অতিথ্‌ শিকারিদের সে আদৌ পছন্দ করে না। ওরা খালি হৈচৈ-চেঁচামেচি করতেই জানে, আর তারপর ফের যে-যার পথে চলে যায়।

'এক-আধটুক বিশ্রাম তো দরকার। তা, ওখেনে আবার কে শুয়ে?' মাচার ওপর শুয়ে-থাকা ছোকরার দিকে নজর পড়েছিল মিলিশিয়ার কর্তার।

'ভূতত্ত্ববিদ,' নিকিতিচ সংক্ষেপে জানাল। 'দলছাড়া হয়ে পাছু পড়ে গেছিল।'

'পথ হারিয়ে ফেলেছেল কি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কই, আমরা তো এমন কোনো খবর পাই নাই। দলটা যাচ্ছিল কোনদিক পানে? কিছু কয়েচে ছোকরা?'

'কেমন করে বলবে বলেন! ঠাণ্ডায় সব্বাঙ্গ এমন জমে গেছিল যে মুখ পর্যন্ত খোলতে লারছিল। দু-এক পাত্তর মদ গিলিয়ে তবে ওরে এটু চাঙ্গা করে তুলেচি। তা, এখন দেখি মড়ার মতন ঘুম দিচ্চে।'

মিলিশিয়ার কর্তা দেশলাইয়ের একটা কাঠি জেবলে ছেলেটার মুখের কাছে তুলে ধরল। নিস্পন্দ মুখ, একটা পেশী পর্যন্ত নড়ছে না। ছেলেটা নিশ্বাস নিয়ে চলেছে আস্তে-আস্তে, সমভাবে।

'তুমি ওরে ভালোই মদ গিলিয়েচ দেখচি।' কর্তার দেশলাই-কাঠিটা নিবে গেল। 'কিন্তু আমরা কিছুই জানতে পারলাম না এটা কেমনধারা ব্যাপার?'

'হতে পারে খবর দেয়ার সময় পায় নাই,' তিনজনের অপর একজন মন্তব্য করল।

'উঁহু, দেখে মনে নিচ্চে অনেকদিন ধরে জঙ্গলে ঘোরচে ছোকরা। কতদিন একা-একা ঘোরচে কিছু বলেচে নাকি তামারে?'

'কই, না তো,' নির্কিতিচ জবাব দিল। 'শুধু বলল যে দলছাড়া হয়ে পাছু পড়ে গেছিল — এই মাত্তর।'

'ঠিক আচে, ঘুমাক। চাঙ্গা হয়ে উঠুক। কাল সকালে কথাবাত্তা কয়ে দেখা যাবে-নে। কী, দোস্ত-সব, শোবার লেগে তৈরি?'

'তৈরি তো, কিন্তু সবার শোবার জায়গা হবে?' অপর দু'জন বলে উঠল।

'এতেই হবে, যথেষ্ট জায়গা,' জোর দিয়ে বলল মিলিশিয়ার কর্তা। 'গতবার পাঁচজনা আস্তানা গেড়েছেলাম এখেনে। সকাল হতে দেখি জমে কাঠপানা মেরে রয়েচি। ঘর গরম করা হয়েছেল, তবে যথেষ্ট গরম হয় নাই। বাইরি তখন শূন্যির নিচে পঞ্চাশের মতন ঠাণ্ডা হবে।'

ওভারকোট খুলে ফেলে চওড়া মাচাটায় উঠে পড়ল তিনজনে। নির্কিতিচও এসে ছোকরার পাশে তার নিজের জায়গায় শুল।

আগন্তুকরা জেলার ব্যাপারস্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাল, তারপর আস্তে-আস্তে একসময় চুপ মেরে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

...জানলায় আলো ফুটতেই নির্কিতিচের ঘুম ভেঙে গেল। দেখল ছোকরা

পাশে নেই। সাবধানে চুপিচুপি মাচা থেকে নেমে পড়ে পকেটে দেশলাইয়ের খোঁজ করতে লাগল সে। কোথাও-যে কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে প্রথমটায় ওর তা মনে হয় নি। একটা কাঠি জ্বালল নিকিতিচ... ছোকরা বা তার জার্সির কোনো পাত্তা নেই — এমন কি নিকিতিচের নিজের বন্দুকটাও নেই। বুড়োর বুকটা ধ্বক করে উঠল।

ছোকরা পালিয়েছে। বন্দুকটাও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

নিকিতিচ নিঃশব্দে পোশাক পরে নিল, এককোণে গাদা-করে-রাখা তিনটে বন্দুকের একটা তুলে নিল হাতে, তারপর নিজের পকেট হাতড়ে দেখল 'বাক্‌শট' কার্তুজগুলো ঠিকঠিক পকেটে আছে কিনা। অবশেষে নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

সবে ভোর হচ্ছে তখন। রাত্রের মধ্যেই ঠাণ্ডাটা খানিক কমে গিয়েছিল, ভোরের অস্পষ্ট রঙ্‌ফেরাকে ঢেকে ছিল ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশা। পাঁচ-পা দূরেও কিছু ঠাহর করা যাচ্ছিল না। বাতাসে ভাসছিল বসন্তের সোঁদা গন্ধ।

দু'পায়ে স্কি পরে নিল নিকিতিচ। তারপর ময়লাটে বরফের ওপর স্পষ্ট ফুটে-ওঠা স্কি-এর সদ্য-তৈরি দাগ-বরাবর রওনা দিল।

'কুত্তির বাচ্চা, দুর্গন্ধ ছুঁচো কোথাকার,' আপনমনে গাল দিতে লাগল ও। 'গেচিস, ভালো করেচিস, হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচা গ্যাচে, কিন্তু আমার বন্দুকখান হাতালি কিসের লেগে? বন্দুক ছাড়া এ-জঙ্গলে আমার চলবে কেমন করে? একবার ভাবলি না তা? আমারে কী ভেবেচিস বল্ দেখি? হাজার-হাজার ট্যাকা রোজগার করি না কী, যে তোদের সবাইরে বন্দুকের যোগান দিতে পারি? অথচ ভালোই জানিস বন্দুকটা লিয়ে তোর কোনো কাম নাই, কোথাও ওটারে ফেলে থুবি, হতভাগা কোথাকার! তোর মতলব খালি তাইগা ছেড়ে পালানো, আর ইদিকে বন্দুক ছাড়া আমি কী করব? বসে-বসে বুড়া আঙুল চোষব? এমন মনিষ্যি তোরা, একফোঁটা বিবেক কি চক্ষুলজ্জা বলে এট্টা পদাত্থ পর্যন্ত থাকতে নাই!'

ক্রমশ ফর্সা হয়ে এল। মনে হল, দিনটা যেন মেঘলা আর গরম থাকবে।

আগের স্কি-এর দাগ গাঁয়ের দিকে যায় নি, বোঝা গেল।

'ও! নোকের কাছে যেতে তোর বড্ড ডর নাগে, তাই-না? তুই আর তোর সোন্দর জেবন মানুষরে ডরায়। বুড়া মান্‌ষের একমাত্তর বন্দুকটা হাতাতে পারলি, সেটা তোর কাছে কিছু না। কিন্তু আমার নাগাল এইড়ে যেতে

পারবে না, বাছাধন! যতই কচিকাঁচা হোস-না কেনে, তোর মতন অমন সাতটার আমি মহড়া লিতে পারি।'

বুড়ো-যে ব্যাপারটায় সাংঘাতিক চটেছিল তা নয়। যত-না চটেছিল দুঃখ পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি। ছোকরার জন্যে সাধ্যমতো সবকিছু করল ও, আর সে কিনা উলটে ওর বন্দুকটাই হাওয়া করে দিল। এমন জঘন্য কাজ মানুষেও করে!

ইতিমধ্যেই নিকিতিচ তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছিল। দিনের আলো প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এর মধ্যে, সামনে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল আগের স্কি-জোড়ার স্পষ্ট দাগ।

ছোকরা নিশ্চয় রাত থাকতে উঠে পড়েছিল। কিন্তু কিচ্ছুটি টের পেতে দেয় নি তো! আশ্চর্য!

দেখা গেল একটা জায়গায় বিড়ি টানার জন্যে থেমেছিল ছোকরা। থামার পর হাতের লাঠিদুটো যেখানে বরফে গুঁজে রেখেছিল তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল স্কি-এর টানা দাগের পাশে, আর দেখা যাচ্ছিল তামাকপাতার কয়েকটা কুচি আর একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি।

'ও! ছোঁড়া আমার তামাকের থলিটেও হাতিয়েচে!' চটেমটে থুক করে থুথু ফেলল নিকিতিচ। 'সত্যি, কদ্দুর আস্পদ্দা!' এবার আরও জোরে পা ছোটাল ও।

...দূর থেকে ছোকরাকে ও দেখতে পেল নিচে — একটা খোয়াইয়ের তলায়।

দুলে-দুলে বেশ জোর কদমেই চলেছিল ছোকরা, তবে খুব-যে তাড়াহুড়ো করছিল তা নয়। বন্দুকটা ওর পিঠে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো ছিল।

নিকিতিচকে মানতেই হল যে স্কি করা কাকে বলে ছেলেটা তা জানে। স্কি-এর দাগের বাঁধা রাস্তা ছেড়ে এবার নিকিতিচ একটু ঘুরে চলল যাতে ছেলেটাকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে ও এগিয়ে যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখল যাতে খোয়াইয়ের ওপরকার টিলার লম্বা গড়ানে অংশটার আড়ালে-আড়ালে ছেলেটার চোখ এড়িয়ে ও নামতে পারে। ঠিক কোন জায়গাটায় যে ওরা দু'জন মুখোমুখি হবে তা ও প্রায় নির্ভুলভাবেই জানত। শিগ্গিরই ছেলেটা সরু একটা জংলা রাস্তায় এসে পড়বে। ওই রাস্তাটা পেরিয়ে এলেই সে ফের পড়বে এসে ঘন বনের এলাকায়। আর ঠিক সেই জায়গাটাতেই নিকিতিচ তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

'এইবার একচোট দেখে লিব তোরে,' হাতের লাঠিদুটোয় সজোরে ঘা

দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে নির্কিতিচ আপনমনে বিড়বিড় করে বললে। ওর কথায় বিদ্বেষও যে ফুটে বেরুল না এমন নয়। অথচ আশ্চর্য এই যে ও ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ছেলেটার সুন্দর মুখখানা একবার দেখতে। মুখটার যেন কী-একটা গভীর আকর্ষণ ছিল। হয়তো ওর এই সুন্দর জীবনে বাঁচার জন্যে আগ্রহটা ওর পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। সত্যিই তো, ভাবতে গেলে এখেনে পচে মরে ওর ফায়দাটা কী? জীবনটা খালি নষ্ট হয়ে যেত এই আর-কি। ধুত্তোর, মরুক গে ছাই, জীবনটা সত্যিই একটা ধাঁধা!

জংলা পথটার ওমাথায় পৌঁছে নির্কিতিচ সাবধানে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল। না, বরফের ওপর স্কি চলার কোনো দাগ নেই — তার মানে ও-ই আগে এসে জায়গাটায় পৌঁছেছে। যে-জায়গাটায় ছোকরার জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা সেই জায়গাটা বেছে নিয়ে কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে ও গুঁড়ি মেরে বসল। বন্দুকে টোটা ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওত্ পেতে। হাতে-ধরা বন্দুকটা খুঁটিয়ে দেখতেও ওর শিকারীর চোখ কসুর করল না। তুলা-র কারখানায় একেবারে সদ্য-তৈরি বন্দুকটা চকচক করছিল, কলকব্জার তেলের গন্ধ ছাড়ছিল ভরভর করে। এইসব আজব শিকারী শিকার করতে যায় অথচ তাদের কখনও মনে হয় না যে বন্দুক থেকে এত উগ্র গন্ধ ছাড়া উচিত নয়। শুধু তা-ই বা কেন, শিকার করতে গেলে তামাকের কথাও ভুলে থাকা ভালো। বরং বেরোবার আগে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া মুখটা চা দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেয়া দরকার, নইলে চারপাশে কয়েক মাইল জায়গা তোমার তামাকের গন্ধে ভরে থাকবে। তাছাড়া শিকারের সময় পরতে হবে অন্য জামাকাপড়, যা নাকি তার আগে বেশ কিছুদিন বাইরে মেলা থেকেছে। কেননা, জামাকাপড়ে মানুষের গায়ের আর বসতবাড়ির গন্ধ থাকলে চলবে না। হ্যাঃ, এরা নাকি আবার শিকারি!

জংলা রাস্তাটার মুখে এমন সময় বেরিয়ে এল ছোকরা। থামল একবার। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দ্রুত রাস্তাটা পার হয়ে এল। হঠাৎ নির্কিতিচ দাঁড়িয়ে উঠে ছেলেটার মুখোমুখি হল।

'হল্ট! হাত তুলে দাঁড়াও!' সজোরে চেঁচিয়ে উঠে ছোকরাকে চমকে দিল ও। ছেলেটা মাথা তুলল যখন, দেখা গেল ওর চোখে আতঙ্কের চিহ্ন। হাতও তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় নির্কিতিচকে ও চিনতে পারল। 'কী, বড়মুখ করে-

যে কয়েছেলে কারেও নাকি ডরাও না তুমি,' নির্কিতিচ বলল। 'তা, দেখতে পাচ্চি এয়ার মধ্যেই পাতলুনে পেচ্ছাপ করে সেরেচ।'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ছোকরা, ভয় কাটিয়ে উঠল। তারপর খানিকটা চেষ্টা করেই যেন মুখে তার সেই মনমাতানো হাসি ফুটিয়ে তুলল।

'সত্যি খুড়ো... কায়দাকানুন তুমি ভালোই জানো তা মানতে হচ্ছে। একেবারে ফিল্‌মে যেমন দেখা যায় তেমনি। প্রায় আমার হার্টফেল করিয়ে দিয়েছিলে আর-কি।'

'ঠিক আচে, এখন আমি যা কই তা-ই শোন,' কেজো লোকের ভঙ্গিতে নির্কিতিচ বলে চলল। 'বন্দুকটারে পিঠ থেকে নামিও না, খালি পিছনে হাত দে' টোটা দুটা বার করে আন। আর পকেটগুলোয় যত টোটা আচে সব বার করে দ্যাও। সবসুদ্ধ আমার ষোলখান টোটা ছেল। সব কয়টা বরফের 'পরে ফেলে দূরে সরে দাঁড়াও। চালাকি খেলার চেষ্টা পেও না, পেলে গুলি চালাব। এয়া কথার কথা না, যা বলচি তা-ই করব কিন্তু।'

'বুঝলাম, খুড়ো। আমারও এখন ঠাট্টা-তামাশা করার মেজাজ নেই বিশেষ।'

'তুই এট্টা বে-সরম চোট্টা।'

'তুমি তো নিজেই বলেছিলে যে বন্দুক ছাড়া চলার মতো জায়গা জঙ্গল নয়।'

'কিন্তু বন্দুক ছাড়া আমার চলত কেমন করে?'

'এখানে তুমি তো তোমার দেশগাঁয়ের মধ্যেই আছ।'

'বটে, বটে, তাপ্পর! দেশেগাঁয়েই আচি আমি, তাই-না? তা, দেশেগাঁয়ে আমার আচেটা কী — বন্দুকের কারখানা?'

ছোকরা পকেট থেকে কার্তুজগুলো বের করে বাইরে ফেলল। নির্কিতিচ গুনে দেখল, ঠিক চোদ্দটা আছে। তারপর ছোকরা পেছনদিকে হাতদুটো বাঁকিয়ে দিল। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে, বুড়োর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে-থাকা চোখদুটোকে সরু-সরু করে কিছুর একটা চেষ্টা করতে লাগল। নির্কিতিচও একই রকম স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর ওপর নজর রাখছিল আর বন্দুকটা ধরে রেখেছিল ছোকরার বুকের দিকে তাক করে।

'কী, ঝামেলা বাধচে কিসে?'

'গুলিদুটো বের করতে পারছি না...।'

'নখ নাগাও, লয়তো মুঠি দে' বন্দুকের বাঁটে ঘা দ্যাও।'

অতঃপর এইভাবে একটা কার্তুজ বেরিয়ে পড়ল, তারপর অপরটাও।

‘ঠিক আচে। এখন ওইখেনে সরে দাঁড়াও।’

ছোকরা হুকুম তামিল করল।

কার্তুজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নির্কিতিচ নিজের কোটের পকেটে ভরল।

‘এবার বন্দুকখান ছুড়ে দ্যাও, তবে নোড়ো না একচুল।’

পিঠ থেকে বন্দুকখানা খুলে নিয়ে ছোকরা এবার সেটা নির্কিতিচের দিকে ছুড়ে দিল।

‘আচ্ছা, এবার যেখেনে আচ ওইখেনেই বোসো। এবার এট্টা করে বিড়ি ধরানো যাক। তামাকপাতার যে-থলিটে চুরি করেচ সেটা আমার দিকে ছুড়ে দ্যাও দিকি।’

‘কখনও-কখনও সিগ্রেট খাওয়ার দরকার পড়ে, তাই।’

‘সব্বদা তোমার দরকারটাই বড় কথা, তাই বুঝি? আর আমার প্রেয়জনের কথাটা তোমার কখনও মনে লেয় না, স্বাত্থপ্পর শয়তান কাঁহাকা! আমি পাইপ খেতাম কেমন করে শুনি?’

নিজে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরিয়ে নিল ছোকরা।

‘তোমার থেকে তামাক একটুখানি রেখে দেব কি?’

‘রাখ। দিয়াশলাই আচে?’

‘আছে।’

নিজের জন্যে একমুঠো তামাকপাতা বের করে নিয়ে থলিটা বুড়োর দিকে ছুড়ে দিল ছোকরা। নির্কিতিচও পাইপে তামাক ধরিয়ে নিল।

পরস্পরের কাছ থেকে হাত-পাঁচেক দূরে বসল দু’জন।

‘ওরা চলে গেছে কি? ওই যারা কাল রাত্তিরে এসেছিল?’

‘এখনও ঘুমাচ্চে তারা। তারা খালি ঘুমাতেই দড়। ওয়ারা তো শিকার করতে আসে না, আমি বলি, ওয়ারা আসে মজা নুটতে। ওয়ারা চায় শুধু ফুর্তি নুটতে, কিন্তু নিজের দেশেগাঁয়ে বসে তেমন পেরান ভরে ফুর্তি নোটা চলে না — নানা নোকে নানান কথা কয়। তাই ওয়ারা নোকের চোখের আড়ালে যেতে চায় ফুর্তির খোঁজে।’

‘ওরা কারা?’

‘তা-বড় তা-বড় নোক সব... দামি গুলি-বারুদ ধ্বংস কচ্চে বসে।’

‘হুঁ...।’

‘তুমি কি ভেবেছেলে আমি তোমারে ধরতে পারব না?’

‘আমি কিছুই ভাবি নি। আচ্ছা, তুমি তো ওদের একজনকে চেনো, তাই-

না? ও লোকটা কে? তুমি তো ওর নামটাও বললে শুনলাম... নামটা প্রত্যোকিন না কী যেন বললে?'

'নোকটা সামাজিক বীমার দপ্তরে কাজ করে। আমার বুড়ির পেন্সনের ব্যবস্থা ও-ই করে দেছিল। ওয়ার আপিসেই ওয়ার সাথে আমার আলাপ।'

শুনে ছোকরা নিকিতিচের দিকে সন্ধানী চোখে তাকাল।

'ওই আপিস থেকেই কি তোমাদের স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার পাস দেয়া হয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা।'

'তুমি কিন্তু কথা ঘোরাচ্ছ, খুড়ো। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে জেলখানায় ফেরত পাঠাতে চাও না? তাই কি? শুধু তোমার বন্দুকটা নিয়েছি বলে?'

'আরে, তোমারে আমি ফাটকে ভরতে চাইব কোন দুঃখে?' বেশ আন্তরিকভাবেই কথাটা বলল নিকিতিচ।

'বন্দুকটা আমাকে বেচে দাও। সঙ্গে টাকা আছে আমার।'

'না,' নিকিতিচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল। 'কাল রেতে যদি ভদ্দরনোকের মতন আমার কাছে চাইতে বন্দুকটে, তাইলে হয়তো আমি রাজি হয়ে যেতাম। কিন্তু কাজটা যেভাবে তুমি ছোটনোকের মতন করেচ তাতে আর আমি তোমারে বিক্কিরি করতে পারি নে।'

'কিন্তু ওরা জেগে ওঠা পর্যন্ত আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তুমিই বল-না, সম্ভব ছিল কি?'

'তা না, তবে তুমি আমারে কাল রেতের বেলাতেই একসময় বাইরি ডেকে নিয়ে যেতে পারতে। বলতে পারতে, "খুড়ো, এইসব নোকজনের সাথে আমি কথাবাত্তা বলতে চাই নে। তুমি বরং আমারে তোমার বন্দুকটে বেচে দ্যাও আর আমি চুপিচুপি সরে পড়ি।" কিন্তু তুমি কী করলে, না চুরি করলে বন্দুকখান। জানো, এ-তল্লাটে চুরি করলে নোকের দু'খান হাত কেটে দেয়াই রেওয়াজ।'

হাঁটুর ওপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে ছেলেটা এবার অসহায়ভাবে দুই হাতের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল।

ধরাগলায় বলল, 'কাল রাত্রে আমাকে ধরিয়ে না-দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'তবু সব সত্ত্বেও তোমারে ওই স্বাধীনতা না কী তা আর পেতে হচ্চে না।'

ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা ওপরে তুলল ছেলেটা। বলল:

'কেন নয়?'

'গোটা সাইবেরিয়া পার হয়ে যাওয়া — এয়া কি খেলাকথা!'

'আমাকে শুধু রেললাইন পর্যন্ত যেতে হবে, তারপর ট্রেন ধরব গিয়ে। কাগজপত্র আমার সব ঠিকঠাক আছে। কেবল এই জঙ্গলেই যা অসুবিধে, এখানে বন্দুক ছাড়া চলা শক্ত। বন্দুকটা আমায় বিক্রি কর। করবে কি?'

'না। ফের এমন উপ্‌রোধ আমারে আর কোরো না।'

'যদি তুমি আমাকে অল্প-একটু সাহায্য কর খুড়ো, তাহলে আমি কিন্তু নতুন জীবন শুরু করতে পারি...।'

'কিন্তু তোমার ওই কাগজপত্তর জোটালে কোত্থেকে? অন্য কোনো নোকরে সাবাড় করে লিচ্চয়?'

'কাগজপত্র মানুষেই তৈরি করে থাকে।'

'তার মানে, জাল দলিল। তা, তুমি কি মনে ভাবো জাল দলিল সমেত তোমারে ওরা ধরতে লারবে?'

'তোমার দেখছি আমার জন্যে আমার নিজের মায়ের মতোই ভাবনা হচ্ছে! খালি বলে চলেছে, ওরা তোমাকে ধরবে, ওরা তোমাকে ধরবে... একেবারে তোতাপাখির মতো আউড়ে চলেছ। আমি এই বলে রাখলাম, ওরা আমাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না।'

'কিন্তু যদি তুমি মনে ভেবে থাক যে সৎভাবে কাজকম্মো করে জেবন কাটাবে, তাইলে অত বোতল-বোতল শ্যাম্পেন খাওয়ার পয়সা জোটবে কোত্থেকে?'

'ও কিছু না, কাল রাত্রে আমি মিথ্যে-মিথ্যে ধাপ্পা দিচ্ছিলাম। ওসব কথায় কান দিও না। আমি একটু মাতাল হয়েছিলাম কিনা, তাই।'

'আচ্ছা নোক বট বাপু...।' বরফের ওপর একদলা হলদে কটুগন্ধ থুথু ফেলল বুড়ো। 'তোমরা কমবয়েসীরা ইচ্ছা করলে চমৎকারভাবে জেবন কাটাতে পার। কিন্তু তোমরা হলে গে' পাগ্‌লা কুত্তার সামিল, সারা দুনিয়া চুঁড়ে বেড়াচ্চ তবু নিজেদের মনমতন জায়গা খুঁজে পাচ্চ না। এমন কী অসম্ভব খিদে পেয়েছেল যে তোমারে চুরিচামারি করতে হয়েছেল? পেট পুরে খেতে পাচ্চ কিনা, তাই মাথায় পোকা লড়ে উঠেচে, এই আর-কি। জেবনে কোনোদিন সত্যিকার ধাক্কা খাও নাই তো...।'

'তা ঠিক বলা চলে না, খুড়ো...।'

'কিন্তু এয়ার জন্যে দোষটা কার তাই বল!'

'ওকথা ছাড়ান দাও,' ছোকরা বলল। 'ব্যাপারটা কী জান?' বলে বুড়োর দিকে দুশ্চিন্তিতভাবে তাকাল। 'তোমার ঘরের লোকগুলো শিগ্‌গিরই জেগে

উঠবে আর তারা দেখবে তাদের একটা বন্দুক নেই আর সেইসঙ্গে তুমি আর আমিও নেই। এ দেখে তারা কি আমাদের সন্ধানে বেরোবে না বলে মনে কর?'

'সুয্যি না-ওঠা পর্যন্ত ওয়ারা লড়বে-চড়বে না।'

'কী করে জানলে?'

'ও আমার জানা আচে। গতকাল ওয়ারা প্রেচুর মদ টেনেচে। কুঁড়েটাও তোফা গরম আর আরামদায়ক হয়ে আচে। এমত অবস্তায় দুক্কুরের খাবার সময় পর্যন্ত শুয়ে থাকবে-নে ওয়ারা। কাজেই ওয়াদের তাড়াহুড়া নাই।'

'হুঁ...,' ছোকরার গলায় দুঃখের সুর ফুটল। 'সত্যি ভারি ফাঁপরে পড়েছি আমি।'

হঠাৎ বড়-বড় নরম ফলকের আকারে বরফ পড়তে শুরু করল। উষ্ণ আর ভারি।

'তোমার ভাগ্যিটে ভালো,' বলে নিকিতিচ আকাশের দিকে তাকাল।

'কেন?' বলে ছেলেটাও ওর দৃষ্টি-বরাবর ওপরদিকে তাকাল।

'না, মানে এই বরফ... তোমার পথের দাগ ঢেকে দেবে-নে বরফে।'

ছোকরা হাত বাড়িয়ে হাতের তোলায় বরফের ফলকগুলো ধরল। হাতে পড়ে ফলকগুলো গলে যেতে লাগল।

'শিগ্‌গিরই বসন্ত এসে পড়বে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলল ও।

নিকিতিচ এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল যেন এই অসাধারণ ধরনের লোকটির মূর্তি তার স্মৃতির পটে চিরকালের জন্যে এঁকে নিতে চাইছে। তার কল্পনার চোখে ভেসে উঠল — রাত্তিরবেলাতেও লাঠি ঠেলে-ঠেলে নিরস্ত্র ছেলেটা এগিয়ে চলেছে।

'তুমি রেতের বেলাগুলা কাটাও কেমনভাবে?'

'আগুন জেবলে তার ধারে ঘুমোই... তবে বিশেষ ঘুম হয় না অবিশ্যি।'

'গ্রীষ্মিকালে পালাতে পারলে না? তাইলে ভারি সুবিধা হোত তোমার।'

'সুবিধেমতো সময় দেখে তো ছাড়ে না ওরা। পালাতে গিয়ে খাবার-যে জোটে না সেটাই হল সবচেয়ে অসুবিধে। এক গাঁ ছেড়ে আরেক গাঁয়ে যাবার সময় পথে খিদের জ্বালায় মনে হতে থাকে যেন পেটে-পিঠে এক হয়ে আছে। তবু, এ-ও ভালো। যাই হোক, তোমার আদরযত্নের জন্যে ধন্যবাদ।' বলতে-বলতে ছোকরা উঠে দাঁড়াল। 'তোমার এখন ফিরে যাওয়া উচিত, কখন হয়তো লোকগুলো ঘুম থেকে উঠে পড়বে।'

বুড়ো তবু ইতস্তত করতে লাগল।

'মীমাংসার এট্টা উপায় আচে, বুইলে,' ধীরে-ধীরে বলতে লাগল বুড়ো। 'আমি তোমারে আমার বন্দুকটে দেব। তবে আজ রেতে দুটো-তিনটার সময় আমার গাঁয়ে যেতে হবে তোমারে...।'

'তারপর?'

'হুড়পাড় কোরো না, বলচি। গাঁয়ে পেঁাছে গাঁয়ের ধারে পেরথম যে-বাড়িখান পাবে সেখেনে কাউরে জাগিয়ে তুলে বলবে যে তুমি একখান বন্দুক পথে কুইড়ে পেয়েচ — উঁহু, সবচেয়ে জবর মতলব একখান ঠাউরনো দরকার... যাই হোক, আমার বন্দুকটে আমারে ফিরত দেয়া প্রেয়জন। আমাদের গাঁ থেকে এস্টেশন নাক-বরাবর সিধে রাস্তা — ভেস্তা বিশেক পথ। সেপথে ভয়ডর কিছু নাই। প্রেচুর লরি চলাচল করে থাকে সেপথে। লরিতে চেপে ভোর-ভোর এস্টেশনে পেঁাছে যাবে-নে। তবে খেয়াল রেখো, রাস্তাটা কিন্তু এক জায়গায় দু'খন্ড হয়ে গ্যাচে। বাঁয়ের রাস্তায় খবদ্দার যেও নি, রাস্তাটা চলে গ্যাচে জেলা-সদরমুখো। যাবে নাকের সোজা সিধে পথে।'

'খুড়ো...।'

'এক-মিনিট! আমার বন্দুকের কী হবে? যদি গাঁয়ের নোকেরে বল যে বন্দুকটে তুমি কুইড়ে পেয়েচ, তাইলে ভাবনাচিন্তায় তারা শুকিয়ে কাঠপানা হয়ে যাবে-নে, আমার লেগে তল্লাসি-দলই এট্টা পাঠিয়ে দেবে। অথচ তোমারে ওটা আমি চেরকালের মতন দিতেও চাই নে। ওটার বদলি এমনধারা বন্দুক তিনটা দিলেও নোব না,' বলে হাঁটুর-ওপর-রাখা আনকোরা নতুন শট্‌গানটা দেখিয়ে দিল বুড়ো।

ছোকরা কৃতজ্ঞ চোখে ওর দিকে তাকাল। হয়তো দু'চোখে যতখানি সম্ভব কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটিয়ে তুলতেই সচেষ্ট হল-বা।

'ধন্যবাদ, খুড়ো।'

'আমারে ধন্যবাদ দে' কী হবে? তা, বন্দুকটে আমি ফিরত পাচ্চি কীভাবে?'

ছেলেটা এবার বুড়োর দিকে কয়েক পা এগিয়ে ওর পাশে এসে বসল।

'কিছু একটা উপায় ভেবে বের করা যাক... ধর, যদি কোথাও আমি ওটা লুকিয়ে রাখি আর তারপর তুমি পরে ওটা খুঁজে নিয়ে নাও তো কেমন হয়?'

'কিন্তু নুকুবে কোন ঠেঁয়ে?'

'কোনো একটা খড়ের গাদায় — গাঁ থেকে বেশি দূরে নয় এমন কোথাও।'

প্রস্তাবটা ভালো করে ভেবে দেখল নিকিতিচ।

'কিন্তু রেতের বেলা খুঁজে পাওয়া ভারি শক্ত হবে। না-না, অন্য এট্টা

মতলব মাথায় এসেচে। গাঁয়ে ঢুকে পেরথম যে-বাড়ি পড়বে সেখেনে ধাক্কা দিয়ে নোকেরে শুধিও ইয়েফিম মাজায়েভ থাকে কোন ঠেঁয়ে। তাইলে ওয়ারা দেখিয়ে দেবে তোমারে। মাজায়েভ আমার জ্ঞাতি হয়। তাম্পর ইয়েফিমের ঘরে গিয়ে বলবে যে তাইগায় আমার সাথে তোমার দেখা হয়েছেল আর আমি ভূতৎবিদদের একটা দলরে "সাপের জলায়" পথ দেখিয়ে লিয়ে যাচ্চি। ওয়ারে বলবে, টোটা ফুইরে যাওয়ায় বন্দুকটে মিছামিছি ঘাড়ে করে বয়ে না বেইড়ে আমি সেটারে গাঁয়ে ফিরত দিয়ে যেতে কয়েচি তোমারে। বলবে, কাল বাদে পরশু আমি গাঁয়ে ফিরতে পারি। তবে আমি-যে ভূতৎবিদদেরে পথ দেখানোর কাজ করচি সেটা যেন কাউরে সে না জানায়। বলবে যে উপরি রোজগারের লেগে এয়া করচি। গাঁয়ে ফিরত এলে পর আমরা দু'জনায় চুপিচুপি কয়েক পাত্তর নেশা করব-নে। আর উপরি রোজগারের কথা জানতে পারলে আমার বৌ সব ট্যাকা কেড়ে লিবে আর সব ফক্কিকার হয়ে যাবে। আমার কথাটা বুইলে তো? এখন, এট্টা বোতল খরিদ করার মতন ট্যাকা আমারে দ্যাও দিকি। কেনে? না, ইয়েফিম তার পাওনাগন্ডা ছাড়ার পাত্তর লয় — এয়ার পর আমরা বিদেয় লিব। তোমারে আমি গোটা-ছয় টোটা দুব আর দুটা 'বাক্শট' টোটা — বলা তো যায় না যদি দরকার পড়ে। টোটা যদি কাজে না-নাগে তো গেরাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে বরফের মধ্যি ফেলে দিও। ইয়েফিমরে দিও না যেন। ভারি ধুত্তু নোক ইয়েফিম — কিছু এট্টা সন্দেহ করে বসবে। আচ্ছা, এখন যা বললাম বুইলে তো?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। খুড়ো, তোমার ঋণ আমি কখনও ভুলব না।'

'ঠিক আচে তাইলে... গেরামে যাবার পথ হল এইটে। যখন সূয্যি ওঠবে তখন পথটা পষ্ট বুইতে পারবে, তবে গোড়ায়-গোড়ায় সূয্যিরে তোমার বাঁয়ে রেখে চলবে। কের্মে যত চড়াই ভাঙবে পথ, তখনও সেটারে বাঁদিক রেখে চলতে থাকবে। কিন্তু যখন দিনের শেষে সূয্যি ডুববে তখন এট্টা পাক খেয়ে ওটারে তোমার পিছনে রেখে চলবে, ঠিক ডান কানের পিছনদিক রাখবে। আর তাম্পর নাক-বরাবর সিধে চলে যাবে। আচ্ছা, এবার যাবার আগে একবার ধোঁয়া ছেড়ে নেয়া যাক।'

অতঃপর দু'জনে পাইপ আর সিগারেট ধরিয়ে নিল।

হঠাৎ একসময় দু'জনেরই মনে হল যে বলার কথা আর কিছু নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অবশেষে দু'জনে উঠে দাঁড়াল।

'বিদায়, খুড়ো। অনেক ধন্যবাদ।'

'যাত্রা শুভ হোক।'

দুই বিভিন্ন দিকে রওনা দিল ওরা। কিন্তু নিকিতিচ হঠাৎ থেমে ছেলেটাকে ফিরে ডাকল। বলল:

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, অ্যাঁ? তুমি বাছা আরেটু হলেই ফাঁদে পড়েছেলে আর-কি। ওই-যে প্রতোকিন নোকটা — ও হল গে' মিলিশিয়ার কত্তা। গতকাল-যে সে তোমারে ঘুম থেকে তোলে নাই এয়া তোমার জবর ভাগ্যি। ওয়ার সাথে কথা কয়ে পার পেতে না তুমি। খুরের মতন ওয়ার বুদ্ধির ধার।'

জবাবে ছোকরা কিছু না-বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিকিতিচের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

'নোকটা জানতে চাইত তুমি কোথা থেকে আসচ, যাচ্চ কোন ঠেঁয়ে? তোমার ওই দলিলপত্তরে বড়-এট্টা ফায়দা হোত না।'

এ-কথায়ও ছেলেটা কোনো সাড়া দিল না।

'আচ্ছা, ঠিক আচে, যাত্রা কর তাইলে।' কাঁধের ওপর অন্য লোকের নতুন বন্দুকখানা ঝুলিয়ে নিয়ে নিকিতিচ জংলা রাস্তা ধরে নিজের কুঁড়ের দিকে রওনা দিল। রাস্তাটার প্রায় শেষ প্রান্তে পেঁাছেছে এমন সময় একটা আওয়াজ কানে এল তার, ঠিক কানের পাশেই গাছের একটা ডাল ভাঙার কানফাটানো আওয়াজের মতো ঠেকল শব্দটা। সেইসঙ্গে মাথা আর কাঁধের পেছনে কে যেন সজোরে কয়েকটা ঘুসি মারল আর সামনের দিকে ধাক্কা দিল বলে মনে হল তার। সঙ্গে সঙ্গে বরফের ওপর হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নিকিতিচ, আর তারপর কোনো কিছুই কানে গেল না, কোনো অনুভবই রইল না তার। তার গায়ের ওপর-যে ফিস্‌ফিস করে বরফ পড়তে লাগল আর কে যেন বললে, 'এই-ই ভালো হল খুড়ো, নিরাপদ হওয়া গেল,' — তা-ও তার কানে গেল না।

...যখন সূর্য উঠল ছোকরা তখন জংলা পথটা ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে। সূর্য ওর পেছনে ছিল, সূর্যের দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করল না ও। শুধু তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

ভিজে বরফ অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল মাটিতে, মৃদু ফিস্‌ফিস আওয়াজ তুলে।

রাতের তাইগা জেগে উঠছিল আস্তে-আস্তে। বসন্তের অরণ্যের ঘন, উগ্র সৌগন্ধ্য নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল ছোকরার।



কোয়েলাশ্রু

জঙ্গলের ধার ঘেঁষে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

ঘোড়ায়-টানা মালবওয়া গাড়িটা ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে গাছের গাঁটওয়ালা শিকড়ের জটে ধাক্কা খেতে-খেতে এগিয়ে চলেছিল। সামনের দুই চাকার মধ্যেকার ডান্ডাটা থেকে ধাতব ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছিল একটা।

সূর্য পশ্চিমমুখে হেলে পড়েছিল, তবু তখনও পর্যন্ত গরমের কমতি ছিল না। গুমোট গরম। ধুলো, পাইনের আঠা আর বুনো স্ট্রবেরির গন্ধে বাতাস ছিল ভারি হয়ে।

মালবওয়া গাড়িতে চেপে যাচ্ছিল দু'জন লোক। একজন পুরুষ, অপরজন মেয়ে। ওদের বয়স প্রায় একই রকম লাগছিল, অর্থাৎ তিরিশ ছুঁই-ছুঁই।

মেয়েটি বসেছিল গাড়ির সামনের দিকে, আড়াআড়ি পাতা কাঠখানার ওপর। গাড়ি চালাচ্ছিল সে। পুরুষটি শুয়ে ছিল চিত্ হয়ে মেয়েটির পেছনদিকে, গাড়ির খোলের মধ্যে একবোঝা সবুজ ঘাসের ওপর। মেঘশূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সিগারেট টানছিল সে।

কথা বলছিল না দু'জনের কেউই।

মেয়েটি বসেছিল মাথাটা অল্প-একটু ঝুঁকিয়ে আর মাঝে-মাঝে লাগামের রশির একটা প্রান্ত দিয়ে পায়ের একপাটি বুটের মাথায় আস্তে টুস্‌কি দিচ্ছিল। কিছু একটা ভাবছিল সে।

রেলস্টেশন থেকে ঘণ্টা-দুই ধরে এইভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে তারা। স্থানীয় এলাকা আর এটা-সেটা নিয়ে প্রাথমিক আলাপ শেষ হয়ে গেছে, এখন চুপ মেরে গেছে।

তামাটে-রঙের গাঁট্টাগোঁট্টা খাসি ঘোড়াটা একটানা দুল্‌কি চালে চলেছিল,

মাঝে-মাঝে ঘোঁত্‌ঘোঁত আওয়াজ তুলে আর ঝুনঝুন করে গলার কণ্ঠি বাজিয়ে।... থেকে-থেকে মেয়েটি মাথা তুলছিল আর লাগামগাছে ঝাড়া দিয়ে অলস গলায় বলছিল, 'হেট-হেট! কী, ঘুমাতে লাগলি নাকি?'

শুনে ঘোড়াটা পলকের তরে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকিয়ে বেগুনি-রঙের চোখদুটো ঘোরাচ্ছিল আর কানদুটো খাড়া করে তুলছিল। তবে চলার বেগ বাড়াচ্ছিল না। মেয়েটিও ফের মাথাটা ঝুঁকিয়ে লাগামের রশির প্রান্তটা দিয়ে বুটের মাথায় টুস্‌কি দিতে-দিতে চলল। মালগাড়িখানা ওর দিকে কাত হয়ে এলে দু'হাত দু'পাশে রেখে পেছনদিকে গাড়ির মধ্যে অল্প-একটু ঝুঁকে পড়তে লাগল মেয়েটি, আর তখন ওর ঘাড়ের কাছে শাদা ব্লাউজটা আঁটো হয়ে চেপে বসতে লাগল। পুরুষটিও সেই সময়ে মাথা ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছিল মেয়েটিকে, তার সুগঠিত ঘাড় আর কানের কাছে হালকা-বাদামি কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলি তাকিয়ে দেখছিল। তারপর ফের সিগারেট টানতে-টানতে তাকিয়ে থাকছিল আকাশের দিকে।

ওপর থেকে ঝরে পড়ছিল ভরতপাখির ঠাসবুনোন কাঁপাকাঁপা রুপোলি সুরের ঝর্না। গুমোট হাওয়া ঘাসফড়িঙ্‌গুলোর একটানা নীরস ঝিঁ-ঝিঁ আওয়াজে ভরে ছিল। কি বনে কি মাঠেঘাটে সর্বত্র বিরাজ করছিল শান্তি। সবকিছুতে ছিল শান্ত আর গুমোটজনিত নিস্তেজ ভাব।

হঠাৎ উঠে বসল লোকটি। পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে ফের আরেকটা ধরাল।

শুধোল, 'কী ভাবছেন অত?'

'কিছু না,' লাগামের রশি দিয়ে বুটের গায়ে তেমনি টুস্‌কি দিতে-দিতে মেয়েটি আস্তে জবাব দিল।

শণরঙের একগোছা চুল প্রশস্ত সুঠাম কপালের ওপর থেকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটির পাশে উঠে বসল পুরুষটি। মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে একবার ওকে দেখল। দেখা গেল, ওর চোখদুটি স্বচ্ছ, চোখের মনি ধূসর।

'দিনটা বেশ গরম দেখছি। কখনও ভাবি নি এখানেও এত গরম পড়ে। এই সাইবেরিয়াতেও।'

'তা কোনো-কোনো সময় পড়ে বৈকি,' জবাব দিল মেয়েটি।

পুরুষটি সিগারেটে জোরে টান দিল একটা।... নীল, হালকা একটুখানি ধোঁয়া ওর মাথার ওপর ঘুরপাক খেয়েই মিলিয়ে গেল।

'আপনি কি বিশেষ করে লোক নিতেই স্টেশনে আসেন?'

'না লোক নিতে-যে তা না। আমরা ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করচি, কিন্তু মহিলা তো এলেন না।' বলে মেয়েটি ফের একবার সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকাল।

পুরুষটি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল!.. আড়মোড়া ভেঙে কোমল করে বলল, 'সত্যি, কী আশ্চর্য চমৎকার জায়গাটা! কী শান্তি, কী সুখ!'

'হ্যাঁ, জায়গাটা ভালোই,' সহজভাবে কথাটায় সায় দিয়ে মেয়েটি এবার দূর মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

'তবে একটু বোধহয় একঘেয়ে ঠেকে? না কী বলেন?' পুরুষটি হাসল।

'সেটা নিভ্‌ভর করে। আমাদের কই একঘেয়ে ঠেকে না তো। একঘেয়ে ঠেকবে কেনে?'

'বলতে চান কখনও একঘেয়ে ঠেকে না?' লোকটি তখনও হাসছিল।

শুনে ঢালু কাঁধদুটি ঝাঁকাল একবার মেয়েটি।

'কই, আমার তো ঠেকে না।'

'সত্যি?'

মেয়েটি ওর দিকে তাকাল একবার, খুক করে একটু হাসল, তারপর লাগামের রশি দিয়ে ফের বুটের গায়ে টুস্‌কি দিতে লাগল।

'আচ্ছা, আপনার স্বামী আছেন?' হঠাৎ শুধিয়ে বসল লোকটি।

শুনে মেয়েটি ঘুরে তাকাল।

'না, নাই। কেনে বলেন তো?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। মনে হল, স্বামী নেই বোধহয়।'

স্বচ্ছ ধূসর চোখদুটি সরু-সরু করে তুলল মেয়েটি, চোখে ধূর্তামি ফুটল। উজ্জ্বল লালচে, কুমারীশোভন রসালো ঠোঁটদুটি অল্প-একটু ফাঁক হল আর ঠোঁটের কোনাদুটি ঝুলে পড়ল সামান্য।

'কিন্তু কেনে, বলেন তো?'

'কেন তা জানি না। এমনি মনে হল তাই বললাম। তা, আপনারা কি ভিন্ন হয়ে গেছেন?'

'ধরেন, তা-ই।'

'কিন্তু কী জন্যে?'

মেয়েটি মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। বোঝা গেল, বিষয়টা নিয়ে সে আলোচনা করতে চায় না।

বলল, 'কারণ এট্টা ছেল বৈকি।'

'হ্‌ঁ, ব্‌ঝলাম...,' কপালের ওপর থেকে চুলের গোছাটা ফের পেছনে ঠেলে দিল লোকটি। বলল, 'কখনও-কখনও অমন হয় বটে।'

কিছ্‌ক্ষণ দ্‌'জনেই চুপ করে রইল।

'আর এখন? এখন কেমন?' লোকটি ফের শ্‌ধোল।

'এখন কেমন কী?'

'মানে, সাধারণভাবে জীবন কাটছে কেমন?'

ওর দিকে না-ফিরেই ম্‌খ মচকে হাসল মেয়েটি। বলল:

'ওই একরকম।'

'ওই একরকম বললে বিশেষ কিছ্‌ই বলা হয় না,' প্‌র্‌ষটি হেসে উঠল এবার। 'ওই একরকম মানে, কিছ্‌ই বলব না।'

'পোড়া কপাল আমার!..' মাথা নেড়ে মেয়েটি সোজা ওর চোখের দিকে তাকাল।

হাসি বন্ধ হয়ে গেল লোকটির... কিছ্‌ক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা — ছেলেটি সন্ধানী চোখ মেলে আর মেয়েটি এক ধরনের লোক-দেখানে অবাক হবার ভাব করে। তারপর একসময় আচমকা দ্‌'জনেই হেসে উঠল। মেয়েটির ধ্‌সর চোখে ঝিলিক হেনে গেল।

'অত হাসির কী আছে, অ্যাঁ?.. আস্‌ন, বলে ফেল্‌ন দেখি কথাটা!.. কী, এত হাসি কী নিয়ে?' একটা আঙ্‌ল উঁচিয়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে প্‌র্‌ষটি শ্‌ধোল, আর তারপর নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

'হাসব আবার কেনে, ম্‌য়ে হাসির পোকা ঢুকল-যে।' এবার ফিরে বসে র্‌মালে চোখদ্‌টো ম্‌ছে ফেলল মেয়েটি। পরে যখন শ্‌ধোল 'কী কাজে এখেনে এয়েচেন আপনি? কোনো কিছ্‌র প্রেতিনিধি নাকি?' — তখন ওর গলাটা রীতিমতো গম্ভীর শোনাল।

অত তাড়াতাড়ি হাসির পালা চুকে গেল বলে ভারি দ্‌ঃখ বোধ হল ছেলেটার। ওর মনে হল, আরও কিছ্‌ক্ষণ হাসিটা চললে ভালোই লাগত। ম্‌খে বলল, 'আমি একজন ছবি-আঁকিয়ে। সত্যিকার জীবন থেকে ছবি আঁকতে আমার এখানে আসা। এসেছি, কিছ্‌-কিছ্‌ আঁকব বলে।'

মেয়েটি এবার ওর দিকে কৌত্‌হল নিয়ে তাকাল।

'কী হল?' ছবি-আঁকিয়ে শ্‌ধোল।

'কিছ্‌ না। এখেনে আমাদের ক্লাবেও একজন শিল্পী আচে।'

'আছে নাকি?' ক্লাবের শিল্পীটিকে নিয়ে আলোচনা করার মতো কোনো

কিছু খুঁজে পেল না ছবি-আঁকিয়ে। তাই মাথা নেড়ে বলল, 'শিল্পীর ছড়াছড়ি চারদিকে।'

'তা, আপনি কিসের ছবি আঁকেন?'

'সবকিছুর। এই ধর-না, তোমার... আপনার ছবিও আঁকতে পারি। কী, চান নাকি যে আপনার ছবি আঁকি?'

মেয়েটি হাসল।

'আমার?.. কেনে, আমার ছবি আঁকবেন কেনে? তবে আমাদের এখেনে দারুণ সোন্দর কিছু-কিছু দৃশ্য আচে। বিশেষ করে নদীর ধারে। কোনো-কোনো দিন সকালের দিকে জল আনতে যখন নদীতে যাই তখন চোখ ফিরাতে পারি নে এত সোন্দর লাগে চারদিক! কখনও-কখনও মনে নেয় — আহা, যদি আমি ছবি আঁকতে পারতাম!'

'কখনও আঁকার চেষ্টা করেছ কি?'

'ধুৎ...। আপনের নিজের একবার দৃশ্যখান দেখা উচিত। খুব ভোরের দিকে। আচ্ছা, বলেন তো, ছবি আঁকা কী শেখার জিনিস, না জন্মগত?'

'দুই-ই...। এ নিয়ে অনেক পড়াশুনো করতে হয়...।' বিষয়টা নিয়ে কথা বাড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল না ছবি-আঁকিয়ের। বলল, 'যাক গে, আমি বরং তোমার জীবনের কথাই শুনতে চাই।' গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে পাশে-পাশে হেঁটে চলল লোকটি। গাড়িতে-বসা মেয়েটির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কী? এমন স্বর্গধামে কেমন জীবন কাটাও তুমি?' বলতে-বলতে হাত দু'খানা দু'পাশে মেলে দিয়ে চারপাশ এক-নজর দেখল ও।

মেয়েটিও পাল্টা হাসল। বলল:

'ভারি খাসা জেবন কাটাই।'

গভীর একটা শ্বাস টেনে রাস্তা থেকে মাঠের দিকে দৌড়ে গিয়ে লোকটি ধুলোমাখা গোটা কয়েক রোদে-তপ্ত ফুল ডাঁটাসুদ্ধ ছিঁড়ে নিল, তারপর ফের একদৌড়ে গাড়ির নাগাল ধরে ফুলগুলো উপহার দিল মেয়েটিকে। কৃতজ্ঞভাবে হেসে মেয়েটি ফুলগুলো নিল।

বলল, 'এদেরে কয় কোয়েলাশ্রু ফুল।' সাবধানে ছোট্ট একটা ফুলের তোড়া বাঁধতে লেগে গেল সে। 'কোয়েলার নিজের কোনো বাসা নাই তো, তাই সে খালি চোখের জল ফেলে। আর যেখেনে-যেখেনে জলের ফোঁটা পড়ে সেখেনেই এট্টা করে ফুল গজায়।'

লাফিয়ে গাড়ির ওপর উঠতে-উঠতে শিল্পী শুধোল, 'তোমার ভালো লেগেছে ফুলগুলো?' গাড়িতে ওঠার সময় ওর হাতটা দৈবক্রমে মেয়েটির হাঁটুর সামনেটায় ঠেকে যাওয়ায় চট করে এক-নজর মেয়েটির দিকে তাকাল ও।...

স্কার্টটা অল্প-একটু টেনে নামিয়ে মেয়েটি তখনও তোড়া বেঁধে চলল। আর এক-মুহূর্তের জন্যে শিল্পীর মনশ্চক্ষে একটা ছবি ভেসে উঠল: শান্ত দৃঢ়তা আর সৌন্দর্যে-ভরা একটি মেয়ে করুণ হালকা-নীল ছোট-ছোট ফুলের একটি তোড়া বাঁধছে — কোয়েলাশ্রুর তোড়া। কিন্তু এরপরই একটা প্রবল আবেগের ঝাপ্‌টায় ছবিটা মুছে গেল মন থেকে। হঠাৎ দুনিয়াটাকে বড়ই তীব্রভাবে অস্থায়ী আর মরণশীল মনে হল।

'কিন্তু এই জীবনটা কী?' জোরে-জোরে বলে উঠল সে। 'এ তো শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে, ব্যস — ফুরিয়ে যাবে সবকিছু!' মেয়েটির দিকে তাকাল সে, চাইল — ও অন্তত তার কথা বুঝুক। 'আমরা যা করব বলে মনস্থ করেছি তা হয়তো করে ফেলতে পারি, অন্ততপক্ষে শেষ করার চেষ্টা করতে পারি!..' হঠাৎ কেমন সঙ্কোচ বোধ করল সে, কথাগুলো বড্ড বোকা-বোকা আর অগভীর শোনাচ্ছে। 'ধুত্তোরি, চুলোয় যাক সব!.. কী, ধরতে পারছ যা বলতে চাইছি? কাজগুলো আমরা শেষ করে ফেলি বা করাই, কিন্তু তাতে কী এসে-যায়? আর সারা জীবন নিজেদের টুঁটি টিপে রাখতে হয় আমাদের! নিজেদের বোঝাতে হয়, আমরা কত ভালো, কত...। কিন্তু এদিকে একবার তাকাও দেখি — এই বন, এই স্তেপ, এই আকাশ···। প্রচণ্ড আবেগে টন্‌টন করছে সবকিছু! আহ্, কী সৌন্দর্য! শুধু ভালোবাসতে হবে, আর এটাই হল শেষ কথা! ভালোবাসা — সে-ই সব! এছাড়া আর সবকিছুই বাজে, ব্যর্থ, অপচয়।' মনে হচ্ছিল যেন কারও সঙ্গে জোর তর্ক জুড়ে দিয়েছে সে। হাত নেড়ে-নেড়ে প্রচণ্ড তীব্রভাবে সে কথা বলছিল।... আর সারাক্ষণই চোখদুটো তার নিবদ্ধ ছিল মেয়েটির দিকে। কিসের যেন প্রতীক্ষায়।

মেয়েটি মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। বুঝতে চাইছিল সে। ওর বাহুর ওপর হাত রাখল ছেলেটি।

'আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? বুঝতে পারছ না আমার কথা?' ইতিমধ্যে ও হাত বাড়িয়ে মেয়েটির নরম কাঁধটি জড়িয়ে ধরেছিল, এখন তাকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করল।

হঠাৎ মেয়েটি ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর লোকটির দিকে অপ্রতিভ করার মতো হিমেল শান্তভাবে সরাসরি তাকাল। প্রায় মুখে

একটা ঘুসি মারার সামিল ছিল দৃষ্টিটা। বদলে-যাওয়া কর্কশ গলায় বলল:

'হ্যাঁ, বুঝেছি বৈকি।'

যেন আগুনে হাত পড়েছে এমনভাবে চমকে উঠে হাতখানা সরিয়ে নিল শিল্পী — তারপর অপ্রস্তুতের হাসি হাসল।

'ও!.. তাহলে আমাদের ধরনধারণ এমনিই!' বলে কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। তারপর রাগত গলায় বলল, 'নিজেদের ছোট-ছোট তুচ্ছ জীবন কাটিয়ে... চলে যাই আমরা এই হল গিয়ে ব্যাপার। যাক গে, চুলোয় যাক গে সব!' বলতে-বলতে চাপা রাগে ফুঁসতে লাগল সে। তারপর বাইরে ঝুলন্ত পা'দুটো গাড়ির ওপর তুলে নিয়ে ফের চিত্ হয়ে শুয়ে পড়ল আর সুগন্ধি ঘাসের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিল।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল তারা।

সামনের চাকাদুটো ক্যাঁচকোঁচ করছিল। ঘোড়াটা ঘোঁতঘোঁত করছিল থেকে-থেকে। বনের মধ্যে পাখির নানা দল নানানতরো ঐকতান জুড়ে দিয়েছিল। সূর্যের পড়ন্ত আলো ইতিমধ্যে ছেয়ে ফেলেছিল গোটা বনটা। যেন কী একটা বিশাল উজ্জ্বল বস্তু নরম পায়ে ঘাসগুলো মাড়িয়ে-মাড়িয়ে পৃথিবীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছিল।

মেয়েটি ইতিমধ্যে দু-একবার পেছন ফিরে সহযাত্রীর দিকে তাকিয়েছে। দেখেছে, সে একেবারে স্থির হয় শুয়ে আছে। তার সরু পিঠখানা থেকে খোঁচা-খোঁচা পাখনাদুটো দামি সিল্কের শার্টের তলা থেকে উঁচিয়ে আছে। আর ছোট্ট নীল একটা শিরা তির্তির করে কাঁপছে রগের কাছে।

'এখন কটা বেজেচ্চে?' মেয়েটি শুধোল।

লোকটি উঠে বসল। তারপর সামনের দিকে রাস্তা-বরাবর সোজা তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বলল:

'আমাকে... আমাকে ক্ষমা কোরো...। একটু আগে আমি যা কিছু বলেছি তা মনে করে এখন অনুতপ্ত বোধ করছি।' ভুরু কুঁচকে, গলার টাই আলগা করে দিয়ে অবশেষে সে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটিও ওকে লক্ষ্য করছিল নিবিষ্টভাবে, যেন ওর মন বোঝার চেষ্টা করছিল।

'ঠিক আচে,' বলল সে। ঠোঁটের কোণদুটো তার কিছুটা ব্যঙ্গে, আবার কিছুটা সম্পূর্ণ নির্দোষ বন্ধুত্বে-ভরা হাসিতেও কেঁপে উঠল। 'বনজঙ্গল আর মাঠঘাট মাথাটা এট্টু বেসামাল করে দেছিল, তাই-না?'

ছেলেটিও হাসল, ঈষৎ অপ্রতিভভাবে। বলল:

'ঠিক তাই। এখানকার জলহাওয়ার দর্শন সঙ্গে সঙ্গে আমায় পেয়ে বসেছিল।' মুখের ওপর একবার হাতটা বুলিয়ে নিল ও। 'মনে হচ্ছে আমি যেন কারও রুটি চুরি করে খেয়েছি।'

'এ নিয়ে অত কষ্ট পেয়েন না। আপনেরা পুরুষরা... আপনেদেরে একবার নাই দিলে...' ...

সিগারেট-কেস বের করে সিগারেট ধরিয়ে নিল শিল্পী। লম্বা-লম্বা হাতদুটো দিয়ে নিজের লম্বা রোগা ঠ্যাঙদুটো জড়িয়ে ধরে ভাবনায় ডুবে গেল। অপ্রীতিকররকম একটা ধাক্কা খাওয়া ও একটু দমে যাওয়ার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল ওর মধ্যে।

'সব! সবাই?'

'তাই নয় কি?..'

'নিশ্চয়ই সবাই নই। আচ্ছা, আর কতদূর যেতে হবে?'

'তা পেরায় দুই কিলোমিটার।'

'না, সবাই নয়... ওকথা বোলো না।'

মেয়েটি আর কিছু বলল না।

বন শেষ হল। রাস্তাটা এবার ধুধু মাঠের মধ্যে দিয়ে চলল।

সন্ধে এসে গেল নিঃশব্দ পায়ে। একটা শান্ত, বিধুর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে। সন্ধের প্রথম তিতির ডেকে উঠল।

সিগারেট টানতে-টানতে লোকটি এবার মেয়েটির মুখের কাটা-কাটা আদলটি একপাশ থেকে ঠাহর করে দেখল।

হঠাৎ সহজ সুরে বলে উঠল সে, 'ভারি ভালো মেয়ে তুমি। নাম কী তোমার?'

'নিনা।'

'নিনা, তুমি ভারি ভালো!'

'উঁ...' মেয়েটি কিন্তু ওর দিকে মুখ ফেরাল না। যেভাবে মাথা সিধে করে বসে রইল সে তাতে একাধারে লজ্জা আর সুখের ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। শান্ত একটা সুখবোধ, অল্পদিন আগেকার অবিস্মরণীয় সুখের স্মৃতি।

'আমি তোমার ছবি আঁকব।'

'কেমন ছবি?' লোকটির দিকে মুখ ফেরাল নিনা, তারপর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'এই, তোমাকে নিয়ে কোনো একটা ছবি...। ছবিটার নাম দেব "কোয়েলাশ্রু"।'

শুনে নিনা শুধু বলতে পারল, 'হায় কপাল!'

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু'জন।

'তোমার নামটা কী?' নিনা শুধোল।

'সের্গেই।'

'কোন ঠেঁয়ে ওঠবে তুমি?'

'ঠিক জানি না···।'

'আমাদের বাড়ি থাকতে পার। বাড়িতে শুধু মা আর আমি। অনেকগুলো ঘর আচে আমাদের। আদ্ধেক বাড়িখান খালিই পড়ে থাকে। আমাদের বাড়ি নদীর পাড়ে।...'

সঙ্গে সঙ্গে এ-কথার উত্তর দিল না সের্গেই। পরে বলল:

'শোনো··· তুমি রাগ কর নি তো?'

'ওকথা থাক। তুমি-যে লজ্জা পেয়েচ এই-ই যথেষ্ট।' হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে লাগামের রশি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে কায়দাদুরস্তভাবে চাবুক হাঁকড়াল নিনা। মালবওয়া গাড়ি লাফিয়ে-লাফিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে ছুটল।

'নিনা!' শিল্পী ওকে এবার নাম ধরে ডাকল।

'কী...,' নিনা যেন মাথা না-ঘোরাতে বদ্ধপরিকর।

'তুমি রাগ করেছ?'

'আরে, ছাড়ান দাও-না ওকথা...। পুরুষমানুষের সবার 'পরে রাগ করা — সে এক মস্ত ঝামেলা। ও নিয়ে আর কথা বাইড়ো না। ওই যে — আমাদের বোরিয়োজভ্কা গাঁ দেখা যাচ্চে।'

গ্রামখানা দেখা যাচ্ছিল সামনে। সূর্যাস্তের আলোয় রাঙা হয়ে ঝলমল করছিল বাড়ির ছাদগুলো। পাক-ধরা ফসলের সদ্য-সোনারঙের সাগরে সেগুলো যেন ধ্বকধ্বক করে জ্বলছিল।

'তুমি এমন একখান সাঁঝবেলার ছবি আঁকতে পারবে?' নিনা শুধোল। 'দেখেচ কেমন আহামরি রূপ!'

'সত্যি,' আস্তে-আস্তে বলল শিল্পী। একটুক্ষণ থামল, তারপর ফের বলল, 'সত্যিই আহামরি রূপ।'

আর বাস্তবিক সন্ধেটা ছিল তা-ই।



ঘোড়া দৌড়য় দ্যাখো

দ্যাখো দ্যাখো ওই ঘোড়া দৌড়য়,
ঘোড়া দৌড়য় চারিধার,
খুরগুলো যত দাপায়, কাঁপায়
সূর্যাস্তের উদ্ভাস।
কোনদিকে ওরা দ্রুত ধেয়ে যায়?
কার-যে জীবন পা দিয়ে মাড়ায়
পিষে দেয় ভুঁয়ে বারবার?
আমি বলি: সে কি নয় কো আমারই, হে আকাশ?

ঘোড়ারা এখন ক্লান্ত,
খেলা ভুলে আছে তারা।
ওরা রয়ে যাবে শান্ত,
যত ডাকো, দাও তাড়া।
আর রাঙাপটে আঁকা আইকন যেন
সম্মুখে রবে ঘুমন্ত হ্রদ হেন।

অভিনেতা হবার জন্যে মস্কোয় প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল মিন্‌কা।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মের গোড়ার দিক। মিন্‌কা সেদিন প্রথমবার অভিনয়ের পরীক্ষা দিয়েছে।

পায়ে হেঁটে হস্টেলে ফেরার পথে সে সারাদিনের নানা ঘটনার জাবর কাটতে-কাটতে আসছিল। সেদিন সে বেশ ভালো পরীক্ষা দিয়েছিল, বলা যায় চমৎকার পরীক্ষা দিয়েছিল, তাই নিজেকে বিশ্ববিজয়ী বলে ঠেকছিল তার। ভাবছিল, তার সামনে এবার দারুণ উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের পথ খোলা। প্রচণ্ড প্রতিভার অধিকারী বলে নিজেকে তার মনে হচ্ছিল।

'এই গ্রীষ্মের মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে গোটা বিশেক বই পড়ে ফেলতে হবে আমাকে,' মিন্‌কা ভাবল। 'ধ্রুপদী শিল্পের ব্যাপারে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে হবে, যৌথখামারের জীবন নিয়ে নাটকও লিখে ফেলতে হবে একখানা (অবিশ্যি এটা শুধু আমার নিজের জন্যেই), তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল হয়!'

হস্টেলে পেণছে মিন্‌কা দেখল ওর বাবা কন্‌দ্রাত্‌ লিউতায়েভ ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কন্‌দ্রাত্‌ কোনো একটা স্বাস্থ্যনিবাসে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। এখন বাড়ি ফেরার পথে মস্কোয় থেমে ছেলেকে একবার দেখতে এসেছেন। মিন্‌কা দেখল তার বিছানায় বসে মিহি পশমি স্যুটপরা প্রকাণ্ড আর রোদেপোড়া চেহারার মানুষটা — তার বাবা — অপেক্ষা করছেন তার জন্যে। সময় কাটানোর জন্যে বিদেশী একখানা সচিত্র পত্রিকার পাতা উল্‌টোচ্ছিলেন তিনি। তামাকের ছোপধরা মোটা একটা আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে মসৃণ পাতলা পাতা-গুলো তিনি উল্‌টে চলেছিলেন।

গত প্রায় সাত বছর ধরে কন্‌দ্রাত্‌ লিউতায়েভ আল্‌তাইয়ের স্তেপভূমিতে একটা যৌথখামারের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে আসছেন। নিজের কাজ তিনি বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই নিষ্পন্ন করে আসছেন, প্রশংসাও পেয়েছেন তার জন্যে, আর একারণে ভেতরে-ভেতরে তাঁর গর্বও আছে প্রচুর। গত বছর মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ শেষ করে মিন্‌কা যখন বলা-নেই-কওয়া-নেই একেবারে হুড়ুম করে ঘোষণা করল যে অভিনেতা হওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণ নিতে সে এবার অন্যত্র যাবে, তখন বাপ-ছেলেতে ধুম-ধড়াক্কা ঝগড়া বেধে গেল। ছেলের মতিগতি তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, যদিও আন্তরিকভাবে বোঝার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না তাঁর। চায়ের কেট্‌লির সাইজের থাবা দিয়ে নিজের বুকে দুমদুম করে কিল মেরে-মেরে কন্‌দ্রাত্‌ গাঁকগাঁক করে চেঁচাতে লাগলেন, 'আমারে আগে শুধোলি না কেনে তুই! কেনে আমারে শুধোলি না আগে! বয়েসকালে অমন গণ্ডা-গণ্ডা অ্যাক্টর দেখিচি, বুইলি! নড়াইয়ের সময় প্রেতি হপ্তায় নিয়ম করে ওয়ারা আমাদিগের কাছে ফ্রন্টে আসত। পেত্যেকটা নোক পাঁড় মাতাল একবারে! মেয়েগুলা পর্যন্ত! আর দেমাক কী তাদের — একবারে দ্যাখ্‌ রে জগৎবাসী ভাব!' তবু মিন্‌কা সেদিন নিজের জিদ ছাড়ল না, তাই শেষপর্যন্ত বাপ-ছেলের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল।

বাবাকে দেখে তাই মিন্‌কা এখন কিছুটা আশ্চর্যই হল।

ছেলেকে দেখে মুখ মচকে বিকৃতভাবে একটু হেসে কন্‌দ্রাত্‌ হাতের পত্রিকাখানা একপাশে সরিয়ে রাখলেন।

করমর্দন করল দু'জনে। দু'জনেই কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল।

'কী, পড়ানেখা চলচে কেমন তোর?' কন্‌দ্রাত্‌ শুধোলেন।

'ভালোই।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর:

'এখেনে কি এক-আধটুক মদ খাওয়া চলে?' ঘরের অপর ছাত্রটির দিকে ঘুরে তাকিয়ে কন্‌দ্রাত্‌ শুধোলেন।

ছাত্রটি নিজের মতো করে কথাটা বুঝল। বলল:

'কিছু পয়সা আমরা যোগাড় করে ফেলব'খন... আসচে কাল আমাদের স্টাইপেন্ড পাওয়ার দিন।'

শুনে কন্‌দ্রাত্‌ সত্যিই লাল হয়ে উঠলেন।

'আরে না-না, তাই কি হয়! পাগল নাকি? আমি মোট্টেও তা মনে করে কথাটা বলি নাই! আমি বলতে চাই, আমরা যদি এঘরে বসে দু-এক পাত্তর খাই তাইলে তোমরা ঝামেলায় পড়বে না তো?'

'এখেনে মদ খাওয়ার সত্যিই নিয়ম নেই,' মিন্‌কা বলল। তারপর হাসল একটু। বাবাকে এরকম অপ্রস্তুত হতে আর এমন কায়দাদুরস্ত পোশাক পরতে দেখে ওর ভারি মজা লাগছিল। বলল, 'তবে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে খাওয়া চলে।'

'তাইলে চল্‌ বেরুনো যাক!' উঠে দাঁড়ালেন কন্‌দ্রাত। 'পরে বললেই চলবে যে আজ এট্টা বিশেষ ব্যাপার ছেল।'

অতঃপর দু'জনে কেনাকাটা করতে বেরুল।

মনে হল কন্‌দ্রাত্‌কে কিসে যেন কামড়াচ্ছে। দরাজ হাতে বাজার করতে লাগলেন তিনি। দামি স্যাসেজ, ব্র্যান্ডি, টিনের সামুদ্রিক মাত্র, কত কী — মোট প্রায় রুব্‌ল চল্লিশেকের মতো খাবারদাবার। মিন্‌কা যখন এত খরচ করা থেকে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল, তিনি তখন একটু চটেই উঠলেন। বললেন, 'ঠিক আচে, ঠিক আচে, এয়া তোর মাথা ঘামানোর ব্যাপার না।'

কিন্তু দোকান সেরে ফেরার পথে দেখা গেল দু'পক্ষের প্রাথমিক অস্বস্তির ভাবটা খানিকটা কেটে গেছে আর দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। কন্‌দ্রাত্‌ তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মাতব্বরি ঢঙে কথাবলার ভঙ্গিটা ফিরে পেয়েছেন। তিনি বলছিলেন:

'অ্যাক্টর-মশাই, আপনে যখন নামকরা নোক হবেন তখন আমাদেরে যেন ভুলে যেয়েন না... তবে ভুলে তো যাবিই, তাই-না?'

'কী যে যা-তা বল তার ঠিক নেই! কাদের ভুলব? তোমাদের?'

'আচ্ছা, ছাড়ান দে... অবিশ্যি একমাত্তর তুই-ই যে এমনধারা হবি, তা নয়। তবে আগে তোরে তো মান্যিগন্যি হতে নাগবে, তাই-না ?'

'তা তো বটেই।'

মিন্‌কার আরো একটি বন্ধু ঘরে এল। এরপর মদ্যপান চলল।

কন্‌দ্রাতের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, গায়ের পশ্‌মি জ্যাকেটখানা খুলে ফেললেন তিনি। আর তাঁর কাঁধ-যে কতখানি চওড়া আর বলিষ্ঠ তা বোঝা গেল সঙ্গে সঙ্গে — পাত্‌লা শার্টের নিচে প্রকাণ্ড, নিথর পেশীবহুল দেহখানা স্পষ্ট ফুটে উঠল।

'খুব কষ্টে দিন কাটাতে হচ্চে?' অন্য দুটি ছেলেকে শুধোলেন তিনি।

'না, তেমন কষ্ট কিছু না...'

'কষ্ট লয়, বলচ তোমরা?.. কিন্তু ইচ্ছা হলে তো একপাত্তর মদও খেতে লারবে এখেনে। এরে কি জেবন কয় নাকি? হয়তো তোমাদের ইচ্ছা হল মেয়ে-বন্ধু লিয়ে এট্টু ঘুরেফিরে বেড়াবে, তো তার উপায় কই, এতসব বইপত্তর পড়তে নাগবে রোজ-রোজ। না কী বল, অ্যাঁ?'

ছেলেরা হেসে উঠল। ব্র্যান্ডি পেটে পড়ায় সকলেরই দিল্‌ খুশ হয়ে উঠেছিল। বাবা ঝগড়া মিটিয়ে নেয়ার জন্যে এত ব্যস্ত দেখে মিন্‌কাও খুশি। হয়তো স্বাস্থ্যনিবাসে কেউ ওঁকে বুঝিয়েছে যে সব অভিনেতাই কিছু মাতাল হয় না। আর ওঁর যেমন ধারণা অভিনয় করাটা তেমন নয়, সময় নষ্ট করার ব্যাপার নয় মোটেই। কে জানে!

'মনে লিচ্চে, এখেনকার ব্যাপারস্যাপার ঠিকই আচে!' কন্‌দ্রাতের গলা আবার গমগম করে উঠল। 'এখেনে পড়ানেখার লেগে এয়েচ যখন, তখন পড়ানেখা কর। মেয়ের খোঁজ পরে করলেও চলবে। তাছাড়া মদ খাওয়া শুরু করার পক্ষিও তোমরা খুবই বাচ্চা — নাকের পোঁটাঝরা নেহাত বাচ্চা... গত বছর মিন্‌কা জানাল, সে অ্যাক্টো করা শেখবে। শুনে আমি তো গেলাম ভড়কে... তা এখন আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্চি, বুইলি মিন্‌কা। পড়ানেখা চাইলে যা তুই। আর পড়ানেখার পাট চুকলে কাজ পেতে যদি তোমাদের কাউর অসুবিধা হয় তো সোজা আমার খামারে চলে এসো। ক্লাবে কাজ জুটিয়ে দুব-নে এট্টা। আমার ক্লাব-যে কেমন তা মিন্‌কা জানে —

রীতিমতন এলাহি ব্যাপার। মস্কোর বসে-বসে জুতার সুকতলা ক্ষওয়ানোর থেকে অনেক ভালো কাজ জোটবে ওখেনে...'

'বাবা...'

'কী, বেঠিক কিছু বললাম নাকি? ঠিক আচে, ঠিক আচে, কিছু মনে কোরো না... তোমরা আবার পড়ানেখা-করা নোক, ভুলেই গেছিলাম তা। তবে আমার খামার, দেখবার মতন একখান খামার বটে। মিন্‌কা জানে সব।'

এরপর মিন্‌কার সঙ্গে কন্‌দ্রাত্‌ 'জাতীয় অর্থনৈতিক সাফল্য-বিষয়ক প্রদর্শনী' দেখতে গেলেন।

যেতে-যেতে সেদিনের পরীক্ষায় ভালো ফল করার কথা মনে পড়ে গেল মিন্‌কার। পরীক্ষার অমন ফল, তারপর বাপের সঙ্গে মিটমাট — নিজের ওপর দ্বিগুণ খুশি হয়ে উঠল সে।

অল্প-একটু টলতে-টলতে সে মাতব্বরি ঢঙে বলতে শুরু করল, 'এই ধর তুমি। তুমি একজন মানুষ, কেমন তো। এখন ধর, কেউ আমাকে বলল যে তোমার চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে হবে। অথচ তুমি আর আমি — আমরা দু'জন আলাদা চরিত্রের, আলাদা লোক। কথাটা বুঝলে আমার?'

কিছুমাত্র না-টলে সোজা হেঁটে চলেছিলেন কন্‌দ্রাত্‌। বললেন, 'বুয়েচি। যে-কোনো আহাম্মকেই বুইতে পারে কথাটা।'

'কাজেই আমাকে কী করতে হবে তখন? না, তোমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে — তোমার চরিত্র, তোমার ধরনধারণ, তোমার হাঁটার ভঙ্গি... অর্থাৎ, যাকে বলে, তোমার সবরকম মুদ্রাদোষই।'

'তা, তুই সবকিছু জানিস না নাকি?'

'আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা নমুনা দেখাই।'

'ঠিক আচে। আচ্ছা, আমার হাঁটাটা নকল কর্‌ দিনি,' কন্‌দ্রাত্‌ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

'ও তো কিছুই না!' মিন্‌কা বলে উঠল। 'ওর চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু আছে নাকি?' একটু এগিয়ে গিয়ে বাপের হাঁটার ধরন নকল করতে লাগল সে। দুই পকেটে হাতদুটো ঢুকিয়ে, মাটিতে শক্ত করে পা-দুটো চেপে, দু'পাশে অল্প-একটু হেলেদুলে সে হাঁটতে লাগল।

দেখে কন্‌দ্রাত্‌ কান-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

গাঁক-গাঁক করে বললেন, 'দেখালি বটে একবার!'

আশপাশের পথচলতি লোক ওদের দিকে তাকাতে লাগল।

'ঠিক আমার মতন, তাই-না ভাই?' কন্‌দ্রাত্‌ তাদের ডেকে-ডেকে বলতে লাগলেন। 'আমার চলার ভঙ্গি দেখাচ্চে ব্যাটা।'

বাপের কান্ড দেখে মিন্‌কা লজ্জা পাচ্ছিল।

এবার কন্‌দ্রাত্‌ আন্তরিকভাবে বললেন, 'ভালো, ভালো! চেষ্টা চাইলে যা। তোর হচ্চে, হবে।'

'ও তো কিছুই না! আসল ব্যাপারই নয় ওটা।' ভারি খুশি হয়ে উঠেছে এখন মিন্‌কা। 'আসল ব্যাপার হল চরিত্র, আত্মা, এইসব ফুটিয়ে তোলা... এক্ষুনি আমি যা দেখালাম এ তো নিছক নকলনবিসি। এর জন্যে ইন্‌স্টিটিউটে ধমক খাই আমরা।'

'কেনে? কেনে?'

'কারণ এটা শিল্প নয়। শিল্প হল... আচ্ছা, ধর, আমি তোমার ভূমিকায় অভিনয় করছি।'

'আচ্ছা?'

'এমনভাবে কাজটা করতে হবে আমাকে যাতে শেষপর্যন্ত যে-চরিত্র আমি ফুটিয়ে তুলব তা হবে একই সঙ্গে তোমার আবার আমার চরিত্রও। বুঝলে তো? এটা করতে পারলে তবেই আমি শিল্পী।'

হঠাৎ কন্‌দ্রাত্‌ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, 'এখন আমরা গিয়ে এট্টা ঘোড়ারে পরীক্ষে করে দেখব। শুনেচি এখেনে ওরা এট্টা আদর্শ মদ্দা ঘোড়ারে দেখাবার জন্যে রেখেচে। তা, দেখা যাক, চল্‌।' চটেমটে মাটিতে একদলা থুথু ফেললেন তিনি। মাথা নেড়ে বললেন, 'আমাদের বুইয়ানরে মনে আচে তোর?'

'আছে বৈকি।'

'এই কয়দিন আগে এট্টা কমিশন আমাদের ওখেনে গেছিল বুইয়ানরে পরীক্ষে করে দেখতে — আমি ওরে প্রদর্শনীতে পাঠাতে চেয়েছেলাম। তা, ওয়ারা নাকচ করে দিল ওরে, পরগাছার মরণ যতসব! আর এখন এখেনে এসে কী দেখচি? না, ওয়াদের আদর্শ নমুনার ছিরি হচ্চে এই... দেখলে গা-বমি দেয়। এই নাকি আদর্শ মদ্দা ঘোড়া, চক্ষের মাথা খেয়েচে ব্যাটারা! আমার বুইয়ানের তুলনায় এটা তো নেঙটি-ইঁদুর একবারে। হাতের এক ঘুসিতে আমি এটারে কাত করে দিতে পারি, ভারি আমার আদর্শ ঘোড়া রে!'

গাম্ভারি চালচলনওয়ালা খামারের কালোরঙের মদ্দা ঘোড়াটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল মিন্‌কার, আর ওর কথা ভেবে মনখারাপ-করা মিষ্টি

একটা ব্যথায় টনটন করে উঠল বুকটা। আধা-বুনো সৌন্দর্যে-ভরা ঘোড়াটাকে যেন ও দেখতে পেল, ঘোড়ার পালের সঙ্গে স্তেপের প্রান্তরে দূরে বহুদূরে ছুটে চলেছে আর তার জটপাকানো কেশর হাওয়ায় উড়ছে ফুরফুর করে। অর্ধেক আকাশটা তখন খড়ের গাদার মতো দাউদাউ করে জ্বলছে যেন আর সেই আকাশের পটে দ্রুত ধাবমান কালো-কালো ছায়া সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, মাটিতে খুরের দাপানির এতটুকু শব্দ না-তুলে, চক্রাকারে ঘুরে চলেছে তো চলেছেই।

'নিশ্চয়, বুইয়ানকে মনে পড়ে বৈকি,' আস্তে-আস্তে বলল মিন্‌কা। 'ভারি চমৎকার ঘোড়া বুইয়ান।'

কন্‌দ্রাত্‌ চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। নীল চোখদুটো যেন ধ্বকধ্বক করে জ্বলছিল।

অবশেষে বললেন, 'ইদানীং আমিই ওটার দেখাশোনা করছিলাম। ওয়ার আস্তাবলে আমি এট্টা পাতাবাহারের গাছও রেখে দিছিলাম — দেখতে একসম বাসরঘরপানা নাগচে এখন আস্তাবলটা। নিজের সন্তানের মতন আমি ওয়ার স্বভাব-চরিত্তির বুঝে নিইচি। এক-মাইল দূরে সে চিঁহি ডাক ছাড়লে শুনতে পাই আমি। আর ওয়ারা বলল কিনা ভালো লয় ঘোড়াটা!..' বলতে-বলতে কন্‌দ্রাতের গলা ধরে গেল। বোঝা গেল, মনে বিষম ঘা খেয়েছেন তিনি।

মিন্‌কাও চুপ করে ছিল। অভিনয়-শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে কিংবা অভিনেতার পেশার মাহাত্ম্য নিয়ে ভাবতে আর তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। ফের বাড়ি ফেরার, স্তেপের সেই সোমরাজ-পাতার গন্ধে-ভরা বাতাসে আর-একবার নিশ্বাস নেয়ার, পাহাড়ের কানায় উত্তপ্ত পাথরের ওপর বসে চুপচাপ চিন্তা করার আকুল একটা আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসেছিল তাকে। আর ফের একবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবিটা — স্তেপের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একপাল ঘোড়া আর বুইয়ান দৌড়ুচ্ছে তাদের সামনে-সামনে, ওর অপরূপ ঘাড়টা গ্রাম্ভারি চালে বাঁকানো, আর স্তেপের গোটা প্রান্তর আশ্চর্যরকম চুপচাপ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ও বলে উঠল।

'গোটা তল্লাটের নোক আসে বুইয়ানরে দেখতে...'

'কী আর লাভ হল তাতে...'

প্রদর্শনীর আদর্শ মন্দা ঘোড়াটা নিচু একটা বেড়ার ওধারে আর আদর্শ আস্তাবলের খোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। আর থেকে-থেকে দর্শকদের দিকে একটা চোখের নরম বেগুনিরঙের মনিটা পাকাচ্ছিল, সতর্কভাবে ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকাচ্ছিল আর চেপটে-চেপটে রাখছিল কানদুটো।

বেড়ার কাছে এসে থামল ওরা।

‘এইটেই ঘোড়াটা, তাই-না?’

‘হ্যাঁ,’ বলে কন্‌দ্রাত্‌ এমনভাবে ঘোড়াটার দিকে তাকালেন যেন খুব খারাপ একটা লোক যার বদ মতলব ভালোরকম জানা আছে তার দিকে তাকাচ্ছেন, ‘এয়াই সেইটে।’

‘অর্‌লভের জাত।’

‘ধরাধরির ব্যাপার আর-কি। কায়দা করে পেঠিয়ে দেছে এখেনে।’

‘কিন্তু ঘোড়াটা তো সুন্দর।’

‘হ্যাঃ, “সোন্দর”,’ ছেলেকে ভেঙিয়ে উঠলেন কন্‌দ্রাত্‌। ‘তুই বরং নোকের চলাফেরা ঠাহর করে দ্যাখ্‌। আর তো কিছু বুঝিস নে।’

‘ওকথা বলছ কেন?’ মিন্‌কা বিরক্ত হয়ে বলল।

‘ওয়ার পিঠে চেপে আগে পঞ্চাশ ভের্স্তা দাবড়ে আয়, তাম্পর বলিস কেমন সোন্দরপানা ঘোড়া ওটা।’

‘কিন্তু ঘোড়াটা সুন্দর নয় তা বলতে পার না।’

‘দেখতে লালুপানা বলেই জায়গা পেয়েচে এখেনে। এই হল গে আমাদের বিচার। সব্বদাই দেখি এমনধারা কান্ডকারখানা... অবিশ্যি ঘোড়ার ব্যাপার কিছু না জানলে এটারে ভালো নাগবে বৈকি, দিব্যি ভালো নাগবে। দাঁড়া দেখাচ্চি!’ নিচু বেড়াটা ডিঙিয়ে ঘোড়ার কাছে এবার এগিয়ে গেলেন কন্‌দ্রাত্‌। এই অনধিকারচর্চায় ঘোড়াটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে ওঁকে ঠাহর করে দেখতে লাগল, পা-ও ঠুকল একবার। ‘চুঃ-চুঃ!’ তীব্র গলায় বললেন কন্‌দ্রাত্‌। ‘দ্যাখ্‌ দিনি — এরে কি বুকের ছাতি কয়? ছাতি লয় — এ তো পায়রার বুক। বিশ ভের্স্তা পথ দাবড়ানোর পরই ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাতে থাকবে কেষ্টর জীবটা...’

নীল আঙ্‌রাখা-গায়ে এক কর্মচারি এমন সময় ওঁর কাছে এগিয়ে এল।

‘এখেনে আপনার কী দরকার মশাই?’

‘এই, আপনের ঘোড়াটার এট্টু তারিফ করচি আর-কি।’

‘ওসব তারিফ-টারিফ বেড়ার ওধার থেকে করুন গে। খুপরি ছেড়ে বাইরে যান দিকি।’

‘যদি ভালো করে যাচাই করে দেখতে চাই, তাইলে?’

‘আপনেরে আগেই কয়েচি: খুপরি ছেড়ে বাইরে যান। সাধারণের এখেনে ঢোকা নিষেধ।’

ছেলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কন্‌দ্রাত্‌ এবার বেড়া ডিঙিয়ে চলে এলেন। বললেন:

'দেখ্‌লি তো? ওয়ারা সব্বদা তোরে দূরে-দূরে রাখবে। নইলে অভিজ্ঞ নোকে এক-লহমায় ঘোড়ার কের্‌দানি ধরে ফেলবে-যে। আচ্ছা তুখোড় নোকসব, কী বলিস?'

কিন্তু কর্মচারিটি ওঁর এ-কথার তাৎপর্য ধরতে পারল বলে মনে হল না।

প্রায় চলে আসছিলেন ওখান থেকে এমন সময় কী মনে হওয়ায় হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বেশ গম্ভীরভাবে কন্‌দ্রাত্‌ কর্মচারিটিকে শুধোলেন, 'আচ্ছা, এট্টা কথা শুধোতে পারি আপনেরে?'

'নিশ্চয়,' বলে কর্মচারিটি বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় কাত করে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, এই যে ঘোড়া —এটা কী বলেন তো? মাদী, না মদ্দা?'

প্রশ্ন শুনে পেট চেপে ধরে হো-হো করে হেসে উঠল লোকটি। মনে হল, এমন প্রাণখোলা হাসি ও যেন বহুদিন হাসে নি।

আর বিষণ্নভাবে ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কন্‌দ্রাত্‌।

'ও, তা-ই বলুন, তাইজন্যে... হা-হা-হা!.. ওমা, আমি কোথায় যাব! তাইজন্যে আপনি খুপরিতে ঢুকেছেলেন বুঝি? মাদী না মদ্দা তাই ঠাহর করতে? হা-হা-হা!..'

'দেখবেন আবার, হাসির চোটে পেট না-ফাটে,' কন্‌দ্রাত্‌ বললেন।

কর্মচারিটি চোখ মুছল। বলল:

'ওটা মদ্দা ঘোড়া গো, মদ্দা ঘোড়া, বুঝলেন কমরেড।'

'ঠিক বলচেন?'

'ঠিক বলচি মানে?'

'মানে — ওয়া যে মদ্দা ঘোড়া তা আপনে ঠিক জানেন?'

'নিশ্চয়ই, জানি বৈকি।'

'ওয়া যদি মদ্দা ঘোড়া হয় তাইলে আমি সোন্দরী ভাসিলিসা।'

'তার মানে?'

'তার মানে এয়া মদ্দা ঘোড়া লয়, মদ্দা গাধা।'

কর্মচারিটি এবার চটে উঠল। বলল:

'কাল রাত্তিরে নিশ্চয়ই মদ গেলা হয়েচে আচ্ছা করে। যান, বাড়ি যান, গিয়ে নেশা কাটান।'

'বরং আপনে গিয়ে নেশা কাটান। আর নয়তো আপনের ওই পেয়ারের

মন্দা ঘোড়ায় চেপে ঘুরে আসেন খানিক। ঘোড়াটা খালি আপনেরে শুঁড়ির দোকানে-দোকানে লিয়ে ঘোরার যুগ্যি, আর কোনো কম্মের না।'

শেষের এই মন্তব্যে লোকটি সাংঘাতিক চটে গেল। বলল:

'এখুনি চলে যান এখেন থেকে! বেরিয়ে যান বলচি! নইলে আমি মিলিশিয়া ডাকব।' কন্‌দ্রাতের হাতে ধাক্কা দিল লোকটি।

আস্তাবল থেকে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এলেন কন্‌দ্রাত্‌। মিন্‌কাও বেরিয়ে এল পিছু-পিছু।

'মন্দা ঘোড়া বটে একখান, কী বলিস?' একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে-জোরে টানতে লাগলেন কন্‌দ্রাত্‌। 'গাঁয়ে ফিরে আমি আগে গিয়ে কমিশনের নোকজনারে পাকড়াব... আচ্ছা করে তুলোধুনা করব ওদেরে। তুই এক কাজ করিস, বুইলি, এই মন্দাটার সব মাপজোক-খোঁজখবর একখান কাগজে টুকে লিয়ে আমারে চিঠি নিখে জানাস দিকি। তাম্পর আমি ওদেরে মজাখান টের পেইয়ে দেব-নে, কমিশনের সভ্য বাবু-সায়েবদেরে যতসব শয়তানের গুষ্টি!'

মিন্‌কাও সিগারেট ধরিয়েছিল। সে এবার শুধোল:

'তুমি এখন চললে কোথায়?'

'এস্টেশন। রাত সওয়া লটায় আমার টেরেন।'

বাড়ির জন্যে মিন্‌কার মনটা হঠাৎ ভারি অস্থির হয়ে উঠল। এইমাত্র সে অনুভব করল ফের বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কতখানি ভালো লেগেছে তার, বাবার সঙ্গ কতখানি আনন্দে-ভরা, কতখানি সহজ-সরল।

শুধোল, 'দেশগাঁয়ের খবর কী?'

'মন্দ লয়। দিব্যি আচি আমরা। খালি তোর মা তোর লেগে উতলা হয়। একদিন দুপুর রাতে সে তো বিছনা ছেড়ে নাফ দিয়েই ওঠল — তার মনে লিচ্ছিল কে যেন তারে জানলা দিয়ে ডাকচে। শুনে আমি বাইরি বেরুলাম, তা দেখি কেউ কোথাও নাই। তোর অভাবে ওয়ার অমনটা হল আর-কি — খালি নানান রকম আগড়ম-বাগড়ম চিন্তা করে।'

মিন্‌কা ভুরু কোঁচকাল।

'কেন-যে মা অমন করছে!'

'তা, আমাদের বয়েস বাড়চে তো না কী, আগের মতন জোয়ান তো আর লই... আর বলে কিনা, "কেন-যে মা অমন করে"। হুঁঃ!'

'গাঁয়ের আর সব খবর কী?'

'মানে? কোন খবর?'

‘আগের থেকে কোনোকিছু বদলেছে কি?’

‘না, একই রকম আচে। এ-বছর আমরা জমিনে বীজ বুনেচি তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, নোনা জলার ওপারে যে-জমিটে ছেল তার কথা মনে আচে তোর? সেই-যে, আমরা যেখেনে প্রেতি বছর বাজরা বোনতাম...?’

‘হ্যাঁ, মনে আছে।’

‘সে-জমিটেয় আমি ফলের বাগান দিইচি। জানি নে, ভালোরকম হবে কিনা। গাঁয়ের প্রবীণ নোকে বলচে তো যে কাজটা নাকি ঠিক হয় নাই।’

আর-যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে তা ভেবে পেল না মিন্‌কা। গাঁয়ের ছেলেছোকরারা এখনও আগের মতো প্রতিদিন সন্ধেবেলা অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিনা তা তো আর শুধনো চলে না। তাহলে সেটা কেমন ছ্যাবলামির মতো শোনাবে। তাছাড়া ওকথা জিজ্ঞেস করারও কোনো মানে হয় না — কেননা নিশ্চয়ই এখনও তারা অ্যাকর্ডিয়ন বাজায়। আহ্, এসব কত দূর, কত দূরের ব্যাপার। বাবা এখন ফিরে যাবে সেখানে, যেখানে তার মা আছে আর আছে তার ছেলেবেলার বন্ধুরা...

‘দিন-তিনেকের মধ্যেই তুমি বাড়ি পেঁাছে যাবে।’

‘কেনে, তুই গ্রীষ্মির ছুটিতে বাড়ি আসবি নে?’

‘ঠিক জানি না। একদল ছাত্রছাত্রীকে এক-আধটুকু তালিম দেয়ার ভার আছে আমার ওপর... জানি না হয়তো যেতেও পারি।’

‘আসচে বছর সে এখেনে আসচে,’ জোরগলায় কন্‌দ্রাত্‌ জানালেন। ‘যাতে আসে তার বেবস্তা করতে নাগবে আমারে।’

‘কে আসছে?’

‘বুইয়ান। কেমন করে ওরে আমরা টেরেনে করে এখেনে লিয়ে আসব সে-সব ভেবেচিন্তে রেখেচি। যতখানি সামলাতে পারে তার চেয়ে এবারে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেচে শয়তানগুলা। ওয়ারা যাতে নিজেরাই নাকচ হয়ে যায় আমারে সেই বেবস্তা করতে নাগবে।’

‘বাড়ি ফিরে যেতে তোমার খুব ভালো লাগছে, তাই-না? রাতগুলো তো এখন খুব মিষ্টি, কী বল?’

‘কী, এখেনে থেকে বাড়ির লেগে মনটা খুব হেদাচ্চে বুঝি?’

‘না-না, তা নয়। এখানেও আমার বেশ ভালো লাগে। যেমন ধর, এখানকার গোর্কি পার্কে গেলে যত ইচ্ছে খেলাধুলো, মজা করতে পার।’

‘মস্কো! যতই যাই হোক মস্কো বলে কথা। দেশের রাজধানী তো বটে,’

অন্যমনস্কভাবে বললেন কন্‌দ্রাত্‌। তারপর শুধোলেন, 'এখেন থেকে এস্টেশনে যাব কেমন করে?'

'পাতালরেল বা ট্রলিবাস যাতে খুশি যাওয়া যায়। তবে পাতালরেলই বেশি ভালো। মাত্তর একবার গাড়ি বদলালে চলে।'

শুনে ছেলের দিকে তাকালেন কন্‌দ্রাত্‌। বললেন:

'শহরের পথঘাট সব চিনে গেচিস দেখচি।'

'না, সব-যে চিনি তা নয়, তবু...'

'মস্কো!' কন্‌দ্রাত্‌ আবার বললেন। 'যুদ্ধুর সময়ে বার-কতক এখেনে এয়েচি। তবে তখন শহর আজকের মতন ছেল না।'

স্টেশনে পেঁৗছে মিন্‌কার মনে হল প্রাণটা যেন বড্ড ছটফট করছে। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা হঠাৎ কেমন কাবু করে ফেলছে ওকে।

মালপত্র জমা রাখার অফিসে গিয়ে ওর বাবা স্যুটকেসগুলো খালাস করিয়ে নিলেন। তারপর ওঁর নির্দিষ্ট কামরার সন্ধানে চলল দু'জন। প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটার সময় কেউই কথা বলছিল না। অতঃপর ট্রেনের কামরায় উঠল দু'জন। মালপত্র সাজিয়েগুছিয়ে রাখতে অনেক সময় নিলেন বাপ, তারপর জানলার ধারে টেবিলের সামনে ছেলের মুখোমুখি হয়ে বসলেন। দু'জনেই ফের চুপ করে গেল, তাকিয়ে রইল জানলার বাইরে।

প্ল্যাটফর্মে অনবরত লোকের আনাগোনা চলছিল। কেউ-কেউ ছুটোছুটি করছিল আর যাদের ট্রেনে ঘোরা অভ্যাস আছে তারা হাঁটছিল আস্তে-ধীরে।

'এরা সবাই শহর ছেড়ে দেশেগাঁয়ে যাচ্ছে,' মিন্‌কা ভাবল।

কামরার মধ্যে টাটকা কিছুর একটা গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছিল, রঙের না চামড়ার গন্ধ কে জানে।

লাউডস্পিকারে একটা গলা গমগম করে উঠল। ঘোষিকা বলছিল, যারা কাউকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে তারা যেন এবার ট্রেন থেকে নেমে আসে আর যারা ট্রেনে যাচ্ছে তাদের হাতে টিকেট তুলে দিতে ভুলে না-যায়।

মিন্‌কাও ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল, তারপর বাবা যেখানে বসে ছিলেন সেই জানলার কাছটাতে এসে দাঁড়াল।

পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। কন্‌দ্রাতের চোখদুটো গম্ভীর, ছেলের মধ্যে কী যেন খুঁটিয়ে দেখছিলেন তিনি।

মিন্‌কা অবাক হয়ে ভাবল, 'কেন উনি অমন করে তাকাচ্ছেন? ভাবখানা এমন যেন মনে হচ্ছে এই শেষবারের মতো দু'জনের মধ্যে দেখা।'

ট্রেনটা তখনও থেমে। নড়ার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছিল না।

অবশেষে ট্রেন ছাড়ল।

বাবার দিকে তাকিয়ে জানলার পাশে-পাশে প্ল্যাটফর্মের ওপর হাঁটতে লাগল মিন্‌কা। বাপও তাকিয়ে ছিলেন ছেলের দিকে। ট্রেনের কামরার ছোট্ট টেব্‌লটায় ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে স্থির হয়ে বসে ছিলেন তিনি। বিষণ্ণ, পাকামাথা বৃদ্ধ, তবু চোখদুটোয় তেমনি কঠোর আর মনোযোগী চাউনি।

একসময় থেমে গেল মিন্‌কা। বাবাকে শেষবারের মতো একবার দেখতে পেল — আসন ছেড়ে খানিকটা উঠে মুখখানা জানলার কাচে সেঁটে রেখেছেন। ব্যস, তারপরে আর দেখা গেল না। সজোরে একটানা হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেনটা এবার দ্রুত চলতে শুরু করল।

মিন্‌কাও রওনা দিল হস্টেলমুখো।

হেঁটেই ফিরতে লাগল সে। মনটা তার কেমন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। অনবরত ছোট-ছোট রাস্তায় ঢুকে পথটাকে টেনে লম্বা করতে চাইছিল, যাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর হস্টেলে ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

ফিরে দেখল ঘরে আর কেউ নেই। কেবল টেব্‌লের ওপর তখনও নানারকম খাবারদাবার আর দামি ব্র্যান্ডির আধা-শেষ বোতলটা পড়ে আছে।

বিছানা-ঢাকা তুলে বিছানার ওপর বসল মিন্‌কা। বাইরের জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই। কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পর জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

চাঁদ উঠল। আলোয় থৈ-থৈ করতে লাগল ঘরখানা। মিন্‌কা কল্পনা করল, ট্রেনখানা বাবাকে নিয়ে এতক্ষণে স্তেপের প্রান্তর মাড়িয়ে গুমগুম করে ছুটেছে। আর বাবা হয়তো জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। দেখছেন, ঢেউখেলানো স্তেপভূমির ওপর জ্যোৎস্না রাত রুপোলি-শাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে...

উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজল মিন্‌কা। আর ফের একবার তার চোখে ভেসে উঠল স্তেপের মাঠ আর তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ঘোড়ার পাল...

ওই ছবি দেখতে-দেখতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশের ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ার চালানোর আওয়াজ ঘুমের মধ্যে একবার কানে এল তার। আর সে স্বপ্ন দেখল — প্রদর্শনীর কর্মচারিটা তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে, হো-হো করে, বোকার মতো।



নেকড়েরা

রবিবারের এক সকালবেলা বেশ ভোর-ভোরই ইভান দেগ্‌তিয়ারিয়োভের ঘরে তার শ্বশুর নাউম ক্রেচেতভ এসে হাজির। ক্রেচেতভ লোকটিকে মোটেই বুড়ো বলা চলে না, বরং সে ছিল তাগড়া মরদ আর প্রচণ্ড খাটিয়ে লোক, তাছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে ধূর্তও। এক ধরনের একটা সহজাত আকর্ষণশক্তিও ছিল তার। শ্বশুরকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না ইভান। আর নাউমও একমাত্র মেয়ের কথা ভেবেই ইভানকে সহ্য করে যেত।

'কী, এখনও বিছনায় শুয়ে?' ঘরে ঢুকেই হুড়মুড় করে বলতে শুরু করল নাউম। 'ও-হোঃ!.. এমনভাবে চললে দেখতে পাচ্চি স্বর্গে যাবার সময় পর্যন্ত ঢুলতে থাকবে তুমি। ওঠো, ওঠো, সুপ্রভাত!'

'স্বর্গে যাবার লেগে আমার তো ভারি মাথাব্যথা কিনা!'

'এয়া আরও বোকার মতন কথা হল। ওঠো, উঠে পড় দিনি!.. জ্বালানি কাঠ যোগাড় করার লেগে আমাদেরে বেশ খানিক দূর যেতে নাগবে। একজোড়া শ্লেজগাড়ি ব্যাভার করতে দিতে দলের প্রেধানরে বহু কষ্টে রাজি করিয়েচি, বুইলে। অবিশ্যি মিনি-মাগনা গাড়ি দেয় নাই, তা আর বলতে। তবে শালার কী আর করা — কাঠ তো নাগবেই, নাকি?'

আরও কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থেকে কী যেন ভাবল ইভান... তারপর উঠে জামাকাপড় পরতে শুরু করল।

একসময় বলল, 'আচ্ছা, সকল ছেলেছোকরা শহরমুখো ভাগচে কেনে কইতে পার? কারণ, শহরে নিজের ভাগের-ভাগ কাজটুক শেষ করে ফেললে পর, ব্যাস, তুমি স্বাধীন, যা পরান চায় করতে পার। মানুষে এট্টু বিশ্রাম পেতে

পারে সেখেনে। কিন্তু এখেনে? জোঁকের মতন কাজে নেগে থাকতে হবে-নে, দিনের চব্বিশটে ঘণ্টা। এমন কি রোববারেও রেহাই নাই।'

'বটে, জ্বালানি ছাড়াই আমাদেরে চালাতে নাগবে? নাকি?' এবার ওর স্ত্রী ন্যুরা খেঁকিয়ে উঠল। 'নোকে কষ্ট করে ওনার জন্যে ঘোড়া যোগাড় করে আনবে আর ওনার তাতেও রাগ! ভারি আমার!'

আর শ্বশুর মন্তব্য করল, 'শুনৌচি শহরেও নাকি ছাড়ানছোড়ন নাই, প্রেচুর কাজ করতে নাগে।'

'তা তো নাগবেই। খুশি হয়েই আমি গিয়ে জলের পাইপ বসানোর লেগে গর্ত খুঁড়তে রাজি। একবার পরান ভরে পরিশ্রম কর, ব্যাস, চুকে গেল ন্যাঠা। অন্তত পক্ষে এয়ার পর আর কোনো ঝামেলা পোয়াতে হয় না — ঘরে বসে জল আর ঘর-গরমের বেবস্তা পেয়ে যাচ্চ তুমি।'

'কলের জল একদিক দে' ভালো আবার আরেক দিক থেকে খারাপও — তাইলে বাকি জেবন তোমার বিছনায় গইড়েই কাটত আর-কি। যাই হোক, রওনা দেয়া যাক, চল।'

'জলখাবার খেয়ে যাবে না?' ন্যুরা শুধোল।

কিন্তু ইভান খেতে রাজি হল না — বলল ওর ইচ্ছে নেই।

দিনটা ছিল রোদ্দুরে ঝলমলে, পরিষ্কার। চারিদিকে ঝকঝকে তুষার। জঙ্গলের ভেতরটা এত নিস্তব্ধ যে অবিশ্বাস্য ঠেকছিল।

ওদের যেতে হবে প্রায় বিশ ভের্স্তা পথ। গ্রামের কাছেপিঠে — কোথাও গাছকাটা একদম বারণ।

নাউম আগে-আগে শ্লেজ চালিয়ে যাচ্ছিল আর গালাগাল দিয়ে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছিল:

'ধুত্তোর নিকুচি করেচে শালাদের!.. অল্প চাট্টি জালানিকাঠের লেগে এক জঙ্গল ছেড়ে আরেক জঙ্গল ঢুঁড়ে বেড়াও।'

এদিকে ঘোড়ার একটানা দুল্‌কি চালের দুলুনিতে ইভান তার শ্লেজে বসে-বসেই ঢুলতে শুরু করেছিল।

জঙ্গল ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল তারা। তারপর উৎরাই বেয়ে একটা খোলা খাদের মধ্যে নেমে ফের চড়াই বেয়ে অপরদিকে উঠতে লাগল। চড়াইয়ের মাথায় প্রকাণ্ড নীলরঙের দেয়ালের মতো ফের একটা জঙ্গলের মাথা দেখা গেল।

চড়াইটার প্রায় মাথায় গিয়ে পেঁছেছে এমন সময় ওদের নজরে পড়ল সামনে, রাস্তা থেকে অল্প-একটু দূরে, গোটা পাঁচেক প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অপেক্ষা করছে ওরা। নেকড়েরা।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে অদ্ভুত একটা ঘ্যান্‌ঘেনে গলায় নিচু স্বরে গাল দিয়ে উঠল নাউম।

'ওরে আমার ছেয়েরঙের সোন্দরী-সব, পেট ফেটে মর্‌-না কেনে! কী, বাহার দিতে দাঁইড়ে আচিস বুঝি?'

ইভানের বাচ্চা ভিতু ঘোড়াটা হুড়মুড় করে পিছিয়ে এসে ঘোড়া-জোতার একটা ডান্ডা ডিঙিয়ে পা ফেলল। লাগামে হেঁচকা টান দিয়ে ঘোড়াটাকে সযুত করার চেষ্টা করল ইভান, কিন্তু ঘোড়াটা খালি চিঁহিচিঁহি ডাক ছেড়ে হোঁচট খেতে লাগল, কিছুতেই ডান্ডার এধারে পা ফেলতে পারল না।

নেকড়েরা ওদিকে পাহাড় বেয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করেছিল।

ইতিমধ্যেই শ্লেজখানার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল নাউম। চেঁচাতে লেগেছিল সে, 'আরে, চলে এস, চলে এস। হাঁ-করে বসে আচ কিসের লেগে?'

শ্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ে ইভান কোনোরকমে ঘোড়াটাকে ডান্ডাদুটোর মাঝখানে জুতে ফেলল। শ্লেজে ও উঠতে-না-উঠতেই ঘোড়াটা এবার নিজে থেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সজোরে দৌড় লাগাল।

নাউম ততক্ষণে বেশ খানিকটা দূর চলে গেছে।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকড়াতে হাঁকড়াতে সে তখন পাগলের মতো চিৎকার করে চলেছে, 'বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকাত! ডাকাত!'

ওদিকে পাঁশুটেরঙের মাটির ঢেলার মতো লম্বা-লম্বা লাফে উৎরাই বেয়ে আড়াআড়ি নেমে আসছে নেকড়েরা।

'ডাকাত! ডাকাত!' বলে তখনও চেঁচিয়ে চলেছে নাউম।

'লোকটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি?' আপনা থেকেই কথাটা মনে হল ইভানের। 'কে আবার কার ওপর ডাকাতি করচে?' নিজেও ও ভয় পেয়েছে। তবে ওর ভয় পাওয়ার ধরনটা একটু অন্য রকমের। আসলে এটা কৌতূহল-মাখানো ভয়। কথাটা ভেবে শ্বশুর সম্পর্কে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি না-হেসে পারল না ইভান। তবে দেখতে-দেখতে কৌতূহলও গেল উবে আর হাসিরও বিশেষ কিছু কারণ রইল না। কারণ নেকড়েগুলো ইভানের শ্লেজের শ'খানেক মিটার পেছনে রাস্তায় এসে উঠল, তারপর লম্বা একটা সার বেঁধে

দ্রুত ধাওয়া করে এগিয়ে আসতে লাগল। শক্ত হাতে শ্লেজের সামনের দিকটা চেপে ধরে ইভান একবার পেছন ফিরে নেকড়েগুলোর দিকে তাকাল।

দেখল, বসা-বুক আর হল্‌দেটে মুখওয়ালা প্রকান্ড একটা নেকড়ে সকলের আগে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসছে। দেখতে-দেখতে জন্তুটা শ্লেজ থেকে মাত্র পনেরো-বিশ মিটার দূরে এসে পড়ল। ইভানের দেখে অবাক লাগল যে ওটা দেখতে মোটেই অ্যাল্‌শেসিয়ান কুকুরের মতো নয়। এর আগে এত কাছ থেকে কখনও নেকড়ে দেখে নি ও, আর সব সময়েই ওর মনে হয়েছে যে নেকড়ে অনেকটা অ্যাল্‌শেসিয়ানের মতোই দেখতে, কেবল আকারে একটু বড় এই-যা। এখন অবশ্য বুঝল যে নেকড়ে নেকড়েই, বুনো জন্তুমাত্র। এমন কি সবচেয়ে হিংস্র কুকুরকেও শেষ মুহূর্তে কিছু-একটা দিয়ে, কোনো-না-কোনো ভাবে থামানো যেতে পারে — তা সে ভয় দেখিয়ে, আদর করে লোভানি দিয়ে, কিংবা হঠাৎ থামতে হুকুম করে, যে-ভাবেই হোক। কিন্তু হল্‌দেটে মুখওয়ালা এই প্রাণীটা একমাত্র থামতে জানে মারা পড়লে। গর্‌গর আওয়াজ করছে না বা ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে না প্রাণীটা... খালি পিছু ধাওয়া করে শিকারকে কাবু করে ফেলতে চাইছে। ওর গোল-গোল হল্‌দে চোখের চাউনির অর্থটাও ভারি সরল আর সিধে।

শ্লেজের ভেতরটা এক-নজর তাকিয়ে দেখল ইভান। নাঃ, অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলে এমন কিছুই নেই এখানে, গাছের ডালের লম্বা একটা ছপ্‌টি পর্যন্ত নেই। দু'খানা কুড়ুলই রয়ে গেছে শ্বশুরের শ্লেজে। ওর নিজের সম্বল বলতে যার ওপর ও শুয়ে আছে সেই একবোঝা খড় আর ওর হাতের ঘোড়ার চাবুকখানা।

'ডাকাত! ডাকাত!' দূর থেকে নাউমের চিৎকার কানে ভেসে এল ওর।

এতক্ষণে সত্যিসত্যি ভয় ধরে গেল ইভানের।

নেকড়ের দলের পান্ডাটা এবার ঘোড়ার কাছে পেঁছিনোর জন্যে শ্লেজের পাশ কাটিয়ে দৌড়তে লাগল। শ্লেজ থেকে মাত্র মিটার-দুই দূরে থেকে দৌড়চ্ছিল ওটা...। একটু উঁচু হয়ে উঠে একহাতে শ্লেজের পাশের কাঠখানা চেপে ধরে ইভান পান্ডা-নেকড়েটাকে লক্ষ্য করে এবার সজোরে চাবুক হাঁকড়াল। নেকড়েটা বোধহয় এমনটা আশা করে নি। দাঁতে-দাঁত ঘসে লাফিয়ে দূরে সরে যেতে গিয়ে হোঁচট খেল ওটা... দলের অন্য নেকড়েগুলোও পেছন থেকে ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল, তারপর গোটা দল ঘিরে ধরল পান্ডাটাকে। বড় নেকড়েটা পাছায় ভর দিয়ে বসে ছিল। এবার একবার একটা

তারপর আরেকটা নেকড়ের দিকে খে'কিয়ে উঠে ফের সে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটতে লাগল সামনের দিকে আর অতি সহজেই আবার শ্লেজটাকে ধরে ফেলল। শ্লেজের ওপর গুড়ি মেরে বসে ছিল ইভান, ফের একবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে।... পান্ডাটাকে সে আরেকটা চাবুকের ঘা কষাতে চাইছিল। কিন্তু নেকড়েটা এবার হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিল, শ্লেজ থেকে একটু দূরে-দূরে থেকে দৌড়চ্ছিল সেটা। ইতিমধ্যে আরেকটা নেকড়েও দল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে শ্লেজের অপর দিক দিয়ে দৌড়তে শুরু করেছিল। দেখে ইভান হতাশভাবে দাঁতে-দাঁত ঘষল...

ভাবল, 'এই শেষ। মরতে হবে এবার।' একবার সামনের দিকে দূরে তাকাল ও।

নাউম তখনও ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক হাঁকড়ে চলেছে। একবার ফিরে তাকাতে সে দেখতে পেল নেকড়েগুলো জামাইকে ঘিরে ধরেছে প্রায়। সঙ্গে সঙ্গে ফের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চে'চাতে লাগল:

'বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকাত! ডাকাত!'

'এট্টু দাঁড়াও-না কেনে, বাপ!.. আর আমারে একখান কুড়োল দ্যাও দিনি! দু'জনায় আমরা অনায়াসে ওদেরে ভাগিয়ে দিতে পারব।'

'বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকাত! ডাকাত!'

'এট্টু আস্তে চল দিনি। দু'জনায় আমরা ওদেরে ভাগিয়ে দিতে পারব!. এট্টু দাঁড়াও-না কেনে, শোরের বাচ্চা কাঁহাকা!'

'ওদেরে কিছু এট্টা ছুড়ে দ্যাও-না কেনে!' চে'চিয়ে বলল নাউম।

পান্ডা-নেকড়েটা এবার ঘোড়াটার পাশে-পাশে দৌড়চ্ছে আর তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করছে। শ্লেজের পেছনে দৌড়ে-আসা নেকড়েগুলোও এখন বেশ কাছে এসে পড়েছে। এক-মুহূর্তও শ্লেজটা যদি থামে তো ওরা নিজেদের দৌড়ের বেগেই তাল সামলাতে না-পেরে গাড়ির ওপর এসে পড়বে। ব্যস, তার পরেই সব শেষ হয়ে যাবে। ইভান ওদের দিকে এক-আঁটি খড় ছুড়ে দিল, কিন্তু নেকড়েগুলো গ্রাহ্যই করল না তা।

'ওরে বাপ, ওরে শয়তান শোরের বাচ্চা, এট্টু আস্তে চল্‌! আমারে একখান কুড়োল ছুড়ে দে!'

শুনে নাউম এবার মাথা ঘোরাল। বলল:

'এই-যে, ভানিয়া। কুড়োলখান ছুড়ে দিচ্চি কিন্তু — হুঁশিয়ার!'

'আমার লেগে এট্টু থাম-না কেনে!'

‘হ‍ুঁশিয়ার, কুড়োল ছুড়লাম কিন্তু!’ বলতে-বলতে একখানা কুড়ুল রাস্তার একপাশে ছুড়ে দিল নাউম।

দূরত্বটা মনে-মনে হিসেব করে নিয়ে শ্লেজ থেকে একলাফে নেমে পড়ে কুড়ুলখানা কুড়িয়ে নিল ইভান... হঠাৎ ওর এই লাফ দেয়াতে পেছনের তিনটে নেকড়ে ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গিয়ে এক-মুহূর্তের জন্যে থামল তারা, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আক্রমণ করবে কিনা সে-ব্যাপারে মনস্থির করতে একটু সময় নিল যেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পায়ের নিচে শক্ত বরফের ঠেকো পেয়ে পান্ডা-নেকড়েটা লাফ দিল ঘোড়ার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের দিকে নরম বরফের একটা স্তূপের মধ্যে ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ল... শ্লেজখানাও গেল উলটে আর ঘোড়াজোতার ডান্ডাদুটো ঘোড়াটার শক্ত চামড়ার কলারটা পেঁচিয়ে ঘোড়ার গলায় ফাঁসির দড়ির মতো আটকে দিল তা। ডান্ডাদুটোর মাঝখানে আটকা পড়ে ঘোড়াটা হাপরের মতো হাঁপাতে আর ছটফট করতে লাগল। যে-নেকড়েটা শ্লেজের অন্য পাশ দিয়ে ছুটে আসছিল সে এবার লাফিয়ে পড়ে থাবার এক-আঁচড়ে ঘোড়ার পেটখানা ফালাফালা করে চিরে ফেলল।

বাকি তিনটে নেকড়েও এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর।

পরমুহূর্তে দেখা গেল তখনও-চার পা-ছোড়া জ্যান্ত ঘোড়াটার গা থেকে পাঁচটা নেকড়েই মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে লেগেছে। ঘোঁতঘোঁত, গর্‌গর করতে-করতে নেকড়েগুলো ঘোড়ার নীলচে-লাল অন্ত্রের কুন্ডলীটা পেট থেকে টেনে বের করে ঝক্‌ঝকে শাদা বরফের ওপর এনে ফেলল। পান্ডা-নেকড়েটা এবার বার-দুই ফিরে তাকাল, গোল-গোল হল্‌দে দুটো চোখ মেলে সোজাসুজি তাকাল মানুষটার দিকে...।

যে-রকম ভয়ঙ্কর দ্রুততায় আর সহজভাবে ব্যাপারটা ঘটে গেল তা যেন স্বপ্নের মতো ঠেকছিল ইভানের কাছে। কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, আতঙ্কিত চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে এই রাক্ষুসে, চটপট ভোজের ব্যাপারটা দেখছিল। পান্ডা-নেকড়েটা এমন সময় ফের একবার ওর দিকে ফিরে তাকাল। আর সেই উদ্ধত, বিজয়ীর চাউনি দেখে এতক্ষণে ইভানের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কুড়ুলখানা মাথার ওপর তুলে ধরে প্রাণপণে চিৎকার করতে-করতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়েগুলোর ওপর। এতে অনিচ্ছাভরে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তারা থমকে দাঁড়াল মাত্র, তারপর রক্তমাখা চোয়ালগুলো চাটতে লাগল জিভ দিয়ে। এ-কাজে এতখানি ব্যস্ত হয়ে রইল

তারা কিছুক্ষণ যে মনে হল কুড়ুল-হাতে লোকটা সম্পর্কে যেন তাদের কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। তবে পান্ডা-নেকড়েটা কিন্তু ইভানের দিকে সতর্ক নজর রাখছিল। যত খারাপ কথা তার জানা ছিল তার সব ক'টা ব্যবহার করে ওটাকে প্রাণ ভরে খিস্তি করে কুড়ুল উ'চিয়ে তুলে ওর দিকে কয়েক পা এগোল ইভান। কিন্তু আশ্চর্য, জন্তুটা এক পা'ও নড়ল না। ইভানও হঠাৎ থেমে গেল।

বলল, 'তুই-ই জিতলি শালা। যা, গপগপ করে গেল গিয়ে, লচ্ছার হারামি কোথাকার।' তারপর ঘোড়াটার খন্ডবিখন্ড দেহটার দিকে না-তাকানোর চেষ্টা করতে-করতে গাঁয়ের পথে হাঁটা শুরু করল। তবু একবারের তরে সেদিকে না-তাকিয়েও পারল না... আর বুকখানা দুঃখ, মমতায় ভরে উঠল তার, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের প্রতি প্রচন্ড রাগে রক্ত ফুটে উঠল টগবগ করে। রাস্তা ধরে সে দ্রুত পা চালিয়ে চলল। 'দাঁড়াও, দেখাচ্চি মজা তোমারে!.. দাঁড়াও, জঘন্য নোংরা সাপ কোথাকার! দু'জনায় মিললে আমরা ওদেরকে খেদিয়ে দিতে পারতাম আর ঘোড়াটাও পরানে বে'চে যেতে পারত। স্বাত্থপর বেজম্মা কাঁহাকা!'

দেখা গেল রাস্তার মোড় ঘুরে একটা জায়গায় অপেক্ষা করছে নাউম। ইভানকে সুস্থসবল আর নিরাপদ দেখে সত্যিই আন্তরিক খুশি হয়ে উঠল সে।

'যাক, তাইলে বে'চেবত্তে আচ? সবই ভগমানের কৃপা!' মনে হল এতক্ষণ সে যেন এক-আধটুকু বিবেক-দংশনে কষ্ট পাচ্ছিল।

'হ্যাঁ, তা বে'চেবত্তে আচি বৈকি!' ইভান বলল। 'তুমিও তো দিব্যি বে'চেবত্তে আচ, তাই-না?'

জামাইয়ের গলার স্বরে কেমন একটা অশুভ সম্ভাবনার পূর্বলক্ষণ টের পেল নাউম। পাছে কিছু একটা ঘটে এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সে শ্লেজের ওপর উঠে পড়ল।

'ওগুলা ওখেনে করচেটা কী?'

'তোমারে সেলাম জানাচ্চে, আর কী করবে! স্বাত্থপর বেজম্মা কোথাকার!..'

'আরে, আমারে গাল পাড়চ কেনে? আমি কী করলাম?'

'শুধু গাল পাড়ব না, তোমারে ধরে উত্তমমধ্যম ধোলাই দুব এবার,' বলতে-বলতে ইভান শ্লেজের দিকে এগিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নাউমও ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাল।

'থামো! থামো!' চিৎকার করতে-করতে স্লেজের পেছনে ছুটতে লাগল ইভান। 'থামো শিগ্‌গিরি, অপদাত্থ কাঁহাকা!'

ফের ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকড়াল নাউম... আর ফের একবার পিছু-ধাওয়া শুরু হল। তবে এবার মানুষকে তাড়া করছিল মানুষই।

'থামো! থামো বলচি!' ইভান চেঁচিয়ে বলল।

'একবারে খ্যাপা!' নাউমও চেঁচিয়ে জবাব দিল। 'বলি, এত মেজাজ দেখাচ্চ কিসের লেগে, অ্যাঁ? মাথাটাথা বিগড়ে গেল, নাকি? আমার অপ্‌রাধটা কী, শুনি?'

'অপ্‌রাধ নাই?! দু'জনায় মিললে আমরা নেকড়েগুলারে হটিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু তুমি আমারে বিপদে ফেলে কেটে পড়লে... এয়া অপ্‌রাধ লয়?'

'কে বললে, পারতাম?! মিথ্যে-মিথ্যে আমারে দোষ দিও নি বলচি!'

'তুমি আমারে বিপদে ফেলে কেটে পড়েচ, ধুত্ত সাপ কোথাকার! তোমারে এমন শিক্ষে দুব-না আমি যে বুইবে মজাখান! আমার হাত এইড়ে পালাবার ক্ষ্যামতা নাই তোমার, কাজেই ভালোয়-ভালোয় বলচি দাঁইড়ে যাও। তোমারে যদি আড়ালে ঠ্যাঙানি দিই, তাইলে সেটা তোমার পক্ষে তেমন নজ্জার হবে না। কিন্তু তা না হলে দশজনার মধ্যি তোমারে ঠ্যাঙানি দিতে নাগবে। আর সবারে কয়ে দুব কেনে ঠ্যাঙানি দিলাম... কাজেই বলচি, ভালোয়-ভালোয় দাঁইড়ে যাও!'

'সহজে থামব বলে তো মনে লিচ্চে না আমার!' ঘোড়ার পিঠে ঘনঘন চাবুক কষাতে-কষাতে বলল নাউম। 'ওরে ঘোর অপদ্দাত্থ, হাবাগবা! কী করে-যে আমাদের কপালে জুটলি তুই তা ভেবে পাই নে!'

'শোন, ভালো কথা কচ্চি, থামো শিগ্‌গিরি!' প্রচণ্ড হাঁপাতে-হাঁপাতে ইভান বলল। 'তোমার পক্ষে ভালোই হবে এয়া — একবার শুধু ঠ্যাঙানি দিয়ে ছেড়ে দুব আর কাউরে সে-কথা কব না।'

'ওরে হাড়-হাবাতে! ওরে শয়তান! তোরে আমরা নিজেদের পরিবারে ঠাঁই দে খাতির করেছেলাম, আর তার প্রেতিদানে তুই কিনা আমারে কুড়োল লিয়ে তাড়া করেচিস! চোখের চামড়া বলে কিছু নাই তোর, অ্যাঁ?'

'আচ্ছা করে তোরে একপ্রস্ত ধোলাই দেয়ার পর তবেই আমরা ওসব চোখের চামড়া-টামড়া লিয়ে আলাপ করব অখন...। থাম্‌, থাম্‌ বলচি!'

কিন্তু ইভান ইতিমধ্যে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিল। অবশেষে তাড়া করা বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করল ও।

'তোরে ধরবই ধরব। আমারে এইড়ে কোন ঠেঁয়ে পালাবি তুই?' দূর থেকে চিৎকার করে এবার ও শ্বশুরকে জানিয়ে দিল।

বাড়ি ফিরে ইভান দেখল বাড়ি ফাঁকা, দরজায় তালা ঝুলছে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। খাবারের আলমারি হাঁটকে আগের দিনের অসমাপ্ত ভোদ্‌কার বোতলটা খুঁজে বের করে নিজের জন্যে এক গ্লাস ঢেলে নিল। মদটুকু খেয়ে তারপর শ্বশুরের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

শ্বশুরবাড়ির উঠোনে সাজ-খোলা ঘোড়াটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। দেখে খুশি হল ইভান। বলল, 'ঘরেই আচে শালা। এবার ওরে ভালোমতন শিক্ষে দিতে নাগবে।'

দরজাটা অল্প ঠেলে দেখল — ভেতর থেকে বন্ধ নেই। আশা করেছিল হয়তো দেখবে দরজাটা বন্ধ। যাই হোক, ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। দেখল কুঁড়ের মধ্যে বসে আছে শ্বশুর, ওর স্ত্রী আর স্থানীয় মিলিশিয়ার একজন লোক। মিলিশিয়ার লোকটি ওকে দেখে হাসল। বলল:

'কী ব্যাপার, ইভান?'

'অ... তাইলে ওরে সাথে লিয়েই এয়েচ?' শ্বশুরকে শুধোল ইভান।

'তা, এয়েচি বৈকি। আর তুমিও ভরপেট মদ গিলে এয়েচ, কেমন?'

'তা, অল্প এট্টু খেয়েচি — জিভটে খোলসা করার লেগে।' একটা টুলের ওপর বসল ইভান।

'এসব কী শুনচি, ইভান? তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?' বলতে-বলতে দাঁড়িয়ে উঠল ন্যুরা। 'এসবের মানে কী?'

'আর কিছু লয়, আমি তোমার বাপেরে এট্টু শিক্ষে দিতে চেয়েছেলাম... কেমন করে মানুষের মতন আচরণ করতে হয় সেই শিক্ষে।'

'ওসব কথা ছাড়ান দ্যাও, ইভান,' মিলিশিয়ার লোকটি বলল এবার। 'ব্যাপারটে দৈবাৎ ঘটে গেচে, তাই লয় কি? দু'জনাই ভয় পেয়েছেলে তোমরা, এই আর-কি... অমনটা-যে ঘটবে তা কে জানত বল? কী আর করা যাবে, এয়া হল গে মানুষের স্বভাব।'

'দু'জনায় মিলে আমরা অনায়াসেই নেকড়েগুলারে ভাগিয়ে দিতে পারতাম। কী করব, আমি ওয়াদের মাঝখানে একা পড়ে গেছিলাম...'

‘কিন্তু আমি তোমারে কুড়োলখান ছুড়ে দেলাম তো, দিই নাই? যা চেয়েছেলে তা যুগিয়ে দেলাম। তাইলে? আর কী করতে পারতাম কও দিনি?’

‘করতে পারতে সামান্য এট্টু কাজ — মানুষের মতন আচরণ করতে পারতে। কিন্তু তুমি নিজেরে ছাড়া আর কিছু জানো না। আমি তোমারে এমন শিক্ষে দুব-না যে টেরটি পাবে তখন।’

‘ইঃ, কথা শোন একবার — মস্ত গুরুমশাই এয়েচেন! সেদিনের পুঁচকে ছোঁড়া, গাল টিপলে দুধ বেরোয়... হতদরিদ্দির, এক কানাকড়ির মুরোদ নাই, তা তারে খাতির করে ঘরে ঠাঁই দেলাম, যুগিয়ে দেলাম সবকিছু, আর এখন কিনা উল্‌টে উনিই আমারে শাসাতে নেগেচেন। আবার আস্পদ্দা কত, সবতাতেই খুঁত ধরা চাই — বলে, এখেনে কলের জল নাই!’

‘আরে, ছাড়ান দ্যাও নাউম, ছাড়ান দ্যাও! ওসবের সাথে এ-ব্যাপারের সম্পক্ক কী?’ মিলিশিয়ার লোকটি বাধা দিয়ে বলল। ‘ওসব কলের জল-টলের কথা তুলে নাভ কী?’

‘লয় আবার, বিলক্ষণ আচে! দেশগাঁয়ের জেবন মোট্টে ভালো লয়!.. শহরে সবকিছু ঢের বেশি সরেস,’ বলতে লাগল নাউম। ‘তাইলে মরতে এখেনে এয়েছেলে কেনে বাছাধন? নাক উঁচু করে মেজাজ দেখাতে? নোকজনেরে খেপিয়ে তুলতে?’

‘আচ্ছা হারামির বাচ্চা তো!’ অবাক হয়ে বলে উঠল ইভান। উঠে দাঁড়াল ও।

মিলিশিয়ার লোকটিও উঠে দাঁড়াল। বলল:

‘ঠিক আচে, ঠিক আচে, ছাড়ান দ্যাও দিকি! ইভান, চলে এস...’

‘এমন সব ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ যারা তাদেরে কোন ঠেঁয়ে রাখা হয় তা জানো?’ নাউম তবু কথা বাড়াতে থাকল।

‘জানি, জানি!’ ইভান বলল। ‘বরফে এট্টা গত্ত খুঁড়ে তার মধ্যি মাথা নিচু করে পুরে দেয়া হয়!’ বলতে-বলতে শ্বশুরের দিকে এক-পা এগিয়ে গেল সে।

মিলিশিয়ার লোকটি এবার সজোরে ইভানের হাতখানা চেপে ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল তাকে।

বাইরে এসে সিগারেট ধরানোর জন্যে দু’জনেই থামল।

তখনও ইভানের বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। বলল, ‘নোকটা বিলকুল

হারামির বাচ্চা, তাই লয় কি? আমারে এখন মেয়াদ খাটাবার লেগে মতলব পাকাচ্চে।'

'আরে, যেতে দ্যাও ওয়ার কথা!'

'না-না, ওরে ভালোরকম ধোলাই দিতে নাগবে আমারে।'

'তাইলে কিন্তু মেয়াদ খাটা নাগবে, কয়ে দিলাম। অমন এট্টা ফালতু নোকের লেগে।'

'তা, আমারে এখন লিয়ে চলেচ কোন ঠেঁয়ে?'

'আরে, এস-না। আমাদের সাথে রাতটুক কাটিয়ে যাও... মাথা ঠান্ডা করার লেগে। একা থাকলে লিজেই লিজের সব্বোনাশ করে ছাড়বে-নে। কী দরকার!'

'কিন্তু... কিন্তু কেমনধারা নোক ও তা বুইলে তো?'

'কিন্তু তা বলে তুমি ওরে মারতে পার না, ইভান। ঘুসোর জোরে কিছুই প্রেমাণ করতে পারবে না তুমি।'

গাঁয়ের রাস্তা ধরে গ্রাম-মিলিশিয়ার থানার দিকে হেঁটে চলল ওরা।

হঠাৎ মিলিশিয়ার লোকটি জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা, তুমি ওরে জঙ্গলের মধ্যিই ঘা-কতক দিতে পারলে না?'

'পেইলে গেল — নাগাল পেলাম না-যে!' সক্ষোভে বলল ইভান।

'তবে আর কি, তাইলে তো চুকেই গেল... এখন বড্ড দেরি হয়ে গ্যাচে।'

'ঘোড়াটার কথা ভেবে বড্ড কষ্ট নাগচে।'

'তা তো বটেই...'

হেঁটে চলল দুজনে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইভান। 'আমি বলি কী, আমারে বরং যেতে দ্যাও। রোববারটা মিথ্যে-মিথ্যে কেনে লষ্ট করব ওখেনে বসে?! কথা দিচ্চি, ওয়ার গায়ে হাত তুলব না।'

'না-না, আমাদের ওখেনেই চল বরং। নইলে ঝুট-ঝামেলার আর অন্ত থাকবে না... তোমার ভালোর জন্যেই কথাটা বলা। আমাদের ওখেনেই চলে এস, একদান দাবা খেলা যাবে অখন... দাবাখেলা জানো?'

সিগারেটের পোড়া টুকরোটা মুখ থেকে থু-থু করে ফেলে দিয়ে আরেকটা সিগারেটের জন্যে পকেট হাতড়াতে লাগল ইভান। বলল:

'তা জানি।'



মহাকাশ, স্নায়ুতন্ত্র ও একদলা চর্বি

আগের রাত্রে মদ টানার ফলে বুড়ো নাউম এভ্‌স্তিগ্‌নেইচের প্রচন্ড খোয়ারির পালা চলছিল। চুল্লির ওপর নিজের বিছানায় শুয়ে ককাচ্ছিল সে।

পেন্সনের টাকাটা ওঠানোর পর মাসে একবার করে নিয়মিত এভ্‌স্তিগ্‌নেইচ বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে, তারপর শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে একটানা তিনদিন। বলে:

'ওরা আমারে খুর দিয়ে নাথিয়ে মারচে, নরকের সব কয়টা শয়তানের সাকরেদ নাথাচ্চে আমারে। মনে লিচ্চে, পটল তুলচি এবারে...'

ওর ভাড়াটে — পনেরো বছরের ছেলে ইউর্কা সারা টেবিলে বই ছড়িয়ে একধারে বসে ইশ্‌কুলের দেয়া বাড়ির টাস্ক করছিল।

বুড়ো বলল, 'ইউর্কা, মনে লিচ্চে পটল তুলচি রে এবারে।'

'অত বেশি মদ খাওয়া উচিত হয় নাই আপনার।'

'আমারে শিক্ষে দেয়ার মতন বয়েস হয় নাই তোর।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কাগজের ওপর ইউর্কার কলমের খসখস আওয়াজ উঠছে।

কিন্তু বুড়োর কথা বলার ভারি ইচ্ছে — কথা বললে যন্ত্রণার একটু যেন লাঘব হয়।

'মদ না-গিলে কী আর করি বল্? মাসটা স্মরণ রাখতে কিছু তো এট্টা করা নাগে...'

'কেন?'

'আমি তো এট্টা জলজ্যান্ত মানুষ, না কী?'

'হ্ঁ...আপনি এমনভাবে কথা বলেন যেন এখনও সেই ভূমিদাসদের আমলেই রয়েচেন,' বাঁকানো কাঠের চেয়ারখানায় এবার হেলান দিয়ে বসে ইউর্কা বাড়িওলার দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাল। 'সেকালে লোকে মনে করত যে পুরুষমানুষ হলেই তার মদ খাওয়া উচিত।'

'সেকালে দিনকাল কেমন ছেল তা তুই কী করে জানলি?' যন্ত্রণা আর কৌতূহলে মুখখানা বিকৃত করে বুড়ো ওপর থেকে ছেলেটার দিকে তাকাল। ইউর্কার জ্ঞানগম্যি দেখে কখনও-কখনও বুড়োর তাক লেগে যায়। যদিও সে হার স্বীকার করে না কখনও, তবু ছেলেটার কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগে না। বলে, 'কী করে এতসব জানলি তুই? তুই তো এট্টা দুধের বাচ্চা।'

'অমন একটা যুগ ছিল আমাদের দেশে।'

'তোর ম্যাস্টাররাই এসব কথা কয়েচে তোরে, তাই-না?'

'হ্যাঁ, স্যাররাই বলেচেন।'

'কিন্তু ওয়ারা জানল কেমন করে? ওয়াদের মধ্যি একজনাও তো বুড়ো নাই।'

'বই পড়ে জেনেচেন...'

'বই পড়ে... তা, ওয়ারা বোধহয় জানে না মদ টানার পরদিন সকালে নোকে এমন কাহিল হয়ে পড়ে কেনে। জানে কি?'

'ফিউজেল তেল পেটে জ্বালাপোড়া ধরায়, তাই।'

'তেল? ভোদ্‌কায় তেল?'

'হ্যাঁ।'

অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করলেও এভ্‌স্তিগ্‌নেইচ এ-কথায় ঘ্যাঁকঘ্যাঁক করে না-হেসে পারল না।

'এই তো, — ন্যাকাপড়া করে মাথাটি গ্যাচে একবারে।'

'বিশ্বাস হচ্চে না তো? তাহলে আপনারে ফর্মুলাটা দেখাই? একেবারে লিখিতপাড়িতভাবে আপনারে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি এক্ষুনি যে...' রসায়নের একখানা পাঠ্যবই হাতে তুলে নিল ইউর্কা, কিন্তু বুড়ো ঠিক সেই সময়ে কাত্‌রে উঠে দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরল।

'ও-হো-হো!.. ফের যন্তন্নাটা বাড়চে! এবার আমিনিঘ্‌ঘাত গেচি রে...'

'তাহলে যারে বলে বিষে বিষক্ষয় তা-ই করেন-না কেন? এভাবে কষ্ট পেয়ে লাভ কী?'

এমন সুপরামর্শেও সাড়া দিল না বুড়ো। খোয়ারি ভাঙবার জন্যে আরেক

পাত্র মদ সে খেতে পারে বটে, কিন্তু এ-বাবদ খরচার পয়সাটা বড্ড গায়ে লাগে। মোট কথা, বুড়ো লোকটা ভারি কৃপণ। ভালোভাবেই খেয়ে-পরে থাকে সে, মোটা টাকা পেন্সনও পায় আর তার দুই ছেলে আর মেয়ে শহর থেকে মাসে-মাসে সাহায্যও পাঠায়। বুড়োর ভাঁড়ার তাই নানারকম সুখাদ্যে ঠাসা — আগের বছর থেকে নুনে জারিয়ে-রাখা শুয়োরের চর্বি, টক শশা, বাঁধাকপি, তরমুজ, ব্যাঙের ছাতা, আরও কত কী... বড়-বড় জালা, গামলা, ঝুড়ি আর পিপেয় ভর্তি ভাঁড়ারঘরটা দেখতে রীতিমতো খাবারের দোকানের মতো ঠেকে। এছাড়া দেড় বস্তা ভালোজাতের ময়দা আর পাউন্ড পঞ্চাশেক ওজনের ঠ্যাংসুদ্ধ প্রকান্ড একটা শুয়োরের রাঙ্‌ও মজুত আছে ভাঁড়ারে। বুড়োর সব্‌জিবাগানে আছে আলুর একটা পাঁজা। আলুগুলো আগের বছরের ফসল, তবে সারা বছরে তার সবটা খরচ হয় নি। বুড়ো তার পোষা শুয়োর, হাঁস আর মুরগির পালকে এই আলুর জাবনা খাইয়ে থাকে। যখন সুস্থ থাকে তখন প্রতিদিন ভোরে রাত থাকতে ওঠে বুড়ো, আর তারপর সন্ধে পর্যন্ত এই বাগান-জমিটায় খুটখুট করে কাজ করে চলে। আর প্রায়ই তার মাটির নিচের ভাঁড়ারঘরে নেমে গিয়ে সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপটায় বসে কী যেন চিন্তা করে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিনের আলোয় উঠে আসতে-আসতে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'হতভাগা শত্তুরগুলো! এখেনে থাকতে ওদেরে কিসে-যে কামড়াচ্ছিল কে জানে!' এই মন্তব্যটা করে বুড়ো নিজের দুই ছেলে আর মেয়েটার উদ্দেশ্যে। ওকে ছেড়ে চলে গিয়ে শহরে বাস করছে বলে তাদের ওপর বুড়োর ভয়ানক রাগ।

ইউর্কার ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম। ওর বাড়ি আসলে পাশের গাঁয়ে, কিন্তু সেখানে দশ-ক্লাসের ইশ্‌কুল নেই। বাপ বেঁচে নেই ইউর্কার। ভেলায় করে কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ওর বাপ জলে ডুবে মারা গেছেন। ও ছাড়া ওর আয়ের আরও তিনটি বাচ্চা আছে, তাদের দেখাশুনো করতে হয় তাঁকে। ওর বাকি তিনটি ভাই সকলেই ইউর্কার চেয়ে বয়সে ছোট। ইউর্কা যাতে দশ-বছুরে স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারে সেজন্যে তারা মা এতই ব্যগ্র যে রাতদিন তিনি পরিশ্রম করে চলেছেন। অবশ্য ইউর্কা নিজেও তাই চায়। শুধু তাই নয়, সে স্বপ্ন দেখে কলেজে ভর্তি হওয়ার। সার্জন হতে চায় সে।

ইউর্কা-যে গরিবের ছেলে বুড়োর কিন্তু তা খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। ইউর্কাকে থাকতে দিচ্ছে বলে মাস-মাস পাঁচ রুব্‌ল করে ভাড়া নেয় সে।

ওরা অবশ্য রান্না করে আলাদা-আলাদা, যে-যার নিজের জন্যে। কোনো-কোনো সময় মাসের শেষে ইউর্কার সঙ্গতি ফুরিয়ে যায়। বুড়ো সে-সময়ে মাঝে-মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে যে ছেলেটা শুধু শুকনো রুটি চিবোচ্ছে, তারপর একসময় শুধোয়, 'কী, খাবারদাবার ফুইরেচে বুঝি?'

'উঁ? হুঁ।'

'তা, আমি তোরে কিছু খাবার দিতে পারি... তবে পরে কিন্তু শোধ দিতে নাগবে।'

'ঠিক আচে।'

বুড়ো তখন কিলো-দুই জোয়ারের দানা ওজন করে দেয় ছেলেটাকে আর সে তাই দিয়ে একটা ঘ্যাঁট রান্না করে খায়।

কখনও-কখনও সকালবেলা চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করে দু'জন।

'কি রে, ন্যাকাপড়া সাঙ্গ করার সাধ আচে নাকি এখনও?'

'হ্যাঁ, আচে। আমি তো সার্জন হব।'

'তা, অমনটে হতে গেলে আরও কদ্দিন সময় নাগবে?'

'আরও আট বছর। ডাক্তারি কলেজে পড়তে গেলে ছয় বছর সময় লাগে, অন্য সব পড়ার মতন পাঁচ বছর নয়।'

'আমার তো মনে লিচ্চে, কাটাছেঁড়ার বদ্যি বনবার আগেই তুই মারা পড়বি, ছোঁড়া। তোর মা-বেটি অতগুলো ট্যাকার যোগান দেবে কোত্থেকে শুনি?'

'কেন? আমি বৃত্তি পাব। অন্য ছেলেরাও তো ডাক্তারি পড়চে... আমাদের গাঁয়েরই তো দু-দুটো ছেলে ডাক্তারি পড়চে এখন।'

কথাটা শুনে বুড়ো তখন তাকিয়ে থাকে আগুনের দিকে। স্পষ্ট বোঝা যায় নিজের ছেলেপিলের কথা মনে পড়ছে তার।

'তা শহরের জন্যে এমন পেল্লায় টান কিসের লেগে বলতে পারিস?'

'লেখাপড়ার জন্যে... আবার কিসের জন্যে টান হতে যাবে! সার্জন হওয়ার পর যে-কেউ ফের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কাজ করতে পারে। এই ধরেন-না কেন, আমি। আমি তো গাঁয়েই কাজ করতে চাই।'

'তাইলে অমন কাজে পয়সা বুঝি ঢের?'

'কোন কাজে? সার্জনের?'

'হ্যাঁ।'

'মোটেই না। সার্জনদের বেতন খুবই কম, ওর থেকে কম আর হয় না। এই সেদিন ওদের বেতন কিছু বেড়েছে, তা-ও জানি। তবু তা কিছুই নয়...'

'তাইলে? এত বচ্ছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শরীলটে কাহিল করে তুলে নাভ কী? বরং এয়ার চেয়ে মোটরগাড়ির ডেরাইভারি শেখ্ গিয়ে, তাম্পর কাজে ঢুকে যা। ওয়ারা কত রোজগার করে তা জানিস? তাম্পর আচে আবার বাঁ-হাতের উপরি-রোজগার, রামের কাঠের বোঝা শ্যামরে দে, সরকারি খামারের খড় অপর কাউরে পেইয়ে দে, হেনো-তেনো কতভাবে। ডেরাইভার হ' — তাইলে মায়েরেও তুই সাহায্য করতে পারবি। তারে আরও তিনটে মুখরে খাওয়াতে নাগে, জানিস তো।'

এসব কথার মুখের মতো জবাব দেয়ার জন্যে ছটফট করতে থাকে ইউর্কা। মা আর ছোট ভাইদের কথায় মনটা খচখচ করে ওঠে খুব। মায়ের পক্ষে খরচ চালানো সত্যিই বড় কষ্টকর... তবু এই ধরনের কথায় বুড়োর ওপর মনটা আরও বেশি বিরূপ হয়ে ওঠে।

শুকনো গলায় সংক্ষেপে বলে, 'সে যে করে হোক চালিয়ে নোব আমরা। এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার, আর কারও নয়।'

'ঠিক ঠিক,' সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় বুড়ো। 'ওয়ারা তোদেরে ছেলেছোকরাদেরে ন্যাকাপড়া, হেনো-তেনো, সাত-সতেরো দে মাথাটা একদম গুইলে দেচে, পথের নিশানা গোলমাল করে দেচে আর-কি, যেমন...' যুতসই তুলনা খুঁজে না-পেয়ে বুড়ো ফের বলল, 'আগের দিনে আমরা বেশ ছেলাম, ভগমানের কৃপায় এসব ন্যাকাপড়া-টড়ার বালাই ছেল না। আর খাওয়ার কষ্টও ছেল না।'

'আপনি শুধু ওইটুকুই বোঝেন — আগের দিনকাল কেমন ছিল!'

'এখন ওয়ারা উড়োজাহাজ বানিয়েচে — যতসব জঘন্য জিনিস।'

'আগেকার ঘোড়ায়-টানা গাড়িই ভালো ছিল, এই তো?'

'তা, মন্দই-বা কী ছেল, বল্? ঘোড়ার গাড়িতে চাপলে আমি জানি যেখেনে যেতে চাই সেখেনে চুপচাপ পেঁছে যাবই। কিন্তু তোদের ওই উড়োজাহাজে চাপলে একবার যদি তা আছড়ে পড়ে ভুঁয়ে তাইলে হাড়গোড় একখানও আস্ত পাওয়া যাবে না।'

প্রতিদিন সকালে ইউর্কা ইশ্কুল না-যাওয়া পর্যন্ত এমনিই আলোচনা চলে দু'জনের মধ্যে। সারাটা দিন মুখ বুজিয়ে থাকার শোধ তুলতে বুড়োকে সকালবেলাটা বকবক করে যেতেই হয়, অপরদিকে ইউর্কা বুড়োর একঘেয়ে

অভিযোগ-অনুযোগে বিরক্ত হলেও নতুন যুগের পক্ষ সমর্থন করতে পেরে কিছুটা আনন্দও পায়। কোমর বেঁধে সে সমর্থন করতে থাকে এরোপ্লেন, লেখাপড়া শেখা, শহুরে জীবন, বইপত্র, সিনেমা... এইসবকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বুড়োও কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।

'ওয়াদের আর কিছু করার নাই তো তাই ছিঁচকাঁদুনেরা সারাক্ষণ নাকে কেঁদেই আচে,' ধর্মপ্রাণ লোকেদের সম্পর্কে বলে বুড়ো। 'কাজ — কাজই হল গে আসল কথা। কাজ কর, তাইলে মনেও শান্তি জোটবে, ধন-সম্পত্তিও হবে।'

তবে কাজ বলতে বুড়ো বোঝে শুধুমাত্র নিজের জন্যেই কাজ করা, নিজের জমিটুকু চষা, নিজের সব্জিখেতটুকুতে নিড়েন দেয়া। সেকালের দিনে যেমন ছিল সেইরকম। যৌথখামারের জন্যে কাজ করা অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছে সে, যদিও তার বয়সী অন্য বুড়োরা এখনও টুকটুক করে অল্পবিস্তর কাজ করে চলেছে — কেউ মৌচাকগুলোর তদারকি করছে, ফসল চৌকি দিচ্ছে কেউ, আবার কেউ-বা গাঁয়ের চৌকিদার হিসেবে কাজ করে চলেছে।

একদিন কী কারণে যেন বুড়োর ওপর চটে ওঠায় ইউর্কা তাকে বলে বসে, 'আপনার দেখচি কুলাকসুলভ বিচ্যুতি আচে।'

কথাটা শুনে চ্যাঁচামেচি না-করে বুড়ো কিন্তু চুপ করে রইল। তারপর গলা থেকে অদ্ভুত একটা সুর বের করে গেয়ে উঠল, 'ওঠো, জা-গো, জাগো সব্বোনা-শা!' তারপর সজোরে নাক ঝাড়ল, প্রথমে ফোঁত্ করে একটা নাক, তারপর আরেকটা। অবশেষে নিজের পরনের কামিজটা তুলে নাক মুছে বলল, 'তুই কিন্তু খাসা কমিশার হতে পারিস, বুইলি। সেকালে কমিশাররা ছেল তোরই মতন পুঁচকে যতসব ছোঁড়া।'

শুনে ইউর্কা বেশ গর্ববোধ করল।

বুড়োর গানের ভাষা সংশোধন করে দিয়ে বলল, 'সব্বোনাশা নয়, সর্বহারা। বুঝলেন!'

'দ্যাখ্ ছোঁড়া, নোকের সামনে খবন্দার ওই কুলাকসুলভ বিচ্যুতি-টিচ্যুতি বলবি নে, তাইলে কিন্তু ওয়ারা আমার বরাদ্দ জমির থেকে এক-টুকরা কেটে লিবে অখন। আমার যা পাওনা তা থেকে খানিক বেশি জমিই আচে আমার, বুইলি...'

'তা, জমি থাকুক-না আপনার। আমার তাতে কী?'

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো বলল, 'যন্ত্রনাটা কমেচে এট্টু। এতক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখছেলাম।'

ইউর্কার আর কথা বাড়ানোর ইচ্ছে ছিল না। হোমটাস্ক শেষ করা বাকি ছিল তার।

'তা, তুই এখন কী শিখচিস?'

'জ্যোতির্বিজ্ঞান,' সংক্ষেপে, কাঠখোট্টারকম জবাব দিল ইউর্কা, বুঝিয়ে দিল যে তার এখন কথা বলার ইচ্ছে নেই।

'সেটা আবার কী?'

'মহাকাশের ব্যাপার নিয়ে। যেখেনে আমাদের নভশ্চররা উড়ে যান।'

'গাগারিন গেছিল যেখেনে?'

'শুধু গাগারিন কেন... এর মধ্যে আরও অনেকে গেছেন সেখেনে।'

'কিন্তু সেখেনে যাওয়ার দরকারটা কী? কিসের লেগে?'

'আচ্ছা প্রশ্ন তো আপনার!' ইউর্কা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। বলল, 'কথাটা ওঁদেরই জিজ্ঞেসা করলে ভালো হয় না? আপনার কি মনে হয় মহাকাশে না-উঠে চুল্লির মাথায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকলেই তাঁরা ভালো করতেন?'

'চুল্লি আর চুল্লি! সবসময় আমারে চুল্লি লিয়ে খোঁটা দিস কেনে, বল্ দিনি?' হঠাৎ খেপে গিয়ে ঝামরে উঠল বুড়ো। 'আগে আমার মতন বাঁচ্ দিনি, তাপ্পর বলিস।'

'না-না, আপনারে খোঁটা দেয়ার জন্যে বলি নি। তবে লোকে কেন মহাকাশে অভিযান চালাচ্ছে আপনার এই প্রশ্নটা কিন্তু অদ্ভুত! সত্যি, প্রশ্নটা কেমন যেন...'

'ঠিক আচে, তাইলে আমারে বুইয়ে বল্। নইলে ন্যাকাপড়া শিখচিস কি ধানচাল দে? নাকি শিখচিস বুড়া মানুষেরে নাকানি-চোবানি খাওয়াবার জন্যে?'

'প্রথম কথা, মহাকাশ অভিযান একটা... একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ চাঁদে নামতে পারবে। পরে মানুষ উড়ে যাবে

শুক্রগ্রহে। শুক্রগ্রহে মানুষ থাকা সম্ভব। তাদের একবার চাক্ষুষ দেখতে পাওয়াটা বেশ মজার ব্যাপার না?'

'তারা কি আমাদের মতন নাকি?'

'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে তারা আমাদের থেকে একটু আলাদা, একটু কিম্ভূত ধরনের দেখতে হতে পারে, কেননা সেখানকার আবহমণ্ডল একটু অন্যরকম কিনা — সেখানে বাতাসের চাপ বেশি।'

'আমাদেরে দেখলে তারা মারমুখো হয়ে ওঠবে বোধহয়।'

'তা কেন? মারমুখো হবে কেন?'

'তারা বলবে, তোরা মরতে এখেনে এয়েচিস কিসের লেগে?' ব্যাপারটার কথা ভেবে বুড়ো বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। বলল, 'জানিস তো, কথায় বলে:

'না-ডাকতে ঘরে আসে অতিথ্
তাতারকে বলে দূরে থাক, এমনি সে পতিত্।'

'না-না, তারা অমন কিছু করবে না। আমাদের মতন তারাও খুব খুশি হবে। এখনও কেউ জানে না কারা বেশি বুদ্ধি ধরে — আমরা না তারা। কে জানে, হয়তো তারাই বেশি বুদ্ধিমান। তা যদি হয় তাহলে আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিতে পারব। তারপর আমাদের কৃৎকৌশল আরও পাকা হলে আরও দূরে উড়ে যেতে পারব আমরা...'

মানুষের এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বলতে-বলতে ইউর্কার নিজেরও যেন নেশা ধরে গেল। লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিল সে। 'এখনও পর্যন্ত আমরা জানি না কতগুলো গ্রহের আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল আছে! কে জানে, হয়তো লক্ষ-লক্ষ এমন গ্রহ-নক্ষত্র আছে! আর তাদের সব ক'টাতে আছে জীবন্ত প্রাণী। তাদের দেখতে আমরা উড়ে-উড়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াব আর তারাও আসবে আমাদের কাছে... এইভাবে শেষপর্যন্ত একদিন এক — এক বিশ্বজাগতিক মানুষের সৃষ্টি হবে। আমরা সবাই তখন একরকম হব।'

'তোরা তখন একে-অন্যরে বে করবি, নাকি?'

'বিয়ে কেন, আমি লেখাপড়া শেখার কথা বলচি! কোথাও কোনো গ্রহে হয়তো এমন মানুষ আচে যারা এত উন্নত হয়ে উঠেচে যে আমরা তাদের কাছ থেকে সবকিছু শিখে নিতে পারি। হয়তো তারা এরমধ্যেই যা আবিষ্কার

করার তা সবকিছু করে ফেলেচে, অথচ এদিকে আমরা সবে প্রথম পদক্ষেপ নিতে শুরু করেচি মাত্র। কাজেই সবকিছু শিখে নিতে পারলে আমরা তেমনি সুখের জীবন কাটাতে পারব ধর্মশাস্ত্রে যারে স্বর্গধামের জীবন বলা হয়েচে। ধরেন, আপনি এখন যেখেনে আছেন সেই চুল্লির উপরে বসে আপনার ছেলেদের দেখতে চান। তা এতে অত ব্যস্ত হবার দরকার নাই, আপনি শুধু ভিডিও-সেটটি চালু করে দিন, চাবি টিপে ঠিক-ঠিক ওয়েভলেন্থটি ধরুন, আর অমনি দেখতে পাবেন তাদের। তারপর যত ইচ্ছে প্রাণ ভরে কথা বলুন। কিংবা ধরেন, আপনি আপনার মেয়ের কাছে যেতে চান আর ছোট্ট নাতিটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে চান একটু। তা, কুছ পরোয়া নেই, সোজা বাড়ির ছাদে চলে যান, ছোট্ট হেলিকপ্টারটিতে স্টার্ট দিন আর "ক" মিনিটের মধ্যে পেঁছে যান মেয়ের বাড়ি। আর আপনার নাতি... আচ্ছা, আপনার নাতির বয়স কত হল?'

'সাত বছর।'

'সে আপনারে "যুদ্ধ ও শান্তি" বইটি থেকে জোরে-জোরে পড়ে শোনাবে, কারণ তার মনের বিকাশ এখনকার চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ঘটবে। আর ডাক্তারিশাস্ত্রের তখন এত বেশি উন্নতি ঘটবে যে মানুষ অনায়াসেই এক শো কি এক শো-বিশ বছর বাঁচবে।'

'যাঃ, এটা এট্টু বেশি বাড়াবাড়ি কথা বলচিস।'

'কেন? বিজ্ঞানীরা তো এখনই এ-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। এক শো-বিশ বছরকে মানুষের স্বাভাবিক আয়ু বলে মনে করা হচ্চে। এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নাই, তবে আমাদের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সব খোঁজখবর আমরা যোগাড় করে নোব।'

'তা, তোরা নিজেরা পারবি নি খোঁজখবর করতে, যাতে আমরা সবাই এক শো-বিশ বছর বেঁচে থাকতে পারি?'

'না, এখনও আমরা তা পেরে উঠচি না। কাজটা খুব আস্তে-আস্তে এগুচ্চে কিনা। হয়তো একদিন আমরা সেই পর্যায়ে এসে পেঁছব যখন সবাই এক শো-বিশ বছর করে বাঁচব। তবে খুব শিগ্‌গিরি তা হবে বলে মনে হয় না। তার আগেই হয়তো নক্ষত্রলোকে উড়ে যাওয়ার মহাকাশযান বানানো হয়ে যাবে, আর সেখেনে গিয়ে দেখা যাবে লোকজন এ-সমস্যার সমাধান করে ফেলেচে। তারা হয়তো এমন সব ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেচে...'

'কিন্তু নোকে হয়ত্তো তখন আর এক শো-বিশ বছর বাঁচতে চাইবে নি, তার আগেই জেবনে তিতিবিরক্ত হয়ে যাবে অখন।'

'আপনি হয়তো চাবেন না, কিন্তু অন্য লোকে বাঁচতে পেলে খুশিই হবে। এমন একটা বিশেষ ধরনের ওষুধ বেরিয়ে যাবে তখন...'

'ধুত্তোর, নিকুচি করেচে তোর ওষুধের... আগে মদের খোয়ারি ভাঙার এট্টা ওষুধ বার কর দিনি, তবে বুঝি। উঃ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়চে — মনে নাগচে মাথার ভিত্‌রি কে যেন ভোদ্‌কা চোলাই করতে নেগেচে।'

'তা, মদ না খেলেই পারেন।'

'আ মোলো, জাহান্নমে যা...'

দু'জনেই চুপ করে গেল এরপর।

আবার বই নিয়ে বসল ইউর্কা।

'"হেনো হবে, তেনো হবে" — যা নয় তাই বলতে থাকিস তুই,' বুড়ো ফের বকরবকর শুরু করল। 'নম্বা-নম্বা কথা বকতে পেলে আর কিছু চাস না। আচ্ছা, ধর্, এই তুই। ষোলটা বচ্ছর ধরে ন্যাকাপড়া করে যেতে হবে তোরে, আর তাম্পর যখন দেখবি এট্টা নোক মরোমরো হয়েচে তখন তুই তারে সোয়াস্তি দেয়ার জন্যে কী করতে পারবি ক'দিনি?'

"শরীরের ভিতর থেকে কোনো একটা জিনিস কেটে বাদ দোব।'

'তার যদি খাবি খাওয়ার সময় এসে থাকে তো কোন জিনিসটে কেটে বাদ দিবি তুই?'

'এরকম বোকার মতন প্রশ্নের জবাব হয় না।'

'জবাব দুবার কিছু নাই তাই বল্।'

'জবাব দোবার কিছু নাই?.. তাহলে এই লোকগুলি আছেন কী করতে?..' হাতের মধ্যে একবোঝা বই তুলে নিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করল ইউর্কা। 'এ'রাও জবাব দিতে পারেন না বলচেন? আপনি কি কোনোদিন এ'দের একজনের লেখাও পড়েচেন?'

'ওসব বই-পত্তরে আবার পড়বার আচে কী — সব তো মিথ্যে কথায় ঠাসা।'

'আচ্ছা, ঠিক আচে,' লাফিয়ে উঠে ফের ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল ইউর্কা। 'একসময় দেশে প্লেগ বলে একটা রোগ ছিল, কেমন তো?'

'তা ছেল বটে। সেই বিশ সালের দিকে...'

'কিন্তু রোগটা গেল কোথায়? এখন আর আচে কী?'

'রক্ষে কর বাবা! আবার ফিরত আসতেও তো পারে...'

'আমি ঠিক এইটেই বলতে চাচ্ছিলাম — রোগটা আর কখনও ফিরে আসবে না। কী করে রোগটা ঠেকাতে হয় আমরা তা শিখে ফেলেচি। আচ্ছা, আরেকটা উদাহরণ দেয়া যাক। ধরেন, আপনারে একটা পাগ্‌লা কুকুরে কামড়াল, তো কী হবে আপনার?'

'জলাতঙ্ক রোগ হবে, আবার কী।'

'হ্যাঁ, আর আগের দিন হলে এজন্যে আপনার মৃত্যু হোত। কিন্তু এখন চল্লিশটা ইঞ্জেকশন নিয়ে নিন, ব্যস, আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর কোনো ভয় থাকবে না। যক্ষ্মাকে একসময় ডাক্তারের অসাধ্য রোগ মনে করা হোত, তাই নয় কি? কিন্তু এখন? মাস-ছয়েক চিকিৎসার পর রুগী একদম সুস্থ-সবল! তা, এতসব রোগের চিকিৎসা মাথা থেকে বার করল কে? না, বিজ্ঞানীরা! আর আপনি বলচেন কিনা "মিথ্যে কথায় ঠাসা"... কিছুই বোঝেন না যখন, তখন ফোড়ন কাটেন কেন তা বুঝি না।'

ইউর্কার এই আক্রমণে বুড়ো রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে উঠল।

'আচ্ছা, ঠিক আচে। কুকুরের ব্যাপারটায় তোরই জিত, মানলাম। কিন্তু সাপের কামড়? তার বেলা? সেকালে তোর ডাক্তার ছেল কোথায়? ছেল না। কিন্তু ওঝাবুড়িরে ডাকলে দেখতি সে এসে বিড়বিড় করে ঝাড়ফুঁক করত আর দেখতে-দেখতে বিষ লেমে যেত। অথচ সে বুড়ি তো তোর কোনো ইশ্‌কুল-কলেজে পড়ে নাই, তবু।'

'তার মানে, ওসব ক্ষেত্রে সাপের কামড়টা মোক্ষম ছিল না বলে সাপে-কাটা লোক প্রাণে বেঁচে গেছে, আর কিছুই নয়।'

'যা না, সাপের কামড় মোক্ষম হয় কিনা একবার পরখ করে দ্যাখ্‌-না গিয়ে। সাপেরে একবার ছোব্‌লাতে দে দ্যাখ্‌-না কী হয়...'

'নিশ্চয়ই পারি! আগে একটা ইঞ্জেকশন নিয়ে সাপরে যত ইচ্ছে আমারে ছোব্‌লাতে দিতে পারি — কিচ্ছু হবে না। হাসতে-হাসতে পার পেয়ে যাব।'

'বড্ড দেমাক হয়েচে তোর! দেমাকে ভুঁয়ে পা পড়ে না দেখচি!'

'কিন্তু এই-যে লোকজনেরে দেখচেন এখেনে,' বইগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে ইউর্কা বলল, 'এনারা নিজেদের উপর সবকিছুর পরীক্ষা করেচেন! আপনি কি জানেন যে আচার্য পাভ্‌লভ যখন মারা যাচ্ছিলেন তখন ছাত্রদের কাছে ডেকে বসিয়ে নিজের মৃত্যুর আগের প্রতিটি স্তর আর তার লক্ষণ বলে-বলে যাচ্ছিলেন?'

'সে আবার কেমন করে হয়?'

'তিনি বলে যাচ্ছিলেন এইভাবে: "আমার পা ঠাণ্ডা হয়ে আসচে। কথাটা লিখে নাও।" ছাত্ররা লিখে নিল কথাটা। এরপর তাঁর দুই হাত অসাড় হয়ে গেল। ছাত্রদের তিনি বললেন, "আমার হাতদুটো অসাড় হয়ে গ্যাচে"।'

'আর তারা অমনি নিখে লিল কথাটা?'

'হ্যাঁ। তারপর তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে আসতে লাগল আর তিনি সেটাও ছাত্রদের লিখে নিতে বললেন। তারা কাঁদছিল সবাই, সে আর বলতে! তবু তারা লিখে নিল কথাটা।' বলতে-বলতে ইউর্কা টের পাচ্ছিল ওর নিজের চোখও জ্বালা করছে, জলে ভরে উঠছে। গল্পটা বুড়োকেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে বলল:

'তাম্পর?..'

'তারপর তিনি মারা গেলেন। কিন্তু মারা যাওয়ার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত সবকিছু লক্ষণ জানিয়ে গেলেন তাদের, কেননা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে এসবের দরকার ছিল। আর আপনি আপনার ওই ওঝাবুড়িদের নিয়ে আরও হাজার বছর আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চান... "আগের দিনে এমনটা ছেল, অমনটা ছেল! হেনো-তেনো!.." কিন্তু আগের দিনে কি এ-জিনিস কখনও দেখেচেন আপনি?' বলে ইউর্কা দেয়ালের কাছে গিয়ে রেডিও-র প্লাগটা সকেটে লাগিয়ে দিল। রেডিওয় একটি মেয়ের গান শোনা গেল। ইউর্কা বলল, 'মেয়েটি কোথায় আচে? এঘরে নাই নিশ্চয়, কী বলেন?'

'কে নাই?'

'এই-যে মেয়েটি... গান গাইচে যে।'

'আরে, গান তো তারের মধ্যি দে আসচে...'

'তারের মধ্যে দিয়ে নয়, রেডিও-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে! হুঃ, কী কথাই বললেন, "তারের মধ্যে দিয়ে"! তার তো ঝুলচে এখেনে, এই গাঁয়ে। কিন্তু মেয়েটা হয়তো গাইচে অনেক দূরে, সাখালিনে। তা, আপনি কি মনে করেন তারটা সাখালিন পর্যন্ত টানা হয়েচে?'

'তা হতে দোষ কী! এই তো গতবছর আমি ভান্‌কারে দেখতে গেছিলাম আর যাবার পথে সারা রাস্তায় খুঁটির মাথায় তার লটকানো আচে দেখলাম।'

ইউর্কা ঠিক করল, বৃথা চেষ্টা, তর্ক করে লাভ নেই।

বলল, 'আপনার সাথে কথা বলে লাভ নাই। আমারে হোমটাস্ক করতে হবে এখন।'

'তা, তাই কর্‌-না কেনে।'

'কিন্তু আপনি তো খালি আমারে খোঁচাতে থাকেন...' টেবিলের ধারে বসে দুই হাতে কানচাপা দিয়ে এবার পড়তে শুরু করল ইউর্কা।

এরপর অনেকক্ষণ কুঁড়েয় আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

অবশেষে বুড়ো শুধোল, 'ওনার একখান পট আচে নাকি তোর কাছে?'

'কার?'

'ওই-যে বিজ্ঞানী, যে মারা যাচ্ছিল।'

'আচার্য পাভ্‌লভ? এই তো তাঁর ছবি।'

বুড়োর হাতে একখানা বই তুলে দিয়ে তার মধ্যে পাভ্‌লভের ফোটোগ্রাফখানা দেখিয়ে দিল ইউর্কা। খুব মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছবিখানা দেখল বুড়ো। অবশেষে বলল:

'এ তো দেখচি বুড়াকালের ছবি।'

'কিন্তু একেবারে বুড়াবয়স পর্যন্ত তিনি সুস্থ-সবল ছিলেন, মদ খেয়ে কখনও মাতাল হতেন না... অন্য কারো-কারো... মতন।' বলে বইখানা ফিরিয়ে নিল ইউর্কা। 'তাছাড়া তিনি চুল্লির উপর শুয়ে সবারে গালমন্দ, খিস্তিখেউড় করতেন না। অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে শেষ দিনটি পর্যন্ত স্কিট্‌ল্‌স খেলে গেচেন। আর স্নায়ুর প্রতিবর্তী ক্রিয়া দেখানোর জন্যে কত-যে কুকুরের উপর অপারেশন করেচেন তিনি তার ঠিক-ঠিকানা নাই!.. তাঁরই দয়ায় স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে এতকিছু আমরা জানতে পেরেচি। আচ্ছা, বলেন তো, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েচেন কেন?'

'কেনে আবার? খোয়ারির লেগে। পাভ্‌লভের সাহায্য ছাড়াও এয়া বুইতে কষ্ট হয় না।'

'হ্যাঁ, খোয়ারি ঠিকই, তবে কী জানেন, গতকাল আপনি স্নায়ুতন্ত্রের দফারফা করে পিষে মেরেছিলেন, মদে চুবিয়ে দিয়েছিলেন তারে, আর আজ তা... ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠচে। আপনার স্নায়ুতন্ত্রে, যারে বলে, একটা শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্ম হয়েচে। যেই আপনি পেন্সনের টাকাটা ওঠান অমনি আপনার একবোতল ভোদ্‌কা চাই-ই। ঠিক সেই সময়টায়

ভোদ্‌কা ছাড়া চলে না আপনার।' মদ-যে বুড়োর কতখানি ক্ষতি করছে সেই ব্যাপারটা এত শান্ত আর জোরালোভাবে ওর কাছে প্রমাণ করতে পেরে ইউর্কা এক ধরনের একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ও দেখল, বুড়ো ওর কথা মন দিয়ে শুনছে। 'তাহলে আপনার কী করা উচিত? আপনার উচিত এই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা। পোস্ট-অফিস থেকে আপনি পেন্সনের টাকাটা তোলেন। তারপর বাড়ির দিকে রওনা হন... কিন্তু আপনার পা-দুটো আপনারে টেনে গাঁয়ের দোকানটার দিকে নিয়ে যায়। কাজেই আপনার যা করা উচিত তা হল সোজা হেঁটে দোকানটা পার হয়ে চলে আসা। কিংবা একেবারে অন্য কোনো রাস্তা ধরে বাড়ি আসা।'

'তাতে আমার মন-মেজাজ আরও বিগড়ে যাবে।'

'আপনার মন-মেজাজ একবার, দু'বার, বড়জোর তিনবার বিগড়োবে, তারপর সয়ে যাবে সবকিছু। তখন গাঁয়ের দোকানের সামনে দিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে আসতে পারবেন আর মদ কেনার কথা ভেবে হাসি পাবে আপনার।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে বুড়ো এবার অল্প-একটু উঠল, তারপর কাঁপাকাঁপা হাতে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে সেটা ধরাল। তবে সিগারেটে একটা টান দিয়েই কাশতে শুরু করল বুড়ো।

'ওহ্, ধুত্তোর নিকুচি করেচে শালার...। উঃ!.. নাস্তানাবুদ করে তুলচে শরীলটারে। হায়-হায়, মরতে চলেচি আমি!'

ইউর্কা আবার বই নিয়ে বসল।

ভোঁসভোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে চুল্লির ওপর থেকে বুড়ো নেমে এল। তারপর বুট পায়ে দিয়ে, ভেড়ার চামড়ার কোটটা গায়ে চাপিয়ে একখানা ছুরি হাতে নিল। অবশেষে বেরিয়ে গেল ঢাকা-বারান্দাটায়।

অবাক হয়ে ইউর্কা মনে-মনে ভাবল, 'কোথায় চলল বুড়ো কে জানে?'

অনেকক্ষণ কেটে গেল বুড়ো তবু ফেরে না। ইউর্কা ভাবছে ছুরি হাতে নিয়ে বুড়ো কোথায় উধাও হল তা একবার খোঁজ করে দেখবে, এমন সময় হাতের তেলোর মতো বড় একদলা শুয়োরের চর্বি নিয়ে ফিরল বুড়ো।

ফিরে কড়াসুরে শুধোল, 'খাবার মতন রুটি আচে তোর?'

'আচে। কেন?'

'তাইলে এইটে ধর্। রুটির সাথে খানিকটে চর্বি খা দিনি, নইলে

ও তোর আচায্যিমশাইদের পুথিপত্তর পড়ে শেষ করে ওঠবার আগে শরীলটে ভেঙে যাবে অখন।'

এই অযাচিত দাক্ষিণ্যে বিমূঢ় হয়ে কী-যে বলবে ভেবে পেল না ইউর্কা।

'কিন্তু আমি তো আপনারে শুধতে পারব না। আমাদের ঘরে শুয়োরের মাংস নাই...'

'আরে খা, খা। অ ছেলে, দ্যাখ্ দিনি চুল্লির ভিত্‌রি এট্টা চায়ের কেট্‌লি বসানো আচে। মনে লিচ্চে, এখনও গরম আচে কেট্‌লিটে... সব লিয়েথুয়ে ভালো করে খাওয়াদাওয়া কর্ দিনি।'

চুল্লির ভেতর থেকে চায়ের কেট্‌লিটা বের করে তখনও গরম আছে এমন চা একমগ ঢেলে নিল ইউর্কা। তারপর রুটি আর চর্বি টুকরো করে কেটে নিয়ে খাওয়া শুরু করল। ওদিকে বহুকষ্টে বুড়ো চুল্লির ওপরকার বিছানায় উঠে বসে সেখান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে ইউর্কাকে দেখতে লাগল।

'চর্বিটে নাগচে কেমন?'

'ভেরি ওয়েল!' ইংরেজি ভাষায় জবাব দিল ইউর্কা। 'একদম ফার্স্টক্লাস!'

'শোররে কীভাবে খাইয়েদাইয়ে পুরুষ্টু করতে হয় তা জানা নাগে, বুইলি! কিছু নোক আচে বিলকুল গবা, তারা শরৎকাল থেকেই শোররে পেট পুরে খাওয়ানো শুরু করে। ফলটা হয় এই যে শোরের গায়ে মাসের নামগন্ধ নাগে না, জমে খালি চর্বি। আবার আরও কিছু নোক আচে যাদের আচরণটে ভেন্নপ্রেকার — তারা শোরগুলারে উপাস দিইয়ে মারে যাতে তাদের গায়ে মাস নাগে বেশি করে। সকলে তো আর চর্বি পছন্দ করে না তাই আর-কি। কিন্তু তাপ্পরে যখন শোর জবাই করে তারা, তখন না-পায় চর্বি না-পায় মাস। আসলে কাজটে যা করতে হয় তা হল, শোরেরে একহপ্তা পেটপুরে খেতে দিতে নাগে, তাপ্পর এট্টু আলগা দিতে হয় — মানে খেতে দিতে নাগে আধপেটা, তাপ্পর ফের একহপ্তা পেটপুরে খাওয়ানো নাগে, আবার হপ্তাখানেক আলগা দিতে হয়, এমনি ধারা চালাতে হয় আর-কি... তাইলে পাওয়া যায় পরতে-পরতে থাক-থাক চর্বি আর মাস, এক-পরত চর্বি, তাপ্পর এক-পরত মাস। তাছাড়া নুনে মাংস জারানোরও কায়দাকানুন আচে ঢের।'

শুনতে-শুনতে ইউর্কা বরফে-জমানো রুচিকর চর্বির টুকরোগুলোয় কামড় বসাচ্ছিল। চর্বিটা সত্যিই ভারি স্বাদু ঠেকছিল তার।

'ভারি চমৎকার খেতে। অনেক ধন্যবাদ।'

'কী পেট ভরেচে?'

'হুঁউ খুব!' রুটির বাকি অংশ আর কেট্‌লিটা টেবিলের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলল ইউর্কা। তখনও কিছুটা চর্বি থেকে গিয়েছিল। 'এটুক রাখি কোথায়?' শুধোল ইউর্কা।

'বাইরির ঢাকা-বারান্দায় পিপা'র উপর রেখে দে গিয়ে। তাইলে সাঁঝবেলাতেও খেতে পারবি চর্বিটুক।'

চর্বিটুকু ইউর্কা বাইরের ঢাকা-বারান্দায় নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে পেটে থাবড়া মেরে খুশির সুরে বলে উঠল, 'এখন আমি আরও ভালো করে ভাবতে পারব।... সারাক্ষণ... একটানা এভাবে বসে থাকতে-থাকতে কেমন মাথা-ঝিমঝিম করে।'

'তা যা বলেচিস,' খুশি হয়ে বলল বুড়ো, তারপর ফের চিত্‌ হয়ে শুয়ে পড়ল। 'ওহ্‌-হো! শালার নিকুচি করেচে!.. বিছনায় কাত হলেই যন্তন্নাটা ফের চাগিয়ে ওঠে দেখচি।'

'চট করে গিয়ে আপনার জন্যে আধ-বোতল ভোদ্‌কা কিনে আনব?' ইউর্কা শুধোল।

জবাবে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না বুড়ো। পরে বলল:

'ও কিছু না... ঠিক হয়ে যাবে অখন। এট্টু পরে তুই মুরগিগুলারে ক'মুঠা গমের দানা ছইড়ে দিতে পারিস আর গোরুটারে সেইসাথে কাঁটা-দুই খড়ও দিয়ে দিস। তবে আসার সময় খোঁয়াড়ের আগড়টা ভেজিয়ে দিতে ভুলিস নে যেন।'

'ঠিক আচে। আচ্ছা, এখন তাহলে বাকি রইল কী? না, ভূগোল। ও তো দুই তুড়িতে শেষ করে ফেলব।' মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছে ইউর্কার। খাওয়াদাওয়াও জুটেছে ভালো, হোমটাস্কও প্রায় শেষ। বিকেলবেলায় আজ তাহলে স্কি করতে যেতে পারবে ও।

'আর ওনার জ্ঞাতগুষ্টি, ছেলেপিলে? ওসব কিছু ছেল না তেনার?' কোত্থাও কিছু নেই হঠাৎ বুড়ো দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল।

'কার?'

'ওই-যে আচায্যিমশাইয়ের। ওনার কি খালি ছাত্তরই ছেল নাকি?'

'ও, পাভ্‌লভের কথা বলচেন? বোধহয় ওনার আত্মীয়স্বজনও ছিল, তবে আমি ঠিক জানি না। আচ্ছা, কাল ইশ্‌কুলে স্যাররে শ‍ুধিয়ে নোব।'

'নিচ্চয় ওনার ছেলেপিলেও ছেল, নয় কি?'

'ছিল বোধহয়। কাল জেনে নোব'খন।'

'নিচ্চয় ছেল। মরার সময় জ্ঞাতগ‍ুষ্টি চারদিক ঘিরে না-থাকলে অমন সব নক্ষণের কথা ম‍ুখ দে বের‍ুত নাকি ভেবেচিস! একা থাকার বড্ড কষ্ট।'

ইউর্কা ঠিক করল, আর তর্ক করবে না। নইলে ও জিজ্ঞেস করতে পারত, কেন — ছাত্ররা তো কাছে ছিল ওঁর! কিন্তু এ-নিয়ে আর কথা বাড়াল না।

শ‍ুধ‍ু সায় দিয়ে বলল, 'তা সত্যি, একা থাকার বড্ড কষ্ট।'



অন্তঃসার

শহর থেকে (বলা যায়, শহরের ফ্যাশন-ভবন থেকে) একদল অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে ক্রাস্‌নি ইয়ার গাঁয়ে এসে হাজির হল। উদ্দেশ্য — একটা ফ্যাশন-শো'র অনুষ্ঠান করা।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মের গোড়ার দিক। লালরঙের বাসটা গাঁয়ের রাস্তা ধরে এসে ক্লাব-বাড়িটার সামনে থামল। ঝলমলে পোশাক-পরা একদল মেয়ে আর নানারকম বাজনা-হাতে গুটিকয়েক অল্পবয়সী ছেলে বাস থেকে নামল।

ক্লাবের ম্যানেজার ইলিয়া দেগ্‌তিয়ারিয়োভ লোকটা যেমন অলস তেমনি ধূর্ত। ফ্যাশন-শো'র দলটাকে অভ্যর্থনা জানাতে সে উপস্থিত ছিল ক্লাবের সামনে। অভ্যর্থনা জানাবার পর দলটাকে সে নিয়ে চলল সেইসব বাড়িতে যেখানে তাদের ভাগ-ভাগ করে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ক্লাব বা স. ভ. (সংস্কৃতি ভবনের সংক্ষিপ্ত নাম)-এর বাইরে নোটিশবোর্ডে লট্‌কানো ছিল একটা ঘোষণাপত্র। প্রসঙ্গত বলি, দেগ্‌তিয়ারিয়োভ ক্লাব-বাড়িটাকে 'সংস্কৃতি ভবন' বলার জন্যে জিদ করে থাকে। যাই হোক, ঘোষণাপত্রটি এইরকম:

বিশেষ ঘোষণা!

আজ স. ভ.'য় তরুণতরুণীদের বসন্ত ও গ্রীষ্মঋতুর পোশাকের এক ফ্যাশন-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।
প্রদর্শনী শুরু হইবে রাত্রি ৯টায়।
পরে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইবে।
প্রদর্শনীর জন্য প্রবেশমূল্য লাগিবে না।

প্রদর্শনী-অনুষ্ঠানে বহু লোক এল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মেয়ে। শুরুতে দেগ্‌তিয়ারিয়োভ তার স্বভাবসিদ্ধ বক্তৃতা ঝাড়লে।

বললে, 'আজকের এই আশ্চর্য ও প্রশংসনীয় নানা কীর্তিকলাপের দিনে এবং এই যুগে আমাদের সকলেরই সুসজ্জিত হয়ে থাকা দরকার, কমরেডস! অথচ এটা কিছু গোপন কথা নয় যে আমরা কখনও-কখনও এসব ব্যাপারে মনোযোগ দিই না। তাই আজ শহরের ফ্যাশন-ভবনের কর্মীরা লঘু শিল্পের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্যের নিদর্শন আমাদের সামনে তুলে ধরবেন।'

দেগ্‌তিয়ারিয়োভ বক্তৃতায় ইতি টানল এই বলে:

'আগে এমন একটা সময় হয়তো ছিল যখন ব্যঙ্গের সুরে কিছু-কিছু লোক সন্দেহ প্রকাশ করে বলত, "রাশিয়াকে একবার সংস্কৃতিমান করে তোলার চেষ্টা করে দ্যাখো না!" আজ কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি, "হ্যাঁ, কমরেডস, গ্রামে-গ্রামে সংস্কৃতির উচ্চ মানের আমরা ধারকবাহক!"'

এরপর আগন্তুক ছোকরারা তাদের বাজনার যন্ত্রপাতি নিয়ে স্টেজের ওপর উঠে এল, তারপর অর্ধচন্দ্রের আকারে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কী-একটা হাল্‌কা উচ্ছল সুর বাজাতে লাগল। এমন সময় চমৎকার রুপোলি-শাদা পোশাক-পরা একটি মেয়ে স্টেজে উঠে লীলায়িত ভঙ্গিতে স্টেজের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে চলে গেল, দর্শকদের দিকে চেয়ে মিঠে হাসল, তারপর ফের ওপাশ থেকে এপাশে হেঁটে এল।

একটি শাদাসিধে চেহারার মাঝবয়সী মহিলাও স্টেজে উপস্থিত ছিলেন, তবে এ-পর্যন্ত তাঁর দিকে কারও নজর পড়ে নি। তিনি এবার ধারা-বিবরণী দিতে শুরু করলেন: 'এটি একটি আনুষ্ঠানিক সান্ধ্য গাউন। যদিও স্টাইলের বিচারে মোটের ওপর সহজ-সরল, তবু দেখতেই পাচ্ছেন নজর কাড়ার মতো কতখানি কার্যকর পোশাকটি।'

ইতিমধ্যে সান্ধ্য গাউন-পরা মেয়েটি স্টেজের ওপর একবার এদিক একবার ওদিক করে হাঁটতে থাকল আর হাসতে থাকল মিটিমিটি। বাজিয়েরাও বাজনা বাজিয়ে চলল, বিশেষ করে ড্রাম-বাজিয়েটি হাতের কাঠিদুটোর নানারকম ভোজবাজি দেখিয়ে আর পায়ে তাল দিতে-দিতে মহা-উৎসাহে বাজাতে থাকল। অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়েও পায়ে তাল দিচ্ছিল, গীটার-বাজিয়েও করছিল তদ্রূপ।

রুপোলি পোশাক-পরা মেয়েটি স্টেজ ছেড়ে যেতে-না-যেতেই অন্য ধরনের পোশাক-পরা অপর একটি মেয়ে এসে উদয় হল স্টেজে। দেখা গেল এই মেয়েটি আরও অল্পবয়সী, রোগা-ছিপছিপে আর তার ছোট্ট ঠোঁটদুটি

টুকটুকে লাল। এটিও ছোট-ছোট পা ফেলে স্টেজময় ঘুরঘুর করতে লাগল আর স্টেজের প্রান্তে পৌঁছে বোঁ-করে ঘুরে দাঁড়াতে লাগল। ওর এই ঘুরপাক খাওয়াটা দেখতে এত মনোরম ঠেকছিল যে হলসুদ্ধ লোক প্রশংসায় ভন্‌ভনিয়ে উঠছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য শোনা গেল:

'এই-যে পোশাকটি দেখছেন এটি রোজকার ব্যবহার্য। খুবই আরামদায়ক আর শস্তাদামের এটি। সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানেও এ-পোশাক পরা যেতে পারে।'

ভিনোকুরভরা দুই ভাই দর্শকদের একেবারে প্রথম সারিতে বসে ছিল। সবকিছু চমৎকার দেখতে পাচ্ছিল তারা।

বড়ভাই ইভান হাতখানা পাশের সিটের পিঠের ওপর ঘুরিয়ে রেখে বসে ছিল। প্রথম দিকে অনুষ্ঠানটা দেখছিল সে কিছুটা অবজ্ঞাভরেই। কিন্তু বাজনার সুর ক্রমশ যত উচ্ছল হয়ে উঠতে লাগল এবং অন্য নানারকম পোশাক-পরা অন্যান্য মেয়ে স্টেজে আসতে লাগল যতই, ইভানও তত সিটের ওপর খাড়া হয়ে বসল।

ওর ছোটভাই সের্গেই কিন্তু একেবারে নিথর হয়ে বসে ছিল। সারাক্ষণ মেয়েদের লক্ষ্য করছিল সে।

শাদাসিধে নাবিক-নীল পোশাক-পরা গোলগাল, ছোটখাট, হালকা সোনালি চুলওয়ালা একটি মেয়ে এমন সময় স্টেজে উঠল। তারপর এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াতে লাগল।

'এই পোশাকটি স্নানের পক্ষে খুবই উপযোগী। অত্যন্ত সহজে এটি খুলে ফেলা যায়...।'

গোলগাল চেহারার মেয়েটি ঠিক ওই দুই ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে জামার বোতাম খুলতে শুরু করল। দেখে ইভান হাঁটু দিয়ে এক গুঁতো লাগাল সের্গেইকে। সের্গেই কিন্তু নড়ল-চড়ল না।

ওপরের পোশাকটা খুলে ফেলে মেয়েটি এবার স্টেজের এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল সুদ্ধু একটা স্নানের পোশাক পরে।

আর সারা হল একেবারে চুপটি করে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

মেয়েটি হাসল, তারপর পোশাক পরে স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ইলিয়া দেগ্‌তিয়ারিয়োভ (ও বসে ছিল সামনের সারিতে, মাঝের যাতায়াতের পথের পাশে) এইসময় একবার ফিরে তাকাল, মুখখানাকে যথাসম্ভব কঠিন করে দর্শকদের নিরীক্ষণ করল একবার, তারপর কিছু-একটা

চিন্তা করে হাততালি দিতে শুরু করল। কেউ-কেউ ওর সঙ্গে হাততালিতে যোগ দিল বটে, তবে কিছুটা কুণ্ঠিতভাবে। অনেকেই মনে করল যে এটা হাততালি দেয়ার ব্যাপার নয়।

এরপর কয়েকজন ছোকরাও ফিটফাট, কেতাদুরস্ত স্যুট চড়িয়ে স্টেজে এল আর হাসি-হাসি মুখে এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াল।

সবশেষে একটা ফিল্ম দেখানো হল।

ক্লাবঘর থেকে দুই ভাই বেরিয়ে এলে পর ইভান প্রদর্শনীর মডেলদের নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

বলল, 'যদি আমার মত চাস তো বলি, এসব নিয়ে মাথা ঘামানো নিছক সময় নষ্ট ছাড়া কিছু না।' ইভান শহরে থাকে। মাঝে-মাঝে ছুটিছাটায় গাঁয়ে বেড়াতে এসে খালি নাক তুলে-তুলে কথা কয় আর সব ব্যাপারে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করে। মোট কথা, নিজেকে একজন জ্ঞানীগুণী লোক হিসেবে জাহির করতে ইদানীং সে সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সে বলে, 'এদের কাজ-কারবার সব অগভীর ব্যাপার নিয়ে। কোনো অন্তঃসার নেই এ-সবের।'

'আরে, ছাড়ান দাও তো,' সের্গেই আপত্তি জানাল। দাদার পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা কিছুতেই সহ্য হয় না ওর। 'দ্যাখো-না, ক'দিনের ভিতরিই ওদেরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দেবে নিজে।'

'আমি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমিই।'

'প্রথম কথা, ওদের একজনকেও পছন্দ নয় আমার — বড্ড বেশি শুঁট্‌কি, হাড়্‌গিলে,' বলল ইভান। 'তবে সবচেয়ে বড় কথা, কোনো অন্তঃসার নেই এ-সবের।'

'ধুত্তোরি, যত্তোসব! ওদের অন্তঃসার নিয়ে আমার দরকারটা কী?' খেপে উঠল সের্গেই।

বড়ভাই এবার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল, 'যাঃ বাবা, ল্যাও ঠেলা! আচ্ছা, সের্গেই তোর ব্যাপার কী বল্‌ তো?.. হল কী তোর?'

'কেন? তোর কী মনে হয়?'

'অন্তঃসারই হল আসল কথা, বুঝলি?' ইভান বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল। 'অন্তঃসারহীন মেয়েমানুষ — সে তো — জানি না কী বলা চলবে তাকে — সে তো দুঃস্বপ্ন, বিভীষিকা!'

'আরে, বাদ দাও দিনি ওকথা,' বিড়বিড়িয়ে বলল সের্গেই।

বাড়ি ফিরে দু'ভাই দ্যাখে, অবাক কাণ্ড! গুটি-দুই মডেল-মেয়েকে ঠাঁই-দেয়া হয়েছে ওদেরই বাড়িতে। বাপ কুজ্‌মা ভিনোকুরভের কাছ থেকে প্রথম খবরটা শুনল দু'জন। কুজ্‌মা বার-বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিলেন। বললেন, 'গোটা-দুই ছুঁড়িরে আমাদের বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করে দেচে ওরা। কাল পর্যন্ত থাকবে।'

শুনে দুই ভাই পরস্পর তাকাতাকি করল।

'ওই যারা সন্ধেবেলায় ক্লাবে এসেছিল? শহর থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'দ্যাখো কাণ্ড!..' একটু যেন বিভ্রান্ত বোধ করল ইভান। 'তা কোন ঘরে আচে ওরা?'

'বসবার ঘরে।'

বারান্দার সিঁড়িতে বসে পড়ে সের্গেই একটা সিগারেট ধরাল।

'ওদের সঙ্গে দেখা করবি নাকি, সের্গেই?' ইভান শুধোল।

সের্গেই জবাব দিল না।

'কী? কিছু বলচিস না-যে?'

'কী হবে?'

'কী আবার হবে, এমনি দেখা করব... চল্‌-না?'

'ঢোকবার আগে দরজায় টোকা দিয়ে নিস কিন্তু — বলা যায় না, হয়তো পোশাক বদলাচ্চে এখন,' আগে থাকতে বাপ ওদের সাবধান করে দিলেন। বললেন, 'নইলে হয়তো ওদের ব্যাঘাত ঘটিয়ে বসতে পারিস।'

সিগারেটটা চেপে নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সের্গেই।

'দেখা করে কী বলব আমরা?'

'শুভ সন্ধ্যা-টন্ধ্যা বলব আর-কি...। একটু আড্ডা দেয়া যাবে।'

বাড়িতে ঢুকে ভেতর-বারান্দায় রাখা বড় দেরাজটা থেকে নতুন একটা শার্ট বের করে পরে নিল সের্গেই।

দাদাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'সাবধানে কথাবাত্তা বলিস। বেশি গায়ে-পড়া ভাব দেখাস নে যেন।'

একান্ত করুণাভরে একটু ভুরু কোঁচকাল ইভান।

'চুপ কর্‌ দেখি, সের্গেই। এর চেয়ে ঢের বড়-বড় ব্যাপার সামলেচি, বুইচিস।'

বসবার ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে সের্গেই মাথা ঝোঁকাল। বলল:

'আচ্ছা, দেখা যাবে...।'

ইভান দরজায় টোকা দিল।

'ভেতরে আসুন!'

ঘরে ঢুকল দু'ভাই।

'শুভ সন্ধ্যা!' সজোরে কথাটা বলে দরজাতেই থমকে দাঁড়াল ইভান।

সের্গেই ফাঁপরে পড়ে গেল। দাদার পেছনে আটকা পড়ে ওর অবস্থাটা দাঁড়াল বেকুবের মতো — না-পারে এগুতে, না-পারে পেছুতে। ঘরে ঢোকার পথটা আগলে রেখেছে ইভান, অথচ মেয়েরা ওকে দেখে ফেলায় পিছিয়ে যাওয়াও একই রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অতএব ও-ও সজোরে 'শুভ সন্ধ্যা' বলে উঠল, তারপর ইভানের পিঠে লুকিয়ে একটা খোঁচা লাগাল। কিন্তু ইভান একেবারে নট-নড়নচড়ন!

মেয়েরা ওদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'আমরা এ-বাড়িতেই থাকি,' কথাটা জানিয়ে দেয়া দরকার বোধ করল ইভান।

'তাই নাকি? তা, কিছু অসুবিধে হয়েছে কি?.. আপনাদের ঘরটা আমরা দখল করেছি নাকি?'

'না-না, মোটেই না!' বলে ইভান ঘরের মধ্যে এগুল। 'যতদিন ইচ্ছে থাকুন-না এখেনে।'

সের্গেইও পেছন-পেছন ঢুকল। অস্বস্তিতে, লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল ও।

মেয়েদের মধ্যে একজন — সন্ধেবেলা স্টেজের ওপর সেই স্নানের পোশাক পরে ঘুরে বেড়িয়েছিল যে — আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল আঁচড়াচ্ছিল। অপরজন টেবিলের ধারে বসে লম্বা, সরু-সরু আঙুল দিয়ে টেবিল-ক্লথের ধারগুলো মোচড়াচ্ছিল।

'তা, এখেনে কেমন লাগচে আপনাদের?' ইভান জিজ্ঞেস করল। 'খুব খারাপ না তো?'

'কোন দিক থেকে?' চুল আঁচড়াচ্ছিল যে-মেয়েটি সে ঘুরে ওর দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল। তারপর হাসল।

'এই, অসুবিধে-টিধে হচ্চে না তো কিছু?'

'না-না, সব ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

ইভানও হাসল এবার। তারপর একটা বেঞ্চিতে বসল। আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে সের্গেইও দাদার পথ অনুসরণ করল।

আর কী বলা উচিত ভেবে না-পেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বসে রইল ইভান। সের্গেইও দেখাদেখি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। আর কিছু করার না-পেয়ে পকেট থেকে ছোট একখানা ছুরি বের করে ছুরির ফলাটা খুলে তার ওপর নিজের বুড়ো আঙুলটা ঘষতে লাগল। ভাবখানা এমন যেন ধার পরীক্ষা করছে।

লম্বা, সরু আঙুলওয়ালা মেয়েটি হঠাৎ জোরে হেসে উঠল:

'আপনারা এঘরে এজন্যেই এসেছেন নাকি — আমাদের গলা কাটতে?'

শুনে খুকখুক করে হেসে ইভান ভাইয়ের দিকে তাকাল।

লাল হয়ে উঠল সের্গেই। ছুরির ফলাখানা নিজের ট্রাউজার্সের গায়ে মুছতে লাগল।

'চাইলে তা-ও পারি,' অস্পষ্ট স্বরে ঘোঁত্ঘোঁত করে বলল ও, আর বলতে গিয়ে আরও লাল হয়ে উঠল।

'এই ক'দিন আগে, আমি শহর ছাড়ার ঠিক আগটাতে, একজন ছুরি খেয়েছিল,' ইভান বলল। 'আমাদের খনিরই মজুর-ছেলে একজনা...। রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল এমন সময় সে কাছে এগিয়ে এসে ছুরি মারল ওরে — ঠিক এইখেনটায়। ছুরি খেয়ে ও তো উবু হয়ে পড়ল। তা সে বললে, "অমন হেঁট হয়ে রয়েচ কেনে? খাড়া হয়ে দাঁড়াও!" কিন্তু ওর তখন এত যন্তন্না হচ্চে...'

'ঠিক বুঝলুম না। কে কাকে কথাটা বললে?' প্রদর্শনীতে স্নানের পোশাক পরে বেড়িয়েছিল যে মেয়েটি সে শুধোল। এর মধ্যে তার চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল। এখন টেবিলের ধারে বসে সকৌতুকে দুই ভাইকে দেখছিল সে।

ইভান বুঝল, ভুলভাবে ভুল গপ্পোই ফেঁদে বসেছে সে।

'ছেলেটারে যে ছুরি মেরেছিল সে-ই বলেছিল কথাটা,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে বাধ্য হল সে।

সের্গেই ছুরিখানা চুপিচুপি পকেটে পুরে ফেলে এবার দাদার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাল।

ভাবল, যেমন দাদা, তার তেমনি সব গপ্পো!

'আপনি কি খনিতে কাজ করেন?' লম্বা, ছিপছিপে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল এবার।

'হ্যাঁ।'

'কী? একেবারে মাটির নিচে?'

ইভান হাসল।

'তাছাড়া কোথায় করব, বলেন?'

'কাজটা খুব কঠিন বুঝি?'

'না-না, তেমন আর কী! প্রথম মাসখানেক কি মাসদুই একটু কঠিন ঠেকে। তারপর সয়ে যায় সব। রাত্রের শিফ্‌ট অবিশ্যি কষ্টকর। এছাড়া যারা বিড়ি-সিগ্‌রেট খায় তাদের পক্ষে কষ্টকর, সিগ্‌রেট খাওয়া নিষেধ তো — তাই।'

'কেন? সিগ্‌রেট খাওয়া বারণ কেন?'

'খনির ভিত্‌রি গ্যাস থাকে বলে। প্রথম-প্রথম একটু কষ্ট হোত, পরে আমি ছেড়ে দিলাম।'

'কী ছেড়ে দিলেন? সিগ্‌রেট খাওয়া?'

'হ্যাঁ।'

কথাবার্তা কিছুতেই চালানো যাচ্ছিল না। গোলগাল চেহারার মেয়েটির-যে একঘেয়ে ঠেকছে তা সে লুকোচ্ছে না। থেকে-থেকে সে হাই তুলছে আর হাতের ছোট্ট পাতাটা দিয়ে মুখ ঢাকছে। একবার ঘড়ির দিকে তাকাল সে। বন্ধুকে বলল, 'ওরা আসতে অনেক দেরি করছে তো।'

অন্য মেয়েটিও ঘড়ি দেখল এবার।

'এক্ষুনি এসে পড়বে মনে হয়।'

গোলগাল ছোটখাট চেহারার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল সের্গেই। সে-ও ওর দিকে তাকাল একবার। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে সের্গেই ভুরু কোঁচকাল।

'আপনিও কি খনির নিচে কাজ করেন?' মেয়েটি শুধোল।

সের্গেই মাথা নাড়ল।

'না, ও মোটর-ড্রাইভার,' ইভান বলল। তারপর দাদারা সবসময়ে ছোট ভাইদের দিকে যেভাবে তাকায় সেইভাবে ভাইয়ের দিকে তাকাল। অর্থাৎ, তাদের বোকামির জন্যে যেন খানিকটা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে, আবার স্নেহভরেও। বলল, 'ওই-যে দেখচেন ওর "মাদীঘোড়াটা" দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার কাছে। আমিও এককালে ড্রাইভারি করতাম, এখন ছেড়ে দিয়েচি।'

'কেন?'

'ও আমার পোষায় না।'

'সত্যিই কি তাই?'

'কী ব্যাপার? আপনেরা কি কাউর আসার অপেক্ষা করচেন?' সের্গেই শুধোল।

'আমাদের কিছু ছেলের আসার কথা,' লম্বা, ছিপছিপে মেয়েটি জবাব দিল।

'অ!' বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল ইভান। 'সৌভাগ্যের কথা।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা, আমি এট্রা ম্যাজিকের খেলা জানি,' হঠাৎ বলে উঠল সের্গেই, তারপর গোলগাল ছোটখাট মেয়েটির চোখেচোখে তাকাল।

মেয়েদুটি এবার পরস্পর তাকাতাকি করল।

'ও, তাই বুঝি? তা, খেলাটা কী?'

'আচ্ছা, এট্রা সাধারণ রুমাল নেয়া যাক...' রুমালের খোঁজে সের্গেই এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে পেল না কিছুই, অবশেষে দাদার কাছে রুমাল চাইল। দাদাও পকেট হাতড়াল, কিন্তু রুমাল খুঁজে পেল না।

'নাঃ, রুমাল নাই।'

ছোটখাট গোলগাল মেয়েটি এবার মুখে হাত চাপা দিয়ে খিকখিক করে হেসে উঠল।

সের্গেই ওর দিকে তাকাল, স্বভাবসিদ্ধ লাজুক-লাজুক, বন্ধুত্বে-ভরা হাসি দিয়ে ওর হাসির জবাব দিল, তারপর সহজভাবে বলল, 'যাই, একখান রুমাল নিয়ে আসি।'

ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে একখানা রুমাল নিয়ে ফিরল সে। তারপর হাতের চওড়া তেলোর ওপর রুমালখানা বিছোল।

'দেখচেন?'

'কী দেখব?' ইভান শুধোল।

'রুমালটাতে কিচ্ছু নাই। নয় কি?'

মেয়েদুটিও এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'না, কিছু নেই। তারপর?'

'চুপ! শান্ত হয়ে থাকেন সবাই!' মনে হল, হঠাৎ সের্গেই যেন বিষম সাহসী হয়ে উঠেছে। 'এবার আমি এট্রা ম্যাচ-কাঠি নিলাম আর এটা এখেনে রাখলাম...। দেখচেন?' দেশলাই-কাঠিটা রুমালের ওপর রাখল সে। 'দেখচেন সবাই?'

'তারপর?'

'এই দেখেন রুমালখান পাট করচি আমি...,' দেখিয়ে-দেখিয়ে সযত্নে রুমালখানার চারটে কোণ ভাঁজ করে রাখতে লাগল সের্গেই, প্রতিটি কোণ রুমালের মাঝখানে অন্য কোণগুলের সঙ্গে মুখোমুখি ঠেকিয়ে। তারপর একে-একে প্রত্যেককে রুমালের মধ্যে মোড়া দেশলাই-কাঠিটা অনুভব করতে দিল। শুধোতে লাগল, 'ম্যাচ-কাঠিটে টের পাচ্চেন তো?'

'হ্যাঁ, কাঠিটা আছে,' ছোটখাট মেয়েটি বলল (সের্গেই তাকেই প্রথম কাঠিটার অস্তিত্ব পরীক্ষা করতে দিয়েছিল)।

'হ্যাঁ, আছে,' লম্বা, ছিপছিপে মেয়েটি বলল।

'হ্যাঁ, আচে,' বলল ইভানও। অবাক হয়ে ও ভাইয়ের রকমসকম দেখছিল। ভাইয়ের কাছে এতখানি চালাকচতুর, চটপটে ভাব ও আশা করে নি।

'আচ্ছা, এখন কাঠিটে ভাঙেন দেখি!' সের্গেই এবার নির্দেশ দিল। ছোটখাট মেয়েটিকেই কাঠিটা ভাঙতে দিল সে। রুমালে-মোড়া দেশলাই-কাঠিটা ঠুকে-ঠুকে ভাঙল মেয়েটি আর সের্গেই ততক্ষণ খুশি-খুশি মুখ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী? ভাঙা হল?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আমি একবার পরীক্ষা করে দেখি তো,' ইভান বলল।

'নিচ্চয়।'

ইভান পরীক্ষা করে দেখল।

'কী? ভাঙা হয়েচে?'

'হয়েচে।'

সের্গেই এবার রুমালের মোড়কটা খুলে ফেলল, আর সবাই দেখল দেশলাই-কাঠিটা অটুট, নিটোল রয়ে গেছে তার মধ্যে। দেখে সকলের তাক লেগে গেল। আর হাসতে লাগল সের্গেই।

'আবার একবার দেখান! দেখান-না আরেকবার!' ছোটখাট, গোলগাল মেয়েটি মিনতি করে বলতে লাগল।

'আবার? আচ্ছা, ঠিক আচে।'

বলে সের্গেই কয়েক মিনিটের জন্যে বাড়ির ভেতরকার বারান্দায় গেল, তারপর ফিরে এল।

'ওখেনে কী করছিলি রে?' সন্দেহভরা গলায় শুধোল ইভান।

'কিছু না। সিগ্রেট খেয়ে এলাম।'

'আরও দেশলাই-কাঠি ভাঙব! আরও কাঠি ভাঙব!' ছোটখাট মেয়েটি আহ্লাদিপনা করতে লাগল।

আবার ওরা রুমালের মোড়কে মুড়ল আরেকটা দেশলাই-কাঠি, আর তিনজনে মিলে প্রাণপণে সেটা ভাঙল আর সত্যি-সত্যি ভেঙেছে কিনা ফিরে-ফিরে তা পরখ করে দেখল। তারপর সের্গেই যখন রুমালের মোড়কটা খুলল তখন ফের দেখা গেল দেশলাই-কাঠিটা যে-আস্ত সেই-আস্তই রয়েছে। দেখে ছোটখাট, গোলগাল মেয়েটি আনন্দে খিলখিল করে হাসতে আর হাততালি দিতে লাগল।

'উ-উ-উ! কী করে করলেন? বলুন-না আমাদের!'

আর ঠিক এই সময়ে কে যেন দরজায় টোকা দিল।

'ওই এল ওরা!' লম্বা, ছিপছিপে মেয়েটি খুশি হয়ে বলে উঠল। 'এস, ভেতরে এস!'

দুটি ছোকরামতো ছেলে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে একটা গীটার ছিল ওদের। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক-খেলার কথা ভুলে গেল মেয়েদুটি, ভুলে গেল ভিনোকুরভ-ভাইদের কথাও। নতুন আগন্তুকদের মধ্যে একটি ছেলে বলল যে এইমাত্র রাস্তায় সে একটা গান শুনে এসেছে, তারপর গীটার-সহযোগে 'গেঁয়ো কায়দা'য় গানটা সে গেয়েও শুনিয়ে দিল।

শহুরে বাবু-বিবিরা হাসতে লাগল হো-হো করে। আর ফের শহুরে-শহুরে ভাব করে ইভানও পাল্লা দিয়ে হাসতে লাগল।

সের্গেইয়ের সহ্য হচ্ছিল না, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ট্রাকটার এট্টু তদারক করা দরকার — আজ এট্টু বেশি ধকল গ্যাচে ওটার উপর দিয়ে।'

বাইরের উঠোনে বেরিয়ে এসে কাঠ-চেরাইয়ের জন্যে রাখা একটা মোটা গুঁড়ির ওপর বসল সে। তারপর সিগারেট ধরাল।

বসবার ঘরের জানলা দিয়ে থেকে-থেকে হাসির আর গীটারের বাজনার ঝন্‌ঝনানি ভেসে আসছিল। ওরা মজা জুড়েছে মন্দ নয়। এইসব সুশ্রী চেহারার ভাবনাচিন্তাহীন ছেলেমেয়েদের ভালোই লাগে সের্গেইয়ের। তারও ওদের মতো অমন হাসিখুশি মেজাজ আর সুশ্রী চেহারা পেতে ভারি ইচ্ছে হল — হঠাৎই এই প্রবল বাসনা পেয়ে বসল তাকে। কিন্তু কী করে যে অমনটা হওয়া যায় তা বুঝে উঠতে পারল না।

ওর বাবা এই সময় উঠোন পার হয়ে যাচ্ছিলেন। মাটির নিচের ভাঁড়ারঘর থেকে নুনে-জারানো শশা নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

ছেলেকে দেখে শুধোলেন, 'কিরে, এখেনে বসে আচিস যে?'

'কিছু না, এমনি।'

'ইভান কই? দেখচি নে তো?'

বসবার ঘরের জানলার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করে সের্গেই বলল, 'ওখেনে।'

'মদ খাবি এক-পাত্তর?'

'না, থাক। ধন্যবাদ।'

বাবা ফিরে গেলেন বাড়ির মধ্যে। সেখানে তাঁর ছেলের ধর্মবাপ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সের্গেই। শুতে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না মোটেই। বসবার ঘরের হৈ-হুল্লোড় কেমন আন্‌মনা করে তুলেছিল ওকে। মনে-মনে ও কল্পনা করছিল, ছোটখাট গোলগাল মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ছে আর হাসবার সময় এমনভাবে হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিচ্ছে যে তখন তার চকচকে চোখদুটোই দেখা যাচ্ছে কেবল…। সত্যি বড্ড মন-উচাটন-করা মেয়ে! কাঠ-চেরাই দা'খানা বাগিয়ে ধরে মোটা-মোটা কয়েকটা গুঁড়ি চিরতে শুরু করল সের্গেই। খান-তিনেক মোটা গুঁড়ি চিরল ও, তারপর দা'খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খড়ের গোলার মাচায় উঠল ঘুমনোর জন্যে। যেমন ছিল তেমনিভাবেই, নতুন শার্ট গায়ে চড়িয়েই। ওই মিষ্টি ছোট্ট মেয়েটিকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিল না সে।

একসময় ইভানও উঠে এল গোলার মাচায় আর সের্গেইয়ের পাশে এসে বসল।

'কী হল?' সের্গেই শুধোল।

'কী আর হবে, সত্যিই সময় নষ্ট,' জবাব দিল ইভান। 'আমি তো তোরে আগেই বলেছিলাম ওদের সবটাই উপর-উপর, ভাসা-ভাসা।'

ফাঁকা কাঠের দেয়ালটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুল সের্গেই।

'তুই চলে এলি-যে বড়?'

"এমনিই…।'

এরপর দু'জনেই চুপ করে গেল। আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে রইল ইভান, কী যেন ভাবতে-ভাবতে নিজের মনে শিস্‌ দিতে লাগল। তারপর একসময় উঠে বাড়িতে বাবা আর ধর্মবাপের কাছে চলে গেল।

বসবার ঘরের জানলা দিয়ে তখনও হাসির হুল্লোড় ভেসে আসছিল।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল সের্গেই। তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে উঠোনে ঘুরতে-ঘুরতে মেয়েদের ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি দিল একবার…।

ফর্সা গোলালো হাতদুটি বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট গোলগাল মেয়েটি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ওর মুখটা অল্প-একটু হাঁ হয়ে আছে আর নিচের ঠোঁটে লেগে আছে ছোট্ট একটুখানি তুলোর আঁশ। আর যতবার নিশ্বাস ছাড়ছে মেয়েটি ততবার সেই তুলোর আঁশটুকু খাড়া হয়ে উঠে মজার ভঙ্গিতে কাঁপছে।

'একবারে দুধের বাচ্চার মতন,' কোমল-করুণ একটা অনুভূতিতে ভরে উঠল সের্গেইয়ের মন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে মেয়েটিকে দেখল।… তারপর লরির কাছে গিয়ে গাড়ির ক্যাবিন থেকে নোটবইটা বের করে তা থেকে পরিষ্কার একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখল:

'ম্যাজিকটে দারুণ সহজ, সত্যি বলছি। আপনারে যা করতে হবে তা হল এই: আগে থেকে এট্টা ম্যাচ-কাঠি রুমালের মুড়ি-সেলাই-দেওয়া দু'ভাঁজ-করা ধারটার মধ্যে নুকিয়ে রাখতে হবে। তারপর একফাঁকে ওটারে ঠেলে মাঝখানে আনতে হবে আর দেখতে হবে ওটাই যাতে ভাঙা হয়। এরপর যত ইচ্ছা প্রাণপণে সবাইরে ম্যাচ-কাঠিটে ভাঙতে দেবেন — আর দেখবেন অপর ম্যাচ-কাঠিটে যাতে আস্ত থাকে! বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? অন্যদের সামনে এটা পরীক্ষা করে দেখবেন। সের্গেই।'

কাগজখানা দু'ভাঁজ করে মুড়ে ও মেয়েদের ঘরের জানলার তাকে সেটা একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিল। যাতে হাওয়ায় কাগজটা উড়ে না-যায়।

তারপর এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে লরি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাঁয়ের রাস্তাঘাট তখনও ফাঁকা। বাড়িগুলোর মাথায় সূর্য সবে উঁকি দিচ্ছে।

'কী, নিজের জন্যে এট্টা হ্যাট কিনব নাকি?' সের্গেই মনে-মনে ভাবল। ড্রাইভারের সামনেকার আয়নায় নিজের দিকে তাকাল একবার, তারপর হেসে ফেলল।



মনে পড়া

ব্যাপারটা ঘটতে লাগল প্রতি রাত্রেই।

গ্রামখানা যেই একটু শান্ত হয়ে আসে আর লোকজন আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করে — অমনি উপদ্রবও শুরু হয় ওর। অপদার্থটা অমনি বেরিয়ে পড়বে রাস্তায় আর গাঁয়ের একটা প্রান্ত থেকে শুরু করে অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে-বাজাতে পথ চলবে। ওর অ্যাকর্ডিয়ন বাজনাটাও আবার বিশেষ এক ধরনের — সেটা থেকে খালি হৈ-হল্লার আওয়াজই বেরোয়। সুরের হিল্লোল নয়, খালি হৈ-হল্লার আওয়াজ।

লোকে নিন্‌কা ক্রেচেতভাকে মিনতি করে বলে, 'দোহাই তোর, যত শিগ্‌গিরি পারিস ওরে বে করে ফেল্! নইলে আমাদের জেবন-যে অতিষ্ঠ করে তুলল ছোঁড়া।'

জবাবে নিন্‌কা খালি রহস্যময় হাসি হাসে। বলে:

'তা, বাজনা শোনার দরকারটা কী! ঘুমালেই তো পারেন।'

'কিন্তু ঘুমাই কী করে, ক' দিনি? যন্তরটা জানলার নিচেই যা রামচিচ্‌কার জুড়ে দেয়। হতভাগা ছোঁড়া যদি নদীর ধারে গে বাজায় তাইলেও রক্ষে পাই। তা না, ও আবার গাঁয়ের ভিত্‌রিই ঘোরবে। এসব ওয়ার মতলববাজি, ইচ্ছা করেই এ-কান্ড করে ও।'

মোটা-মোটা ঠোঁট আর দৈত্যের মতো চেহারা বাজনদার কোল্‌কা মালাশ্‌কিনের। তার কাছে কেউ কথাটা তুললে খুদে-খুদে চোখদুটো উদ্ধত

ভঙ্গিতে সর্-সর্ করে সে বলে, 'এ কাজ করার অধিকার আচে আমার। এয়ার বির্দ্ধে কোনো আইনের বাধা নাই।'

স্থানীয় যৌথখামারের চেয়ারম্যান মাত্‌ভেই রিয়াজান্ত্‌সেভের বাড়িটা ঠিক সেইখানটায় — যেখানে পাশের একটা গলিপথ ধরে কোল্‌কা গাঁয়ের সদর শড়কে এসে হাজির হয়। ফলে অ্যাকর্ডিয়নের হৈ-হল্লায় প্রথমে জেগে ওঠে গোটা গলিরাস্তাটা, তারপর ঠিক মাত্‌ভেইয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে মোড় নিয়ে হল্লাটা এগিয়ে চলে সদর শড়ক বরাবর আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানে আসে তা।

আর গলির মধ্যে দূর থেকে বাজনার আওয়াজটা প্রথম যেই কানে আসে অমনি মাত্‌ভেই বিছানায় উঠে বসেন, ঠান্ডা কন্‌কনে মেঝের ওপর পা-দুটো নামিয়ে দেন, তারপর বলেন, 'ওই শুর্ হল। আসচে কাল ওরে যদি যৌথখামার থেকে তাইড়ে না-দিই তো কী বলেচি। যা হোক কিছু এট্টা ছুতোনাতায় ওরে আমি বার করে দুবই।'

প্রতি রাত্রে উনি ওই একই কথা বলেন। কিন্তু কোল্‌কাকে আর তাড়ানো হয়ে ওঠে না। দিনের বেলা যদি কখনও কোল্‌কার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায় তাহলে বড়জোর উনি বলেন, 'মাঝরাত্তিরি আর কতকাল ভূতের মতন টহল দে বেড়াবি রে তুই? দিনমানের কাজের পর নোকের তো এট্টু বিশ্রাম দরকার, না কী? আর তুই তাদেরে ঘুমাতে দিবি নে, ঘণ্টা-বাজনদার কোথাকার!'

'আমার অধিকার আচে,' সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিগত্ আউড়ে দেয় কোল্‌কা।

'অধিকার কেমন আচে দেখাব-নে তোরে!'

কিন্তু ওই পর্যন্তই। কথাবার্তারও ওইখানে ইতি।

তবু প্রতিরাত্রে মাত্‌ভেই বিছানায় উঠে বসে প্রতিজ্ঞা করেন, 'কাল ওরে তাইড়ে দুবই।'

আর এরপর অনেকক্ষণ ওইভাবে বসেই থাকেন তিনি, কী যেন চিন্তা করেন বসে-বসে। সদর সড়কে অ্যাকর্ডিয়নের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও বসে থাকেন। তারপর একসময় চেয়ারের-ওপর-রাখা ট্রাউজার্সের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করেন আর ধরিয়ে নেন একটা।

'বাবা-বাবা, সারা দিনের ধুনী জ্বালানোর পাট চোকল না এখনও?' ঘুমঘুম গলায় বলে ওঠেন স্ত্রী আলিয়োনা।

'তুমি ঘুমাও দিনি,' কথা বাড়াতে চান না মাত্‌ভেই।

কিন্তু তাঁর ওই চিন্তাভাবনা কী নিয়ে? সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। কেবল পুরনো দিনগুলো মনের মধ্যে ফিরে আসে কেমন। সুনির্দিষ্ট কিছু নয়, কেবল আবছা-আবছা দু'একটা স্মৃতি। তবে একদিন রাত্রে আকাশে যখন চাঁদ উঠেছে আর রাস্তায় অ্যাকর্ডিয়ন বাজছে আর জানলা দিয়ে রাতের ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিশে সোমরাজের আগাছার তিত্‌-কুটে গন্ধ ভেসে আসছে, তখন হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য একটা রাতের স্পষ্ট একটা ছবি ওঁর মনে ভেসে উঠল। সে রাত্তিরটা ছিল আলকাত্‌রার মতো কুচকুচে অন্ধকার। বাপের সঙ্গে উনি আর ওঁর ছোটভাই কুজ্‌মা তখন গাঁ থেকে পনেরো কিলোমিটারটাক দূরে 'কুচুগুরি'তে ঘাসকাটা উপলক্ষে ছিলেন। সেই রাত্রে বাচ্চা কুজ্‌মার হঠাৎ শ্বাসের কষ্ট শুরু হল। সারা দিন রোদ্দুরে আর গরমে ঘেমে নেয়ে একাকার হবার পর ছেলেটা একটা ঝর্না থেকে বরফের মতো কন্‌কনে জল খেয়েছিল, ফলে রাত্তিরে ওর গলা 'বন্ধ' হয়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হল। বাবা মাত্‌ভেইকে ঘুম থেকে তুলে বললেন ইগ্রেঙ্কা নামের ঘোড়াটাকে (ওঁদের ঘোড়াগুলোর মধ্যে ওটাই ছিল সবচেয়ে দৌড়বাজ) ধরতে আর ওর পিঠে সওয়ার হয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন ঘোড়া ছুটিয়ে গাঁয়ে গিয়ে খানিকটা দুধ যোগাড় করে আনতে।

'আমি এখেনে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত কচ্চি, তুই দুধ আনলে দুধটা জ্বাল দে নোব। বাচ্চার গলার লেগে কিছু এট্টা করা নাগবে আমাদেরে, নইলে ওটারে আর রাখতে পারব না আমরা,' বাবা ওঁকে বললেন।

ঘোড়াগুলো কোথায় চরে বেড়াচ্ছে আওয়াজ শুনে তা আন্দাজ করলেন মাত্‌ভেই, তারপর ইগ্রেঙ্কাকে পাকড়াও করে সাজ পরালেন। অবশেষে ঘোড়ার পা-বাঁধা দড়ি দিয়ে সজোরে ওর পাছায় ঘা দিয়ে ঘোড়া ছোটালেন গাঁয়ের দিকে। আর তারপর...। শিগ্‌গিরই মাত্‌ভেই ষাট বছরে পা দিতে চলেছেন এখন, আর সেদিন ওঁর বয়স ছিল বারো কি তেরো, তবু সে-রাত্রের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে ওঁর। কালিঢালা অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলার সময় ঘোড়া আর বাচ্চা ছেলেটা সেদিন হরিহরাত্মা হয়ে উঠেছিল। ওদের

ওপর আছড়ে পড়ছিল রাত্রি, শিশির-ভেজা ঘাসের জোরালো গন্ধ মুখের ওপর ছুড়ে-ছুড়ে মারছিল যেন। বাচ্চা মাত্‌ভেইয়ের মনে হচ্ছিল দুর্দম উন্মাদনার পাগ্‌লা হাওয়া যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাঁকে, দুই রগের শিরাগুলোয় দপদপ করছে রক্ত। বাতাসে উড়ে চলার একটা অনুভূতি হচ্ছিল ওঁর, যেন মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ছেন তিনি। কোনোদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। না-আকাশ, না-মাটি, এমন কি ঘোড়ার মাথাটা পর্যন্ত না। তিনি কেবল অনুভব করতে পারছিলেন দুই কানে একটানা বোঁ-বোঁ আওয়াজ আর তাঁর ওপর এসে ঝাঁপিয়ে-পড়া রাত্রির নিশ্ছিদ্র উপস্থিতি। এমন কি অসুস্থ ভাইয়ের কথাও মনে ছিল না ওঁর। আসলে আর কিছু ভাবতেই পারছিলেন না। শুধু অনাস্বাদিত একটা আনন্দে ভরে উঠেছিল মনটা। পাগল-করা আনন্দের এক দুর্লভ মুহূর্তে দেহের প্রতিটি রোমকূপ রিন্‌রিন করছিল শুধু।

...তারপর এল শোক। দুধ নিয়ে ফিরে এসে তিনি দেখলেন বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে জাপ্‌টে ধরে তাঁর বাবা আগুনের কুণ্ডের চারপাশে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন, যেন-বা বুকে করে ঘুম পাড়াচ্ছেন তাকে। মাত্‌ভেই শুনলেন উনি বিড়বিড় করে বলছেন:

'চোখ চা' খোকা, চেয়ে দ্যাখ্‌... কী হল তোর, অ্যাঁ? আর এট্টু সবুর কর্‌। এট্টু সবুর কর্‌ দুধের জন্যে। এখুনি দুধ জ্বাল দে খেতে দুব তোরে আর ফের আবার লিশ্বেস লিতে পারবি তুই। এট্টু সবুর কর্‌, বাপ আমার...। এই তো মাত্‌ভেই এসে গেচে দুধ লিয়ে···।'

কিন্তু বাচ্চা কুজ্‌মার ততক্ষণে শ্বাস উঠে গিয়েছিল।

মাত্‌ভেইয়ের পিছু-পিছু ওদের মা যখন এসে উপস্থিত হলেন, কুজ্‌মা মারা গেছে তখন। মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে বাবা তখন বসে ছিলেন, আর থেকে-থেকে এদিক-ওদিক দুলছিলেন আর গোঙাচ্ছিলেন একটানা জড়ানো স্বরে। ভারি অবাক হয়ে আর অদ্ভুত একটা কৌতূহল নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মাত্‌ভেই। ভাবছিলেন, এই তো মাত্র গতকাল খড়ের গাদায় দু'জনে হুটোপুটি করেছেন আর আজ এ তো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ছেলে শুয়ে আছে সামনে, নীলচে-ফ্যাকাশে একেবারে অচেনা একটা বাচ্চা।

...এই নারকী অ্যাকর্ডিয়নটা-যে এমন একটা স্মৃতি জাগিয়ে তুলল এটা

ভারি আশ্চর্য তো। অন্য সব রাত্তির বাদ দিয়ে ঠিক ওই রাত্তিরটাই-বা কেন মনে পড়ল? ওর পর তো গোটা জীবনটাই কেটেছে তাঁর — বিয়ে হয়েছে, আবাদের যৌথীকরণ সমাধা হয়েছে, যুদ্ধ গেছে দেশের ওপর দিয়ে। আরও কত রকমেরই-না রাত্তির কেটেছে জীবনে। কিন্তু সে-সব রাত্তির কবে ফিকে হয়ে গেছে স্মৃতিতে, অতীতে মিশে গেছে কবে। সারা জীবন মাত্‌ভেই যা করা সমীচীন তাই করে এসেছেন। লোকজন যখন বলল যে যৌথ খামারে যোগ দেয়া উচিত, তিনি যোগ দিলেন। বিয়ের বয়স হল যখন, বিয়ে করলেন। তারপর তিনি আর আলিয়োনা সংসারে ছেলেপিলেদের এনেছেন। ছেলেপিলেরাও বড় হয়ে উঠতে শুরু করল...। যুদ্ধ বাধল এরপর। লড়াইয়ে চলে গেলেন তিনিও। আহত হওয়ায় অন্যদের আগেই আবার ফিরেও এলেন। তারপর এল সেই অনুরোধ: 'তোমারে চেয়ারম্যান হওয়া নাগবে, মাত্‌ভেই। আর তো কেউ নাই চেয়ারম্যান হবার মতন।' আর উনি বনে গেলেন খামারের চেয়ারম্যান। তারপর কোনোরকমে এ-কাজে ধাতস্থ হয়ে উঠলেন আর লোকেও অভ্যস্ত হয়ে উঠল তাঁর সঙ্গে কাজ-কারবার চালানোয়। আর তাই এখনও তিনি আছেন, একরোখার মতো নাক জুবড়ে কাজ করে চলেছেন। সারাটা জীবন এইভাবেই কাটল, খালি কাজ, কাজ আর কাজ। লড়াইয়ে গিয়েও সেই একই অবস্থা — কাজ আর কাজ। যতকিছু চিন্তাভাবনা, আনন্দ-উৎসব, যতকিছু দুঃখ-শোক, সবই তাঁর জীবনে কাজের সঙ্গে যুক্ত। চারপাশের লোকজনকে যখন তিনি অন্য কিছু নিয়ে — যেমন ধরা যাক, 'ভালোবাসা' নিয়ে — কথা বলতে শুনেছেন, তখন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। বুঝেছেন যে দুনিয়ায় প্রেম-ভালোবাসা বলেও একটা বস্তু আছে। আলিয়োনাকেও তিনি নিশ্চয় ভালোবেসেছিলেন (অল্পবয়সে আলিয়োনা ভারি সুন্দর, ডাগর-ডোগরটি ছিল), কিন্তু এ-ব্যাপারে ওঁর জ্ঞানগম্যি এর চেয়ে আর বেশি ছিল কিনা সেকথা বলতে গেলে বলতে হয় — না, তা ছিল না। এমন কি তাঁর সন্দেহ হয় যে অন্যেরা এ-ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়িই করে থাকে। প্রেমের গান গাওয়া, ফোঁস-ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা, চোখের-জলে-নাকের-জলে হওয়া; এমন কি এ-ও কানে এসেছে যে লোকে নাকি এজন্যে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে। লোকে যে এটাকে স্বভাবের এক ধরনের অঙ্গ বলে ভান করে থাকে, ঠিক তা কিন্তু নয়। লোকে মনে করে যে প্রেম নিয়ে কথা বলা উচিত, তাই প্রেমের প্যাঁচাল পাড়ে। অথচ উনি তো বোঝেন যে এর কারণটা আর কিছুই নয়, এর কারণ শুধু ওই

প্যাঁচাল-পাড়া লোকেদের বিয়ে করার সময় হয়েছে! যেমন, কোল্‌কার কথা ধরা যাক। ও কি প্রেমে পড়েচে? অবিশ্যি নিন্‌কাকে মনে ধরেচে ওর। তা তো ধরবেই, দিব্যি গোলগাল ডব্‌কা মেয়ে নিন্‌কা। আর কোল্‌কা-ছোঁড়ার বে'রও বয়স হয়েছে, কাজেই সে এখন রাত্তিরবেলা ঘুরে-ঘুরে 'বাজনা বাজিয়ে ছুঁড়ির মনে রঙ্‌ ধরাতে' চাইচে। তা, অমন করবেই-বা না কেন? অল্প বয়েস, সোমত্ত জোয়ান ছোঁড়া...। চেরকালটাই তো এমনধারা হয়ে আসচে। আজকাল তবু ছোঁড়ারা ছুঁড়ি লিয়ে নিজেদের মধ্যি মারপিট করে না। আগে কিন্তু তা-ই করত। মাত্‌ভেই নিজেই বয়সকালে কত এমন লড়াই করেছেন। এই সবকিছুর মূলে সেই একই ব্যাপার — হাত নিশ্‌পিশ করা আর বাড়তি তাগদ। কাজেই নিশ্‌পিশিনি কমানো আর তাগদ খরচা করার একটা জায়গা চাই তো।

একদিন রাত্রে বিছানার ধারটাতে বসে এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে মাত্‌ভেই হঠাৎ স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে না-জাগিয়ে পারলেন না।

বললেন, 'হেই শোন — তোমারে এট্টা কথা শুধোবার ছেল।'

'কী হল ? কী কথা আবার?' আশ্চর্য হলেন আলিয়োনা।

'তুমি কি কোনোদিন ভালোবেসেচ? আমারে বা আর কাউরে?'

প্রশ্ন শুনে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইলেন আলিয়োনা। পরে বললেন:

'বেশি কয়ফোঁটা পেটে পড়েচে বুঝি?'

'আরে, না-না, ওসব কিছু না!.. শুধোচ্চি, তুমি যে আমারে বে' করলে তা কি ভালোবেসে, না ওরে কী বলে, অভ্যেসের বশে? সত্যি, কথাটা জানা আমার খুব দরকার।'

আলিয়োনা বুঝলেন যে তাঁর স্বামীর 'পেটে কয়ফোঁটা' পড়ে নি, তবু উত্তর দিতে খানিকটা সময় লাগল তাঁর। হয় তিনি নিজেই জানতেন না, নয় ভুলে গিয়েছিলেন।

'এমনধারা বিদঘুটে খেয়াল মাথায় ঢোকল কী করে, শুনি?'

'আরে, এট্টা জিনিস আমি তলিয়ে বুইতে চেষ্টা পাচ্চি, বুইলে? যত্তো সব! এট্টা ব্যাপার আমারে বড্ড অস্থির করে মারচে... শক্ত ব্যামো হলে যেমন হয় তেমনি আর-কি।'

'লিচ্চয়, ভালোবাসতাম বৈকি,' আলিয়োনা এবার জোরের সঙ্গে বললেন। 'লইলে তোমারে বে' করতাম নাকি মনে কর? ওই যে মিন্‌কা করলিওভ

আমার পিছু কেমন দৌড়াদৌড়ি করেছেল, মনে পড়ে? কই, তারে তো আমি বে' করি নাই। কিন্তু মাঝরাতে এমন পিরীতের বাতিক মাথায় চাগাড় দে' ওঠল কেনে, তাই কও দিনি? বুদ্ধিসাধ্যি নোপ পেতে বসেচে নাকি?'

'আল্‌তুফাল্‌তু বোকো না বলচি!' ধমক দিয়ে উঠলেন মাত্‌ভেই। 'নাকে তেল দে ঘুমাও দিনি!'

'কাল কিন্তু মনে করে আমাদের গোরুটার খামারের পালের সাথে চরাবার জন্যে পাঠাতে ভুলো না। তোমারে বলতে পেরায় ভুলেই গেছিলাম কথাটা। কাল সকালে আমি মেয়েদের সাথে বেরিফল কুড়ুতে যাচ্চি, বুইলে?'

'তা, যাচ্চ কোন ঠেঁয়ে?' সঙ্গে সঙ্গে মাত্‌ভেইয়ের কান খাড়া হয়ে উঠল।

'তোমাদের ঘেসেড়াদের মাঠে লয় গো, অত ভাবনার কিছু নাই।'

'ঘেসেড়াদের মাঠে ঘাস মাড়াতে যদি দেখি তোমাদেরে, তাইলে পেত্যেকেরে দশ রুব্‌ল করে জরিমানা করা হবে।'

'আরে না-না, এমন এট্টা জায়গার সন্ধান জানি আমরা, যেখেনে ঘেসেড়ারা ঘাস কাটে না। আর জায়গাটা বেরিফলে-না, একবারে রক্তবন্ন হয়ে আচে। তা, মনে করে গোরুটারে ছাড়তে ভুলো না যেন।'

'ঠিক আচে।'

আচ্ছা, ওই রাত্রে ঠিক কী ঘটেছিল? ভাইয়ের জন্যে দুধ আনতে উনি যখন ঘোড়ায় চেপে ছুটেছিলেন? ঘটনাটা হঠাৎ এমন করে মনেই-বা পড়ে গেল কেন?

মাত্‌ভেই ভাবলেন, 'বুড়া বয়েসে সত্যিসত্যিই বুদ্ধিসাধ্যি নোপ পেতে বসেচে আমার, ভীমরতি ধরতে নেগেচে। বুড়া বয়েসের এই তো ধম্মো।'

কিন্তু তবু মনের এই অস্থিরতার ব্যামো কিছুতে যাবার নয়। নিজের কাছেই মাত্‌ভেই ধরা পড়ে যেতে লাগলেন যে চিল-চ্যাঁচানো 'কলটেপা-বাক্স' সহ কোল্‌কার জন্যে প্রতি রাত্রে অপেক্ষা করে থাকেন তিনি। রাস্তায় বেরুতে অন্যাদিনের চেয়ে কোল্‌কা একদিন একটু দেরি করলেই তিনি ভেতরে-ভেতরে উদ্বেগ বোধ করতে থাকেন। নিন্‌কার ওপর কেমন একটা রাগ হয়। মনে ভাবেন, 'জাহান্নমে যাক ছুঁড়ি... ও-ই লিচ্চয় ছোঁড়ারে আটকে রেখেচে!'

আর বসে-বসে একটার-পর-একটা সিগারেট ধ্বংস করতে থাকেন উনি।

আর তারপর একসময় গলির অপর প্রান্তে দূর থেকে অ্যাকর্ডিয়নের বাজনা শোনা যায় আর সেই অদ্ভুত অস্থিরতার ব্যামোটা তাঁর মনকে অধিকার করে বসে। ব্যামোটা সত্যিই আজব ধরনের — কেননা ওটাই তাঁর কাম্য, ওর জন্যেই অপেক্ষা করে থাকেন তিনি। ওটা ঘাড়ে চেপে না-বসলে কিসের যেন অভাব বোধ করতে থাকেন।

কিছু-কিছু সকালবেলার ছবিও এইভাবে তাঁর মনে ফিরে আসে। তিনি দেখেন — খালিপায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন আর ঘাসের ডগাগুলো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে ছাওয়া। আর পেছনদিকে ঘাসের ওপর তাঁর পায়ের ছাপগুলো ডগডগে সবুজ। আর শিশিরের হিমেল ছোঁয়া পায়ে কামড় দিচ্ছে যেন। এমন কি এখনও সেই হিমেল ছোঁয়ার কথা মনে হলে গা সির্‌সির করে।

কিংবা হঠাৎ খেয়াল হয়, মৃত্যুর কথা ভাবতে লেগেছেন তিনি। ভাবছেন, জীবন তো ফুরিয়ে এল, দেখতে-দেখতে শেষ হয়ে এল সব। ভয় নয়, মৃত্যুযন্ত্রণাও নয়, হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়ার বিস্ময়টাই মনকে অধিকার করে বসে। যেমন চলছে তেমনিই চলতে থাকবে জীবন, কিন্তু তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কবরখানায়, তারপর গোর দেয়া হবে মাটির নিচে। তা সত্ত্বেও সবকিছু একই ভাবে চলবে এটা বুঝে ওঠা কেমন যেন শক্ত হয়ে পড়ে। অবিশ্যি এও ঠিক যে তারপরও সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত হবে, যেমনটা হয়ে চলেছে চিরকাল। কিন্তু দেখতে-দেখতে তারপর গাঁ'খানা ভরে যাবে এমন সব নতুন লোকে যাদের তিনি কোনোদিনও আর চিনবেন না... আর ঠিক এই ব্যাপারটাই তাঁর বোধবুদ্ধির বাইরে। হয়তো তারপরও আরও দশ-পনেরোটা বছর কিছু-কিছু লোক মনে রাখবে যে মাত্‌ভেই রিয়াজান্ত্‌সেভ নামে একসময় একটা লোক ছিল, কিন্তু তারপর... তবু ভারি জানতে ইচ্ছে যায় ওঁর — যে আগামী দিনের ওইসব লোকের দিন কাটবে কেমনভাবে। এটা ঠিক কোনোকিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি নয়। জীবনে বহুবার বহু সূর্যোদয়, বহুরকম দিন দেখেছেন তিনি, ছুটির দিনগুলোয় ফুর্তিও করেছেন প্রাণভরে। জীবনে বেশকিছু উপভোগ্য সময়ও কেটেছে তাঁর... না-না, তাঁর আপসোস করার মতো কিছু নেই। অনেক-কিছু দেখেছেন তিনি জীবনে। কেবল এই চিন্তাটুকুই তাঁকে জ্বালাচ্ছে যে তিনি চলে যাবেন অথচ অন্যেরা থেকে যাবে

পৃথিবীতে, আর তাঁকে চলে যেতে হবে চিরতরেই... নিশ্চয়ই তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের জীবন খালি-খালি ঠেকবে। নাকি, তাতে কিছুই যাবে-আসবে না?

'ধুত্তোর!.. সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্চি দেখচি।'

চিন্তা করতে-করতে কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি।

'হেই শোনো — ওঠো তো,' মাত্‌ভেই স্ত্রীকে খুঁচিয়ে ঘুম থেকে তোলেন। 'আচ্ছা, তুমি কি মরতে ডরাও?'

'নোকটা পাগল হল নাকি!' আলিয়োনা বিরক্ত হয়ে বলেন। 'আদ্যিকালের বুড়া ঘেসুড়েটারে কে না ডরায়!'

'কই, আমি তো ডরাই না।'

'ডরাও না তো ঘুমাও-না কেনে। ওসব আবোলতাবোল ভেবে নাভ কী?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ঘুমাও দিনি!'

কিন্তু তারপর যেই তাঁর মনে পড়ে যায় সেই অন্ধকার প্রবল শক্তিমান রাত্রের কথা, ঘোড়ার পিঠে সেই-যে তিনি নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছিলেন তার কথা, আর অমনি তীক্ষ্ম মধুর একটা অনুভবে বুকটা যেন মুচড়ে-মুচড়ে ওঠে। না, সত্যি, জীবনে একটা-কিছু আছেই, এমন একটা-কিছু যা একদিন হারাতে হবে মনে হলে প্রচণ্ড মন-পোড়ানি না-হয়ে পারে না। এত কষ্ট হয় সে-কথা ভেবে যে চোখে জল এসে যায় প্রায়।

তারপর একরাত্রে কোল্‌কার অ্যাকর্ডিয়ন বাজনার জন্যে অপেক্ষা করে-করে বৃথাই সময় কেটে গেল তাঁর। সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চললেন, তবু বাজনার আওয়াজ শোনা গেল না। সারা রাতভর অপেক্ষা করলেন, কিন্তু বাজনা আর বাজল না... সেদিন রাত্রে সত্যিই ওঁর ভেতরটা যেন শূন্য হয়ে গেল।

ভোরের আলো দেখা দিতে মাত্‌ভেই স্ত্রীকে ডেকে তুললেন।

'আচ্ছা, আমাদের ঘণ্টা-বাজনদারের কী হল বল দিনি? আর-যে বড় ওয়ার সাড়াশব্দ মিলচে না?'

'জানো না বুঝি, ওয়ার-যে বে হতে চলেচে। সামনের রোববারেই বে।'

খবরটা শুনে কেমন মনখারাপ হয়ে গেল মাত্‌ভেইয়ের। বিছানায় শুয়ে

ফের ঘুমোবার চেষ্টা করলেন উনি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সূর্য না-ওঠা পর্যন্ত এমনিই বিছানায় শুয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিলেন। অতীত জীবনের অন্য কোনো ঘটনার কথা মনে করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই মাথায় এল না। বরং যৌথখামারের নানা সমস্যাই ভিড় করে এল মাথায়... ঘাস কাটার সময় এসে গেল বলে। এদিকে খামারের ঘাসনিড়েন-যন্ত্রের অর্ধেকই তো ইতিমধ্যে গাদি মেরেছে কামারশালে, অথচ ট্যারাচোখো শয়তানটা, ফিলিয়া কামারব্যাটা, মদের আসর জমাতে উধাও হয়েছে কোথায় যেন। এরপর বিয়ের উৎসবে সে ব্যাটা ভরপেট মদ গিলবে আবার, আর তার মানে আরও একটা সপ্তা মাটি করে দেবে সে।

'কাল ওর সাথে এ লিয়ে কথা বলতে হবে। এট্টা বোঝাপড়া করা দরকার।'

...পরদিন পুরু-ঠোঁটওয়ালা অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে কোল্‌কার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় মাত্‌ভেই ওর দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে শুধোলেন:

'তারপর, বাছা, বাজনার পালা ফুরুল এবার?'

দাঁত বের করে দু'কান এঁটো-করা হাসি হাসল কোল্‌কা।

'তা ফুরুল। আর আপনেদের রাতের বেলা ঘুম থেকে তুলচি নে। ওসব পাট চুকল এবার।'

'তাইলে তো ভালো কথাই,' বলে নিজের কাজে চলে গেলেন মাত্‌ভেই। যেতে-যেতে মনে-মনে ভাবলেন, 'ওরে মাথামোটা বলদ, এত খুশি হবার কী হল তোর? তোর নিন্‌কা ছুঁড়ি তো দুইদিনে জব্দ করে ফেলবে-নে তোরে। ক্রেচেতভ পরিবাররে হাড়ে-হাড়ে জানা আচে, ওয়ারা সব্বাই ওই কছমের।'

এক সপ্তাহ কেটে গেল এরপর।

আর প্রতিরাত্রে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘর ভরে দিতে লাগল, আর সোমরাজ-আগাছার ও সব্‌জিখেতে নতুন আলুচারার পাতার ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে উঠতে লাগল বাতাস... আর রাতগুলো কাটতে লাগল নিথর, নিস্তব্ধ।

মাত্‌ভেইয়ের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। বারবার ঘুম ভেঙে যেতে

লাগল তাঁর, ঘনঘন সিগারেট খাওয়ার দরকার পড়তে লাগল... কখনও-কখনও বার-বারান্দাটায় বেরিয়ে এসে এক-আধ গেলাস ক্‌ভাস খাবারও প্রয়োজন হতে লাগল। আর তখন হয়তো কোনো-কোনো দিন বাইরে বেরিয়ে বাড়ির সামনের সিঁড়িতে এসে বসেন আর সিগারেট ধরিয়ে নেন একটা। দেখেন, সারা গাঁ ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়, আর চারিদিক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ।



ঘটকালি

আটষট্টি বছর বয়সে বুড়ো এর্মোলিয়ান গ্রুখভ বিপত্নীক হল। স্ত্রীকে কবর দিয়ে এসে অন্ত্যেষ্টি-ভোজে প্রধানের আসন নিয়ে চোখের জল ফেলল। বলল, 'কেমন করে দিন কাটবে এখন? একা-একা?'

হ্যাঁ, ঠিক ওই কথাগুলোই বলেছিল বুড়ো। এমন অবস্থায় সব বুড়ো মানুষই ওই একই কথা বলে থাকে। বুড়ো কষ্ট পাচ্ছিল, বিষম কষ্ট পাচ্ছিল, তাতে কোনো ভুল নেই, কিন্তু তা বলে সত্যিসত্যিই এখন কেমন করে দিন কাটবে ওর সেই কথাই যে ভাবছিল তারও কোনো মানে নেই। শোকে-দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে কথাগুলো বলেছিল, এইমাত্র। সত্যিসত্যিই ও কিছু ভবিষ্যতের কথা ভেবে অমন কথা বলে নি।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, একটা বছর পার হয়ে গেল যখন, বুড়োর কাছে নৈঃসঙ্গ্য ততই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। অতবড় কুঁড়েখানায় একেবারে একা থাকা ভয়ঙ্কর কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। বুড়োর এক ছেলে বেঁচে আছে, বয়সে সবচেয়ে ছোট সে (তার বড় ভাইয়েরা আগেই মারা গেছে যুদ্ধে)। কিন্তু সে থাকে শহরে আর নিতান্ত কালেভদ্রে বাড়ি আসে — তা-ও আসে নিজের সংসারের জন্যে আলুর ফলনের সময় আলু, কিংবা নুনে-জারানো বাঁধাকপি বা শশা, অথবা নিজের বাচ্চাদের জন্যে মধু (বুড়োর অল্প-একটু মৌমাছির চাষও আছে, গোটা-ছয় মৌচাক আছে তার), কিংবা নুনে-জারানো শুয়োরের চর্বি সংগ্রহ করতে, অন্য কোনো কারণে নয়। কিন্তু ছেলের এই বাড়ি আসায় খুশি হয় না বুড়ো, বরং বিরক্তই হয়। ছেলে শুয়োরের চর্বি, মধু বা শশা বাগিয়ে নেয় বলে কিছু মনে করে না ও। না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। দুঃখের

ব্যাপার হল এই যে ওর নিজের ছেলে আর ছেলের মতো আচরণ করে না, কী করে বাপের গলগ্রহ হওয়া যায়, বাপকে শোষা যায় খালি এ-ই তার মতলব। ছেলে বাড়ি এলে বাপ তাকে শুয়োরের চর্বি আর বাঁধাকপি দেয়, সবচেয়ে সেরা জিনিসগুলোই বেছে-বেছে দেয় সর্বদা, আর মুখে কিচ্ছুটি বলে না, মনের ক্ষোভ মনেই চেপে রাখে। ধরা যাক, না-হয় ছেলেকে সে বলল সে কত একা, কী কষ্ট তার মনে। তাহলে কী হবে? তার কষ্ট-লাঘবের জন্যে কী করবে ভান্‌কা? কিছুই না! দু'জনে অবসন্নভাবে মুখোমুখি বসে সন্ধেটা কাটাবে, বোতলখানেক মদ গিলবে দু'জনে মিলে, তারপর স্যুটকেস-হাতে ছেলে ফিরে যাবে তার সাধের শহরে, নিজের পরিবারের কাছে। একেই বলে জীবন!

ফলে বুড়োর মাথায় ঢুকল যে ফের বিয়ে করা দরকার। এমন কি কে তার স্ত্রী হতে পারে তা-ও ঠিক করে ফেলল।

দিনটা ছিল ৯ই মে। বিজয়-দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও গোটা গাঁয়ের লোক এসে জড়ো হয়েছে কবরখানায়, যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশ্যে। গ্রাম-সোভিয়েত থেকে কে-একজন একটা টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে শহীদদের নামগুলো একে-একে পড়ে চলেছে:

'গ্রিয়েব্‌ত্‌সভ নিকোলাই মিত্রফানোভিচ, গুলিয়ায়েভ ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ, গ্লুখভ ভাসিলি এর্মোলিয়ানোভিচ, গ্লুখভ স্তেপান এর্মোলিয়ানোভিচ, গ্লুখভ পাভেল এর্মোলিয়ানোভিচ...।'

শেষের তিনজনই এর্মোলিয়ান গ্লুখভের ছেলে। সবসময়েই, ছেলেদের নামগুলো যখন এইভাবে পড়া হয়, তখন বুড়োর মনে হয় একটা মৃত্যুযন্ত্রণা যেন নিষ্ঠুর দশ-আঙুলে ওর টুঁটিটা টিপে ধরেছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর... শুকনো চোখে ও তখন খালি মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, অথচ চোখ মেলে যে কিছু দেখে তা-ও নয়। ওইভাবে কতক্ষণ যে সে দাঁড়িয়ে থাকে তার ঠিক নেই আর গ্রাম-সোভিয়েতের লোকটি নামের-পর-নাম আউড়ে যেতে থাকে...

অন্য সবাই অবশ্য কবরখানায় নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগল। আর চোখ মুছতে লাগল শালের খুঁটোয় আর হাত দিয়ে, চুপিচুপি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগল। এই পবিত্র প্রহরের ন্যায্য পাওনা যে-নৈঃশব্দ্য পাচ্ছে তা ভেঙে বসে, তার অপমান ঘটায় যেন এই তাদের ভয়। একটু দম ফেলতে পারার পর

বুড়ো চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। আর অন্য সময়েও যেমন ভাবে তেমনই একই কথা ভাবল, 'ওহ্, কতগুলো অমূল্য জেবন-যে লষ্ট হয়ে গেল তা আর বলার লয়!'

এবার কবরখানার ভিড়ের মধ্যে এক বুড়ির দিকে বিশেষ করে তার নজর পড়ল। বুড়ির নাম অতাভিনা। গাঁয়ের খাস বাসিন্দা নয় সে, তবে বহুকাল থেকেই গাঁয়ে বাস করে আসছে। গ্লুখভ চেনে ওকে। ওর পরিবারের কারও নাম শহীদদের লিস্টিতে নেই, তবু ও প্রতিবার কবরখানায় এসে অন্যদের সঙ্গে নিঃশব্দে কাঁদে আর দেহে ক্রুশচিহ্ন আঁকে। বুড়ো গ্লুখভ ধর্মপ্রাণ মানুষজনকে মান্য করে তাদের ধৈর্য আর মনোবলের জন্যে। এবার ও বিশেষভাবে খেয়াল করে অতাভিনাকে দেখল। বুড়ির নাকটা কাকতুয়ার মতো নিচের দিকে বাঁকানো, তবে দিব্যি শক্তসমর্থ আছে এখনও বুড়ি। নিজেদের সব্জিবাগানটুকুর তদ্বির-তদারক করা, স্নানের ঘর গরম করা, ময়দা মেখে নিজেদের খাবার রুটি সেঁকে নেয়া, এসব কাজের পক্ষে এখনও দিব্যি শক্তসমর্থ আছে। বুড়ো আবার রুটির কারখানায় তৈরি 'রাষ্ট্রীয়' রুটি খেতে পারে না। আর তারপর কেন যেন ওর মনে হল, 'একা-একা বুড়িরও লিচ্চয় খুব খারাপ নাগে।'

বাড়ি ফিরে ছেলেদের কথা মনে করে একগ্লাস মদ খেল বুড়ো, তারপর নিজের ভাবনা ভাবতে বসল। 'নিজের ছোট্ট কুঁড়েখান বেচে দে' বুড়ি সচ্ছন্দে আমার ঘরে এসে থাকতে পারে। আর ঘর বেচে যে-ট্যাকা পাবে তা জমা করে রাখতে পারে ব্যাঙ্কে। মেয়েছেলেটা আমার এখেনে থাকলে মন্দ হয় না। থাকুক-না কেনে, তাইলে ঘরদোর এত খালি-খালি ঠেকে না। অন্ততপক্ষে চ্যানের ঘরে ভাপে চ্যান সারতে পারব ভালোরকম, তাপ্পর ঘুমটেও হবে তোফা... টেবিল সাজাবার নোক পাওয়া যাবে তাইলে, কেউ একজনা আমারে কওয়ার থাকবে যে খানা তৈরি। বাড়িটেও জ্যান্ত হয়ে ওঠবে-নে, মনে লিবে ফের মানুষের বসত হয়েচে ভুতের বাড়িটেয়! উনোনের কাছে কেউ যখন চিম্টা ঠন্ঠন করে আর চিম্নি দে' সেঁকা রুটির ভর্ভরে গন্ধ ওঠে, তখন বাড়িঘরের চেহারাই কেমন পালটে যায়। কিংবা রাত্তিরে যখন ঘুম আসবে না, তখন দুটো সুখ-দুঃখের কথা কওয়ার নোক জোটবে এট্টা... সত্যি, মেয়েছেলেটা যদি এখেনে এসে বাস করে তো ভারি ভালো হয়। যাই বল-না কেন বাপু, কথায় বলে-না গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, ব্যাপারটে হল গে' তাই...' ভাবতে-ভাবতে ব্যাপারটা সত্যিসত্যিই ঘটতে যাচ্ছে মনে করে বুড়ো রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ঠিক করল, পরের রবিবার ও গিয়ে ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না মালিশেভার সঙ্গে দেখা করবে। মালিশেভাও বুড়ো হয়েছে, তবে অতাভিনার চেয়ে সে বয়সে ছোট আর মগজে বুদ্ধিসাধ্যিও রাখে খানিক। বহুকাল আগে একসময়ে বুড়ো চুপিচুপি এই ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌নার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিল। তখন ও বুড়ো নয়, তর্‌তাজা জোয়ান, আর সুন্দরী, খেয়ালি, অল্পবয়সী ওল্‌গাকে ও সেদিন দারুণ ভালোবেসে ফেলেছিল। ওল্‌গাদের বাড়িতে ঘটক পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করবে এমন কথাও ভেবেছিল ও, কিন্তু এইসময়ে বিপ্লব এসে সব গণ্ডগোল করে দিল। একদিন হঠাৎ এক তরুণ কমিশার এসে উদয় হল গাঁয়ে আর দেখতে-দেখতে ওল্‌গার মাথাটা দিল ঘুরিয়ে, তারপর একদিন ওল্‌গাকে নিয়ে কোথায় চলে গেল সে। হ্যাঁ, এ-কাজটা সে ভালোমতোই করতে পেরেছিল, কিন্তু তারপর কোথায় যেন সে বেপাত্তা হয়ে গেল। নিশ্চয়ই যুদ্ধে মারা পড়েছিল আর-কি। এরপর ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না ফের গাঁয়ে ফিরে আসে আর তার পর থেকে গাঁয়েই রয়ে যায়, তবে একা-একা। আরেক দিন — তখনও ওর যুবা-বয়স, তবে তার মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে — গ্লুখভ গ্রাম-সোভিয়েতের অফিসে ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌নার সঙ্গে দেখা করে (ওল্‌গা তখন সোভিয়েতের সম্পাদিকা) তার কাছে মনের কথা খুলে বলে। তা, ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না শুনে প্রথমটায় তো খেপে উঠল, তারপর কেঁদে ফেলল হু-হু করে। বলল, বীরপুরুষ কমিশারের সঙ্গে ঘর করার পর সে আর কাউকে কোনোদিন তার জীবনে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। গ্লুখভ অবশ্য তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে ওর কোনো বদ মতলব নেই, কেবল জানাতে চায় যে তাকে ভালোবাসে ও। তা, এতে দোষটা কী হল? এতে ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না আরও সাংঘাতিক খেপে গেল আর ফের জানিয়ে দিল যে দুনিয়ার সব লোককে একত্র করলেও তারা ওর প্রাণের প্রিয় কমিশারের পায়ের নখের যুগ্যি হবে না। সত্যি কথা বলতে কী, ওর এই কমিশারের ব্যাখ্যান সাতখানা করে বলে-বলে গোটা গাঁয়ের পুরুষমানুষকে ওল্‌গা এতই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে গ্লুখভ ছাড়া অন্যরাও ওকে শতহস্ত দূরে রেখে চলত।

কিন্তু তারপর বহু বছর কেটে গেছে। ওসব পীরিতের ঘোর-টোরও কেটে গেছে কবে, ভুলেও যাওয়া গেছে সবকিছু। বহুদিন থেকেই জীবন চলেছে সম্পূর্ণ নতুন পথে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে... এখন কিন্তু বুড়ো গ্লুখভ আর অবসরপ্রাপ্ত, পেন্সনভোগী ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না মালিশেভার মধ্যে কিছুটা অদ্ভুত ধরনের একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বাইরের কাজে বুড়ো এখন ওল্‌গাকে প্রায়ই

সাহায্য করে থাকে: শীতকালে ওর বাড়ির চালের আর উঠোনের জমা-বরফ সাফ করে দেয়, জ্বালানির কাঠও চিরেফেঁড়ে দেয় কিছু, ঝাঁটার লম্বা হাতলটা লাগিয়ে দেয়, ঘরের চাল মেরামত করে দেয় জোড়াতাপ্পি দিয়ে, আর তারপর দু'জনে বসে সুখ-দুঃখের কথা কয় এক-আধটুকু। এমনকি সে-সময়ে ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না আধবোতলটাক মদও রাখে টেবিলের ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রুখভ এখনও মহিলার সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে আর কথাবার্তা চালায় বেশ সাবধানে, ধরাবাঁধা লাইন-বরাবর। যেমন, ও হয়তো বলে:

'এখন আমাদের যে-সরকার আচে এয়া একদম নিয়মমাফিক কাজ করচে, তাই লয়? সেকালের দিনে নোকে যত খুশি পব্বতের পরমায়ু পেয়ে বেঁচে থাকত, কিন্তু তারে লিয়ে কারও কোনো ফায়দা ছেল না, নোকে বাঁচত একবারে না-হক। কিন্তু এখন বুড়া হলেই নোকে পেন্সন পায়। কিন্তু বলি, পেত্যেক মাসে ওয়ারা আমারে পেন্সন দেয় কেনে তাই কও? আমার ছেলে আচে, মাঝেমধ্যে বাড়ি আসে সে, আর কখনও-সখনও পাঁচটা করে রুব্‌লও দেয়। তা, মাঝেমধ্যে দিতে ভুলে গেলেও তাই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সরকারের লিয়মের লড়চড় নাই, একদম বাঁধা লিয়ম — মাসে-মাসে এস আর ট্যাকা নে যাও। হ্যাঁ, সেই-যে সেকালে কমিশাররা ছেল, তারা জানত কত ধানে কত চাল হয়। তারা জেবন পাত করে গ্যাচে সবাই — সুখের ভবিষ্যৎ আর কমিউনিজমের জন্যে! ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না আমি বলি কী, আমাদের কমিশারদের কথা স্মরণ করে আমরা এক-মিনিট খাড়া দাঁইড়ে রই।'

কিন্তু দেখা যায় এসব কথায় ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌নার আর মন ভেজে না। চাঁচাছোলা গলায় সে হয়তো বলে, 'আরে, খুব হয়েচে, বোসো দিনি। এখন আর আদিখ্যেতা করে নাভ কী?.. এসব কবে চুকেবুকে গ্যাচে তার ঠিক নাই।'

বুড়ি আজকাল তার কমিশারের কথাও বড়-একটা বলে না, বরং রাত্রে কেমন সব অদ্ভুত অনুভূতি 'চেপে বসে' তার ওপর তার কথাই বলতে চায় সাতখানা করে।

'হঠাৎ, কোত্থাও কিছু নাই, কেমন এট্টা অদ্ভুত ভাব চেপে বসতে থাকে আমার উপ্‌রি। মনে নেয় আমার দিন বোধহয় কাবার হয়ে এল, মিত্যু ঘনিয়ে এসেচে আমার...'

'ঠিক কোনখানটা তোমারে চেপে বসে কও দিনি? বুকের উপ্‌রি?'

'সব্বাঙ্গের উপ্রি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব্বাঙ্গের উপ্রি! মনে ভাবি, আয়ু শেষ হয়ে এল আমার। আর তাম্পর আমার হাত-পা কেমন অসাড় হয়ে যায়, লাড়তে-চাড়তে পারি নে কিছু! আর মনে নেয় যেন কোথায় ভেসে-ভেসে চলে যাচ্চি। ভাসচি তো ভাসচিই...'

'বটে,' গলায় দরদ ঢেলে বলে গ্লুখভ। 'ব্যাপারটে তাইলে ওইরকম। তা কোনদিন তুমি একদম ভেসে চলেই না-যাও।'

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বুড়ো আরও ঘনঘন মালিশেভার বাড়ি আসে। বারান্দায় একসঙ্গে বসে মধু দিয়ে চা খায় দু'জনে, সঙ্গটুকু দু'জনেরই পছন্দসই। বার্চ-বাকলের ছোট ডোঙায় করে বুড়ির জন্যে মধু নিয়ে আসে বুড়ো।

'কী, বড্ড একা-একা নাগচে নাকি?' মালিশেভা হয়তো শুধোয়।

এর উত্তরে কী-যে বলা উচিত ভেবে পায় না গ্লুখভ। সর্বদাই তার ভয়, পাছে ভুল উত্তর দিয়ে বসে আর মালিশেভা তাকে লজ্জা দেয়। পাকেপ্রকারে বুড়ি তাকে বুঝিয়ে দেয় যে যদিও তার নিজের বয়স সত্তর হতে চলেছে তবু তার উচিত নিজে মুখ বুজিয়ে থেকে খালি বুড়ির কথাই শুনে যাওয়া।

'কী, একা-একা নাগচে?'

'তা...,' অনির্দিষ্টভাবে কথা শুরু করে গ্লুখভ। 'তা, অভাব তো এট্টা ঘটল বটেই। যতই যাই হোক, দু'কুড়ি-দশটা বচ্ছর একসাথে কাটালাম তো।'

'তা এক শত বছরও একসাথে কাটাও-না কেনে, তাতে হলটা কী! কোনো মানে আচে এয়ার? হাতিগুলা তো একেকটা দুই শত বচ্ছর বাঁচে, তো তাতে কী আসে-যায়?'

কথার ছিরি দেখে চটে ওঠে গ্লুখভ। বলে:

'জানো, আমার তিন-তিনটে ছেলে নড়াইয়ে খতম হয়েচে! আর তুমি এতবড় কথা বলচ আমারে...'

'আমি কিছুই বলচি না তোমারে,' ওল্‌গা সের্গেয়েভ্‌না ক্যাঁট করে জবাব দিল। 'ছেলেরা দেশের জন্যে জান দেচে বৈ তো কিছু লয়।'

'লিচ্চয়, বউয়ের অভাব বোধ কচ্চি বই-কি!' এবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে জবাব দিল গ্লুখভ। 'আমার জন্যে জেবনে কত-কী সইতে হয়েচে

তারে! মুখ বুজে সয়ে গ্যাচে সব। অল্পবয়েসে আমার এট্টু বেশি চনমনে ভাব ছেল, জানোই তো। ফুর্তিফাত্তা করতে ভালোবাসতাম... তা, বউ সব সয়ে গ্যাচে... সত্যি, বড্ড ক্ষেতি হয়ে গেল।'

'সমাজ-চেতনা...' হঠাৎ বলল মালিশেভা, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। 'তোমাদেরে, মরদদেরে, কাদা ছানার মতন করে বহুত্ গড়েপিটে নেয়ার দরকার পড়ে! তোমাদেরে মানুষের মতন করে তুলতে আরও দুই শত বচ্ছর নেগে যাবে দেখতে পাচ্চি। যেমন ধর, তুমি। তুমি নোকটা বউয়ের সাথে পঞ্চাশটে বছর ঘর করলে... আর এখন? এখন তা লিয়ে বলার মতন কিছু খুঁজে পাচ্চ না। আমার সব্জি-বাগানে অনেক আগাছা আচে, বুইলে। তারা জম্মায় আর বাঁচে বছরের-পর-বছর। আর ওগুলার পাশেই আচে ভিক্টোরিয়া স্ট্রবেরির চারা। কিন্তু ওই দুইয়ের মধ্যে তফাত আচে, না কী বল?'

'এমন রণচন্ডী মুত্তিটে ধরেচ কেনে কও দিনি?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে গ্লুখভ বলে।

'দুইয়ের মধ্যে এট্টা তফাত আচে, না কী বল? শুধোচ্চি তোমারে!'

'কিন্তু দুইয়ের মধ্যে তুলনাটা কচ্চ কেমন করে...'

'তুলনা কচ্চি, আর করবও! কারণ কিছু-কিছু নোক আচে যারা বাঁচার মতন বাঁচে আর সাক্ষাৎ আগুনের মতন দাউদাউ করে জ্বলে, আর বাকি সবাই ছাইচাপা হয়ে পড়ে থাকে। কারও-কারও জেবনের প্রেতিটি মুহুত্ত তাৎপয্যপুন্ন, আর বাকি সবাকার... তারা শুধু বাঁধা কাজ করে যায়, এইমাত্তর। পাল-ধরানোর ঘোড়া!'

'সবাই কিছু তোমার কমিশার হতে পারে না,' চটেমটে বলল গ্লুখভ। 'পাল-ধরানোর ঘোড়া' কথাটায় মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল তার।

'দু'কুড়ি-দশটা বচ্ছর একসাথে কাটালাম তো!' মালিশেভা ভেংচি কাটল গ্লুখভকে। 'কিন্তু তার মধ্যি এট্টা হপ্তারও কোনো বিশেষ তাৎপয্য আচে কি?'

'আচে বৈকি, অনেক তাৎপয্য আচে। যথেষ্টরও বেশি আচে।'

'সে তো বুইতেই পারচি!' বলে মালিশেভা ঠোঁটদুটো কুঁচকে 'গাঁয়ের পাদ্রির নাক'এর মতো করে তুলল।

গুখভ অনুমান করল, যে-কোনো কারণেই হোক সে বুড়িকে চটিয়ে তুলেছে। কিন্তু বুড়ির চটার কারণটা যে কী তা প্রাণপণে মাথা ঘামিয়েও বের করতে পারল না।

তবু সে বুড়ির বাড়ি যাওয়া বা তার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করল না। কখনও-কখনও দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়, কখনও-বা ফল অতটা খারাপ হয় না, বরং বন্ধুভাবেই পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। তবু যাহোক সন্ধেবেলায় সময়টা কাটে মন্দ নয়।

পরের রবিবার গুখভ মালিশেভার বাড়ি এল, তবে সঙ্গে করে কুড়ুল বা হাত-করাতটা আনল না। ওর উদ্দেশ্য ছিল মালিশেভার সঙ্গে আলোচনা করা ও তার পরামর্শ নেয়া। বলল:

'তোমার এট্টা পরামশ্য চাই, সের্গেয়েভ্না। এট্টা ব্যাপারে আমারে সাহায্য করতে নাগবে।'

'কী হল? ব্যাপার কী?' ব্যাপারটা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল মালিশেভা। লোককে পরামর্শ দেয়া ওর ভারি পছন্দ।

'তুমি কি অতাভিনা বলে এক বুড়িরে চেনো?'

'তার আবার কী হল?'

'তুমি কি তার সাথে এটু কথা বলে দেখতে পার যে সে আমার সাথে থাকতে রাজি আচে কিনা? সে তার লিজের কুঁড়েখান বেচে দিতে পারে, কিংবা কিছুকাল তালাবন্ধ করে রেখে দিতে পারে। ইতিমধ্যে দিনকয় আমরা একসাথে থাকব, দেখব বনিবনা কেমন হয়। বনিবনা হলে অতাভিনা তার কুঁড়েখান বেচে দিতে পারে। আগে থেকে ঝুঁকি নেয়ার দরকার নাই। তা, এ-ব্যাপারে তুমি কী মনে কর? নিজে ওয়ারে একথা শুধোতে আমার সাহস হয় না, কীভাবে পরস্তাবটে পাড়লে ভালো হয় তা তুমিই ভালো বুইবে। আমি ওয়ারে যত্ন-আত্তি করব-নে... যতই যাই হোক, দুই পায়ের থেকে চার পায়ের অবলম্বন পেলে আমাদের দুইজনারই মনের জোর বাড়বে, তা পায়ের খুঁটো-চারটে আগের মতন জোরদার না-হলেই বা কী! তা, তুমি কী মনে কর?' সাধারণত সে যত কথা বলে এবার তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলার ছিল তার, আর সে কথাও বলছিল অসম্ভব তাড়াতাড়ি — আসলে লজ্জা পাচ্ছিল সে। 'কথাটা নে' উল্‌টেপাল্‌টে অনেক ভেবেচি। তা এখন এট্টা সমাধান পেয়ে গেচি এর। একার জেবন বড় কষ্টকর, বড় জঘন্য। আর

আমার মনে লিচ্চে যে এয়াতে অতাভিনার পক্ষেও সুবিধে হবে। তা, তুমি কী মনে কর?'

কথাটা শুনে মালিশেভা দারুণ হকচকিয়ে গিয়েছিল। এত অবাক হয়েছিল সে যে প্রথম-প্রথম কী-যে বলবে তাই ভেবে পাচ্ছিল না।

'বে' করতে চাও তুমি? অ্যাঁ?'

'এরে বে' করা বলা চলে কিনা সন্দেহ... জেবনটারে এট্টু সহনীয় করে তোলার জন্যে একসাথে থাকব দুইজনা, এই আর-কি।'

'আইনের চোখে এরেই বে' করা বলে। সত্যি কথাটা কইতে মুখে বাধচে কেনে বাপু?'

গুখভ পিছু হটতে বাধ্য হল।

'আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আচে, বে-ই করচি না-হয়। তা, তাতে দোষের আচে কিছু?'

এক ধরনের চাপা একটা বিদ্বেষ নিয়ে আর কেমন সুদূর হয়ে গিয়ে মালিশেভা বুড়োকে ভালো করে এক-নজর ঠাহর করে দেখল।

'অতাভিনা কি রাজি হবে? অবিশ্যি তুমি তো বলচ যে ওর সাথে কথা বলার সময় পাও নাই...'

'সে এখনও এ-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে না! সেজন্যেই আমি তোমারে পরস্তাবটে করতে বলচি। ওয়ার সাথে কথা বলে ওয়ারে রাজি করানোর এক-আধটুক চেষ্টা পেলে ভালো হয়। বুড়ি আবার ধর্ম্মিষ্টি, বুইলে তো, বলতে পারে এয়া পাপকাজ... কিন্তু বল তো, এয়াতে পাপটে কী? জিনিসটে বিবেচনা করে দ্যাখো। আমিও একা মানুষ, সে-ও একা...'

'শহরে তার এট্টা মেয়ে আচে।'

'তাতে কী! আমারও এট্টা ছেলে আচে শহরে। তা, আজকালকার দিনকালে এয়াতে কোনো নাভ হয় না। কিন্তু আমরা দু'জনায় একসাথে থাকলে বাকি জেবনটা একরকম করে পার করে দিতে পারব। আমাদের মধ্যে যে-পেরথম মরবে তারে কবর দেবার নোক থাকবে একজনা।'

'কিন্তু তোমাদের দু'জনারই ছেলেপিলে আচে!' বিরক্তিতে হঠাৎ গলা চড়াল মালিশেভা। 'নিজেদেরে এমন অনাথ ঠাওরানোর কী হল এমন?'

গুখভ এর কোনো জবাব দিল না। উলটে ধারালো রাগী চোখে মালিশেভার দিকে তাকাল। ভাবল, 'ওরে কামড়াচ্চেটা কিসে?'

বলল, 'কী হল, সের্গেয়েভ্না?'

'আমার আবার কী হবে? বে' করতে যাচ্ছ তোমরা, আমি না। আর তুমি কিনা শুধোচ্চ, আমার কী হল? আমার কী হবে, আমি ঠিক আচি।'

'তোমার মেজাজ বিগড়েচে টের পাচ্চি...'

'কার? আমার? মেজাজ বিগড়েচে? মোটেই লয়! দ্যাখো কান্ড একবার! উনি বে' করতে যাচ্চেন! তা, তুমি চাও যে আমি অতাভিনার সাথে কথা বলি, কেমন? ঠিক আচে, কথা বলব।' এবার মালিশেভার অপ্রস্তুত হওয়ার পালা। দমকে-দমকে হুড়মুড় করে কথা বলে চলল সে। 'কথা কওয়ার জন্যে তারে ডেকে আনব অখন, আমার এয়াতে কোনো অসুবিধা নাই। সে রাজি আচে কিনা দেখব। আমি রাগ করতে যাব কেনে? তোমাদেরে দেখেই নোকে হাসাহাসি করবে, আমারে দেখে লয়।'

'করবে কী?'

'করবে কী মানে?'

'নোকে হাসাহাসি করবে কী?'

'তাইলে কী ভাবো — নোকে খুশি হবে?'

'বুড়া-বুড়ি কি কোনোদিন বে-সাদি করে না?'

'তা, করে বৈকি কোনো-কোনো সময়। ঠিক আচে, কাল দুক্কুরবেলা খাওয়ার সময় এস... অতাভিনারে আমি আরেটু আগেই আসতে কব অখন, তাইলে তুমি আসার আগে কথাবাত্তা সেরে নেয়া যাবে। তাম্পর তুমি আসবে। হ্যাঁ, তা বুড়াবয়সে বে-সাদি কোনো-কোনো সময় হয় বৈকি। অনেক বুড়া-বুড়ি বে' করে! তা, আমি ওয়ার সাথে কথা বলব অখন, চিন্তা কোরো না। লিচ্চয় কথা বলব।'

মালিশেভার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে আসতে-আসতে গ্লুখভ কেমন একটা ধাঁধায় পড়ে গেল। মালিশেভার মনে যেন কী-একটা আছে, টের পেল সে। বুড়ি সত্যিই ভারি অদ্ভুত ধরনের, তাতে সন্দেহ নেই। সর্বদাই যেন কী একটা ব্যাপারে চটে আছে বলে মনে হয়। সর্বদাই চায় সবাইকে বদলে দিতে, অন্যরকম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায় সবাইকে। কী করে বাঁচা উচিত তাই শিক্ষা দেয়, লোকের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে, রায় দেয়। একবার বুড়ো এমনও ভাবল যে ফিরে গিয়ে মালিশেভাকে বলবে কিনা সাহায্যের দরকার নেই ওর, নিজেই ও যথেষ্ট সামলাতে পারবে ব্যাপারটা। কথাটা ভালো করে ভেবে দেখার জন্যে রাস্তার মধ্যে থামলও একবার। তারপর ভাবল, কী এসে-যায় এতে? বুড়ি কথাটা বলেই দেখুক-না। নিজে তো সে অত ভালো করে গুছিয়ে

কথা বলতে পারবে না। বুড়ি বদমেজাজী হতে পারে, তবে কথা যখন দিয়েছে তখন কাজটা ও করবেই।

পরদিন দুই বুড়ি — মালিশেভা আর অতাভিনা — নিজেদের মধ্যে দেখা করে কথাবার্তা বলল।

অতাভিনা মালিশেভার বাড়িতে এসেছিল। বাড়ি ঢুকে প্রথমেই সে যা করল তা হল, সোজা সামনে ঘরের কোণের দিকে তাকানো। আশা ছিল যদি আইকন দেখতে পায় একটা। তারপর বিনীতভাবে ভেলভেটে-মোড়া সোফাটার এককোণে বসে পড়ে সুপ্রভাত জানাল।

'যে-জন্যে তোমারে আমি ডেকে পাঠিয়েচি তা এই,' সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করল মালিশেভা। 'বুড়া গ্রুখভ্‌রে চেনো?'

'এমেলিয়ান ইগ্নেগোরিচ? চিনি বৈকি। ওনার তিন ছেলে তো যুদ্ধে মারা গ্যাচে...'

'হ্যাঁ। তা, ও তোমারে বে' করতে চায়,' ক্যাঁট করে কথাটা বলল মালিশেভা। 'তুমি রাজি আচ?'

'হায়-হায়, ভগমান!' অতাভিনা দেহে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। 'ওনার এমন মতিভ্রম হল কেনে?'

'তা, বে' করবে নাই-বা কেনে?' আচমকা মালিশেভা যেন দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। 'দু'জনাই তোমরা ঝাড়া হাত-পা, স্বাধীন... জবাব দুবার আগে কথাটা ভালো করে ভেবে দ্যাখো। আর-দশজনা বুড়া-হাবড়ার মতনই নোকটা, তবে কিনা বাকি জেবনটা কাটাতে ও তোমারে সাহায্য করতে পারবে। তা, পরস্তাবটা কেমন বিবেচনা কর? বুড়া বলচে, তোমারে এখুনি বাড়ি বেচতে নাগবে না। আপাতত তালাবন্ধ করে রাখতে পার বাড়ি। তাম্পর দু'জনায় বনিবনা হলে বাড়ি বেচে ট্যাকাটা ব্যাঙ্কে জমা করে রাখতে পার। তা, বল শুনি, পরস্তাবটা কেমন বিবেচনা কর?'

'আমি কী বিবেচনা করব, কও? মাথায় আমার ভালোমন্দ কিছু আসচে না। সাত-তাড়াতাড়ি এমন এট্টা বে'র ব্যাপারে আমি রাজি হয়ে যাই কী প্রেকারে?' বলে অল্প-একটু হাসল অতাভিনা। হাসিটা কিন্তু বেশ আন্তরিক ঠেকল। 'সত্যি! কথা শুনে মাথামুড় বিগড়ে যাবার দাখিল হয়েচে। মরি-মরি, যা একখান কনের ছিরি-না!'

'তা, বরেরও তো ছিরি ওই প্রেকারের। কিন্তু সে যাই হোক, তোমার মত কী শুনি?'

'এট্টু সবুর কর, সের্গেয়েভ্না। আগে এট্টু দম ফেলতে দ্যাও আমারে...'

'বুড়া কিন্তু এখুনি এসে পড়বে তোমার মত জানতে।'

'হায়-হায়!' বলে অতাভিনা সত্যিসত্যিই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকাল। ফের বসে পড়ল তারপর। বলল, 'সত্যি, এটা এট্টা সমিস্যের কথা!'

'আমি তো দেখতে পাচ্ছি তুমি পেরায় রাজি হয়ে এসেচ।'

আর কথাটা শুনে হঠাৎ অতাভিনা বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে শুরু করল। বলল:

'আমার কথা হল গে এই, সের্গেয়েভ্না। বুড়া মানুষটা খারাপ নোক লয়। উনি মদ খায় না, খামোকা মিথ্যে-মিথ্যে প্রেভু যিশুর নাম নেয় না, যেমনটা শুনেচি... কেবল...' বলতে-বলতে ঘটকীর দিকে তাকাল ও। 'আচ্ছা, এয়া তো মাঝেমধ্যে দেখা যায় যে বুড়া-বুড়ি একসাথে ঘর বাঁধচে, তাই-না...'

'তা, দেখা যায় বটে।'

'কিন্তু... আচ্ছা, ধর, যদি রাত্তিরবেলা নোকটা জ্বালাতন করে আমারে?'

শুনে মালিশেভার মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

'অ্যাঁ? কী?'

'পুরুষনোকে কেমনধারা হয় তুমি তো জানোই দিদি! পের্থম কথা, আমি জানতে চাই যে উনি অমনধারা বদ-মতলব আঁটবে না। আরেট্টা কথা, গাল পাড়া চলবে না। অবিশ্যি উনি বিড়িফুঁকা করে... তা, পুরুষনোকে সব্বাই বিড়িফুঁকা করে, ওয়াদের বিড়িফুঁকা বন্ধ করার উপায় নাই।'

'তাইলে দেখা যাচ্চে, তুমি রাজি আচ! তাই তো?' অবাক হয়ে বলে উঠল মালিশেভা।

'আরে, রোসো দিদি, রোসো। অমন তাড়াহুড়া করুচ কেনে! হ্যাঁ, যা বলছেলাম। আমি তো খালি এট্টার-পর-এট্টা শত্ত চাইপে চলেচি — ওনার হেন করা চলবে না, তেন করা চলবে না, এইসব। তা, বুড়া মানুষটে হেনতেন সাত-সতেরো শুনে ভাবতে পারে, "তাইলে আমার করা চলবেটা কী?"

আর তাম্পর তোমার এই ঘটকালি ফেঁসে যাবে-নে।' আবার নিঃশব্দে অল্প করে হাসল অতাভিনা। 'বলতেই নাগে এমন একখান কথা কোনোদিন আমার মাথায় আসে নাই... হায়-হায়-হায়-হায়! তবে ব্যাপারখান তেমন মন্দ লয়, না কী বল? আমার এক অনেকদিনকার সই — সে থাকত গে আমি আগে যেখেনে থাকতাম সেইখেনে, বুলানিখায় — তারও জেবনে এই ব্যাপার ঘটেছেল। একদিন এক বুড়া এসে এটা-সেটা লিয়ে কথা বলতে-বলতে একসময় কথাটা পেড়ে বসল। বলল, "কুজ্‌মোভ্‌না, এস আমরা দুইজনা একত্তর থাকি।" তা তা-ই করল ওয়ারা। আজ পেরায় দুই বচ্ছর হল বুড়া মারা গ্যাচে, আর আমার সই এখন বুড়ার বাড়িতে বাস করচে। আমি জানি, ওয়াদের মধ্যে মনের মিলমিশ ছেল খুব। একসাথে কদ্দিন যেন ছেল ওয়ারা?... তা, পেরায় পাঁচ বচ্ছর হবে। বুড়া কোনোদিন বুড়ির নালিশ-ফৈরেদ করার মতন কোনো অনেয্য কাজ করে নাই। বুড়াবয়েসে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা বাড়ে তো, তাই। আজকালের ছেলেপেলের মতন হয় না তারা। চক্ষু মেলে একবার চারপাশে তাকালে এমন বহুত্‌ নোক দেখতে পাবে দিদি... হায়-হায়-হায়-হায়! কী-যে বলব আমি ভেবে সত্যি কূলকিনারা পাচ্চি নে। অবিশ্যি আমার পক্ষে শেষ জেবনটায় সোন্দর এট্টা ওম্‌অলা কুঁড়ের আশ্রয় পাওয়াটা মন্দ লয়... আমার নিজের ছোট্ট কুঁড়েখান তো ভেঙে পড়চে। শীতটে কেটে যাওয়ায় কী-যে খুশি হয়েচি বলতে পারি নে। কেনে যেন ঘরখান কিছুতে গরম করে উঠতে পারি নে। যতই কাঠ জ্বালাই-নে কেনে, মনে নেয় যেন জলের ঝাঁঝরিকলের নিচে বসে আচি।'

'তা, তুমি শহরে চলে গে মেয়ের সাথে থাক-না কেনে?'

'মেয়ের সাথে! বলচ কি দিদি! সে কী আর চেষ্টা করে দেখি নি ভাবচ? এমনিতেই বলে ওয়ারা ঠেসাঠেসি-গুঁতাগুঁতি করে আচে কোনোরকমে, তাম্পরে আবার... আমার নাতি-নাতনিগুলো যখন কচি ছেল তখন ওদের সাথে থাকতাম। কষ্ট পেয়েচি অনেক। ছ্যানাপোনারা এখন ইশ্‌কুলে যেতে শুরু করেচে। তা, সত্যিই খুশি হয়েচি — ওয়ারা অন্তত এই ছোট্ট কুঁড়েখান কিনে দেচে আমারে। মেয়েটারে বে' দুবার সময় বুলানিখায় আমার লিজের বাড়িখান বেচে দেলাম। সে-বাড়িখান সত্যিকার শক্তপোক্ত এট্টা বাড়ি ছেল বটে। আরও এক শত বচ্ছর খাড়া হয়ে থাকার মতন বাড়ি। কিন্তু বেচে দেলাম বাড়িখান। বলে, বেচতে হল আমারে। সমবায়ের একখান ফেলাট কেনার জন্যে ট্যাকার দরকার ছেল মেয়ে-জামাইয়ের। কিন্তু কোত্থেকে ট্যাকা পাবে তারা? জামাই সদ্য ফৌজ

থেকে ছাড়া পেয়েছেল, আর আমার মেয়ে কারিগরি বিদ্যালয় শেষ করেছেল সবে। তা, ওয়ারা বলল — মা, তোমার বাড়িখান বেচে দ্যাও। আর তুমি যদি শেষপর্যন্ত আমাদের সাথে থাকতে না-চাও,তাইলে পরে তোমারে দেখেশুনে আরেকখান কুঁড়ে কিনে দুব অখন। কাজেই আমি তখনকার মতন ওয়াদের সাথে থেকে গেলাম, লাতিপুতিরে বড় করে তোললাম, কিন্তু তাপ্পরে বললাম — না, আর থাকতে চাই নে, আমারে বরং নিজের একখান মাথাগোঁজার আস্তানা কিনে দে বাপু, তা সে যত ছোটাখাটই হোক-না কেনে। তোদের এই শহরে আর তিষ্ঠুতে পাচ্চি নে, মনমেজাজ আমার বিগড়ে যাচ্চে একবারে। তা, খানিকটে গাঁইগুঁই-চ্যাঁচামেচি করে তারা ট্যাকার যোগাড় করে ফেললে। কিন্তু দেখা গেল বুলানিখায় বাড়ির দর বেশি, এ-গাঁয়ে শস্তা, কাজেই শেষপর্যন্ত এখেনেই মাথা গুঁজে রয়ে গেলাম। অবিশ্যি এই বুড়াবয়েসে এয়া মন্দ হবে না... সোন্দর এট্টা ওম্অলা বাড়িতে বাস করা... কথাটা মন্দ ঠেকচে না মোটেই।'

এই কথাবার্তার কিছুই জানত না বুড়ো গ্লুখভ। সে কেবল জানত যে দুই বুড়ির মধ্যে কথাবার্তা হবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু সে-আলোচনা যে কোনদিকে মোড় নেবে তার কোনো ধারণাই ছিল না ওর। তবে বলা তো যায় না, তৈরি হয়ে যাওয়া দরকার — এই মনে করে সে নতুন একখানা জ্যাকেট গায়ে চাপাল, মিষ্টি সুগন্ধি এক-বোতল মদ আর একডোঙা মধু সঙ্গে নিল, তারপর যাত্রা করল মালিশেভার বাড়ির দিকে।

বাড়িতে ঢুকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানাল সে দু'জনকে। তারপর কী কারণে যেন সলজ্জ ভাব করে টেবিলের ওপর মদের বোতল আর মধুর ডোঙাটা রাখল। অবশেষে তামাকের থলির জন্যে পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

'রোসো, রোসো। বোতল-টোতল পরে বার কোরো অখন,' দুম করে বলে উঠল মালিশেভা। 'অত ব্যস্ত হবার মতন কিছু হয় নাই, বুইলে!'

শুনে বুড়োর বুকখানা বসে গেল যেন। অতাভিনার সঙ্গে একত্রে বাস করার ধারণাটায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ও, কী করবে না-করবে আগে থেকে ভেবেও রেখেছে সবকিছু। কিন্তু এখন এ কী শুনছে সে?

মালিশেভা বলতে লাগল, 'তোমাদের দুইজনার কী-কী বলার আচে সব শুনেচি... অবিশ্যি এয়া তোমাদের নিজেদের জেবনের ব্যাপার, ইচ্ছা হলে দু'জনায় জুটি বাঁধতেও পার... শুনেচি কিছু-কিছু নোক বুড়াবয়েসে বন্ধ

পাগল হয়ে যায়, কিন্তু তাতেও কিছু যায়-আসে না। আমি শুধু তোমাদের দু'জনারে এই কথাটা শুধোতে চাই: নজ্জা করে না তোমাদের এমন কাণ্ড করতে?' দু'জনের মুখের ওপর কথাগুলো যেন ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে লাগল মালিশ্বেভা, এমন অসম্ভব নিষ্ঠুরভাবে ছুঁড়ে মারতে লাগল কথাগুলো যে তার কোনো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কী-একটা যেন গোপন যন্ত্রণায় ছটফট-করা হৃদয়ের সবটুকু বিষ ঢেলে-ঢেলে একটার-পর-একটা কথা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে লাগল দু'জনের মুখে। বিবাহেচ্ছু দুই বুড়ো-বুড়ি লজ্জায় কীরকম লাল হয়ে উঠেছে, নিজের-নিজের জায়গায় বসে অস্বস্তিতে কীরকম ছটফট করছে, দুমড়ে-মুচড়ে উঠছে, কতখানি কষ্ট পাচ্ছে তারা — সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই ওর। ও বলে চলেছে, 'এয়ার পরে দুনিয়ার সামনে মুখ দেখাবে কেমন করে তোমরা? কেমন করে, শুনি? অনেক নোক তো একা-একাই সারাটা জেবন কাইটে দেয়... আমিও বলতে গেলে সারা জেবন একা কাইটেচি, সেই আমার তেইশ বছর বয়েস থেকে... তা, তোমরা কি ভাবো কেউ আমার কাছে বে'র পরস্তাব দেয় নাই? দেচে বৈকি, অনেকেই দেচে। ভাবো কী, রাত্তিরবেলা কেউ আমার জানলায় এসে টোকা দেয় নাই? দেচে বৈকি, কত নোক-যে দেচে তার গোনাগুন্‌তি নাই। এমন কি গ্লুখভ তুমিও। তুমিও কি গ্রাম-সোভিয়েত আপিসে আমার কাছে এসে কও নাই যে আমারে ছাড়া তুমি তিষ্টুতে পারচ না? কও নাই তুমি? চুপ করে আচ কেনে, জবাব দ্যাও!'

গ্লুখভ তখন মনে-মনে ভাবছে, ধরণী দ্বিধা হও, গ্রাস করে লাও আমারে!

বিড়বিড় করে অস্পষ্টভাবে ও শুধু বলতে পারল, 'আমার মুখ্যুমি হয়েছেল — আমি মাতাল ছেলাম তখন। কিন্তু আমি তো তোমার কাছে বে'র পরস্তাব দিই নাই... এখন ওসব কথা কয়ে নাভ কী?'

'মুখ্যুমি হয়েছেল! বটে! আর এখন উনি লায়েক হয়ে উঠেচেন, সত্তর বছর বয়েসে ফের বে' করতে চাইচেন। ভারি চালাক হয়েচেন দেখচি! আর তুমি, বুড়ি-হাবড়ি তুমিও!.. "আমারে ভেবে দেখতে হবে কথাটা... সোন্দর এট্টা ওম্‌অলা বাড়িতে থাকব।" মরি-মরি, নিজেরে আবার ধম্মিষ্টি মেয়েমানুষ বলে জাহির কর! বুড়ার মতনই নোংরা মন তোমার... তোমরা আবার অন্যের পাপের বিচের করতে নাগ। আর নিজেদের বেলা? নিজেদের বেলা কী? কমবয়েসীদের সামনে কী দিরিষ্টান্তই-না রাখচ তোমরা! সেকথা ভেবে দেখেচ

কোনোদিন? সমাজের প্রেতি নিজেদের দায়-দায়িত্বের কথা লিয়ে মাথা ঘামিয়েচ কখনও?' বলতে-বলতে টেবিলের ওপর হাতের আঙুলের শুকনো গাঁটগুলো সজোরে ঠুকল মালিশেভা। 'কোনোদিন বিবেচনা করেচ এসব কথা? তোমরা হলে গিয়ে আত্মসব্বস্ব মানুষ! অন্য নোকে পেরান পণ করে কাজ করে যাচ্চে আর তোমরা বে' করার মতলব আঁটচ... অন্য নোকেরে মদ খেতে আর অনেয্য সম্পক্ক পাতাতে নোভানি দিচ্চ, কেমন? নির্লজ্জ, বেহায়া জুটি বটে একখান!'

'বে' আবার কিসের?' গ্লুখভ বলে উঠল। অতাভিনা হতভম্ব হয়ে বসে ছিল। গ্লুখভ বলল, 'আমরা চুপচাপ একসাথে বসবাস করতাম, এই আর-কি। কিন্তু বে' কী জন্যে?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! একজোড়া রাস্তার ভিখিরির মতন! ছোঃ!'

'দ্যাখো, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্চে... বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্চে কিন্তু!' বলে বুড়ো গর্জন করে উঠল। তারপর সজোরে পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মালিশেভার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওর পিছু-পিছু অতাভিনাও বেরিয়ে এল বাড়িটা থেকে। সত্যি কথা বলতে কী, যেন গনগনে আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছে এমন ভাবে দু'জনে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল। বাড়িটার বাগানের ফটক পেরিয়ে আসার পর পরস্পরের দিকে এমন কি এক-নজর না-তাকিয়েই তারা দুই বিপরীত মুখে হাঁটতে শুরু করল। যদিও বাড়ি যেতে গেলে খানিকটা পথ তাদের একসঙ্গে যাবার কথা, তবু।

বাড়ি ফেরার আগে বুড়ো গ্লুখভ গাঁয়ের অনেকখানি পথ ঘুরেফিরে বেড়াল। তারপর বাড়ি ফিরে ঘেন্নায় রাগে থুথু ফেলতে আর গাল পাড়তে লাগল। এক-মুহূর্ত সে শান্ত হয়ে থাকতে পারছিল না। এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে একবার ভাবল, 'দুব নাকি কুত্তিটার ঘরখান আগুন নাগিয়ে জ্বাইলে!'

অবশ্য, বলা বাহুল্য, শেষপর্যন্ত সে কিছুই করল না। তবে নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করল যে আর কোনোদিন মালিশেভার ঘরে যাবে না, তার মুখ দেখবে না। এ-ঘটনার পর রাস্তায় মালিশেভার মুখোমুখি পড়ে গেলে সে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

ওদিকে অতাভিনা এরপর শহরে চলে গেল। নিয়মিত গির্জেয়

গিয়ে প্রার্থনা ক'রে নিজের পাপক্ষালনের উদ্দেশ্যে। বুড়ি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। যতদূর সম্ভব মালিশেভাকে এড়িয়ে চলতে লাগল সে।

এই আজগবি ঘটকালির ব্যাপারটা মালিশেভা অবশ্য কাউকে কোনোদিন বলে নি। গুখভ আর অতাভিনা দু'জনেই ভেবেছিল কথাটা সারা গাঁয়ে চাউর করে দেবে সে। কিন্তু না, এ নিয়ে একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ কোনোদিন শোনে নি।



দৈব-দুর্ঘটনা

ছেলেটার একটা পা মরা। জন্ম থেকেই ওইরকম। শুকনো, কোঁচকানো চাবুকের ফিতের মতো রোগা আর পাকানো পা-খানা ঝুলে থাকে সর্বদা। অতি কষ্টে তবে ছেলেটা পা নাড়তে পারে।

বেশ কয়েক বছর পা নিয়ে কোল্‌কা'র তেমন মাথাব্যথা ছিল না। অন্য ছেলেপিলেরা যখন দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখেছে, ও তখন শিখেছে তিন 'ঠ্যাঙ'এ ভর দিয়ে হাঁটতে — ক্রাচ ব্যবহারে ওর কোনো অসুবিধে হয় নি। অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে বড় হয়ে উঠেছে ও, বেড়া টপকে অন্যের ফলবাগানে ঢুকেছে, স্কিট্‌ল্‌স খেলেছে। আর কী সাংঘাতিক ভালোই-না স্কিট্‌ল্‌স খেলত ও! একখানা ক্রাচকে কোনাকুনি বাঁকিয়ে ঠেকো দিয়ে রেখে ও নিজের দেহের ভার রাখত ক্রাচখানার ওপর, তারপর লক্ষ্য ঠিক করে ছুড়ে দিত মুগুরখানা। আর মুগুরের ঘায়ে ঝপাং করে খান-ছয়েক স্কিট্‌ল্‌-পিন উড়ে যেত এদিক-সেদিক।

কিন্তু এরপর আরও কয়েক বছর কাটল। কোল্‌কা বেড়ে উঠল শক্তসমর্থ, সুপুরুষ তরুণ হয়ে। আর তখনই ক্রাচ দু'খানা হয়ে উঠল বাধাস্বরূপ। ওর বয়সী অন্য ছেলেরা যখন ক্লাব থেকে সন্ধেবেলা মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে শুরু করল, ওকে তখন বাড়ি ফিরে যেতে হোত একা-একা — অসহ্য দুই কেঠো সঙ্গীকে বগলে চেপে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে।

আর কোল্‌কার চঞ্চল, চতুর দুটো চোখে ঘনিয়ে উঠতে লাগল চিন্তার ছায়া।

প্রতি বছর প্রতিবেশীদের ঘর থেকে একটা-দুটো করে ছেলে ফৌজী প্রশিক্ষণ নিতে বাইরে যায়। এইসব ছেলেপিলেকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো

সর্বদাই একটা হৈ-হুল্লোড়ের ব্যাপার হয়ে থাকে। আর এ-সমস্ত সময়ে কোল্‌কা সাধারণত করে কী, নিজেদের বাড়ির ঢাকা বার-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেয়ালের তক্তার ফাঁকফোকর দিয়ে দেখতে থাকে ব্যাপারস্যাপার। ওরও তখন ভারি ইচ্ছে করে ফৌজের ডাকে প্রশিক্ষণ নিতে যেতে।

একদিন কোল্‌কার বাবা, যৌথখামারের মেকানিক আন্দ্রেই ভোরন্‌ত্‌সভ ছেলেকে এইরকম উঁকি দিতে দেখে ফেললেন। দেখে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু কোল্‌কা তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনে ফেলল। ফিরে তাকাল সে।

'কী করচিস ওখেনে?' যেতে-যেতে শুধোলেন বাপ।

প্রশ্ন শুনে কোল্‌কা কেমন লাল হয়ে উঠল।

বলল, 'কিছু না, এমনি দেখছিলাম।' তারপর নিজের কাজের টেবিলে ফিরে গেল। (দেয়ালঘড়ি আর হাতঘড়ি মেরামতের কাজ করে কোল্‌কা। দৈবাৎ বাইরের একজন লোক একবার গাঁয়ে এসেছিল আর তার কাছ থেকে এ-কাজটা ও শিখে নিয়েছে।)

দিন কেটে যেতে লাগল।

আর তারপর সকলের বেলাতে যা ঘটে কোল্‌কার বেলাতেও তাই ঘটল। প্রেমে পড়ল কোল্‌কা।

রাস্তার ঠিক ওপারে রঙ্‌করা খড়খড়িওয়ালা ছোট্ট একটা বাড়িতে বাস করে গ্লাশ্‌কা। ভারি চেঁচিয়ে কথা বলে মেয়েটা। জানলা দিয়ে রোজই কোল্‌কা ওকে দেখতে পায়। দ্যাখে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চঞ্চল গ্লাশ্‌কা খালি এদিক-সেদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে — কখনও যাচ্ছে মাটির নিচের ভাঁড়ারঘরে, কখনও বাগান থেকে হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে বের করে দিচ্ছে, আবার কখনও-বা প্রতিবেশীর শুয়োর ওদের সব্‌জিখেতের মাটি খুঁড়ে একশা করছে বলে প্রতিবেশীকে গালিগালাজ করছে।... সারাদিন রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ওর গলা শোনা যায়।

একদিন ওর রকমসকম লক্ষ্য করতে-করতে কোল্‌কার মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেল, 'আচ্ছা, মেয়েটা যখন তেমন সোন্দরী লয় তখন ওরে আমার বে' করতে বাধা কী!' আর ওই দিনটা থেকে গ্লাশ্‌কার কথা ও ভাবতে শুরু করল প্রত্যেক দিন। আচ্ছা একটা জ্বালা জুটল ওর জীবনে। অজানা কী-একটা যেন আকর্ষণ ওকে কাজের টেবিল থেকে পেছন দিকে টানতে

থাকে অহরহ আর নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায় ঢাকা বার-বারান্দাটায়।

মেয়েটাকে কখনও ও চেঁচিয়ে বলে, 'গ্লাশ্‌কা! কবে তোর বে' হবে রে, ছুঁড়ি? তোর বে'র সময় আমি যা একখান ফুর্তি করব-না!'

আর মুখরা গ্লাশ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'কেউ আমারে চায় না রে, কোলিয়া! আমি বলে কদ্দিন ধরে বে'র জন্যে হাত ধুয়ে বসে আচি!'

কোলিয়া ভাবে, 'আচ্ছা, নিলাজ মেয়ে তো দেখি তুই।' আর ওর ভাবুক ধূসর চোখদুটো কী-এক মমতায় নরম হয়ে ওঠে।

জুলাইয়ের আকাশ গাঁয়ের মাথার ওপর নীল আগুনের মতো ঝলমল করতে থাকে। মাটি থেকে যে গরম বাতাসের ভাপ আকাশে ওঠে তা যেন রূপকথার সুখ আর আনন্দের মায়া রচনা করে। জ্বলন্ত সূর্য দিনের শেষে ঝাঁপ দেয় নদীতে আর গোধূলির কনে-দেখা-আলো দেখতে-দেখতে নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। আর রাতগুলো এত নিথর, এত স্তব্ধ, বাতাসহীন মর্মান্তিক স্তব্ধ যে কী বলি!

গ্রীষ্মকালে কোল্‌কা ছোট্ট একটা চালায় ঘুমোয়। চালাটার একটা দেয়াল সদর রাস্তার গায়ে।

একদিন সন্ধেবেলা ওর কানে এল এক প্রেমিক-যুগল রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। ওর দেয়ালটার পাশেই এসে থামল তারা আর হঠাৎ কোল্‌কার বুকটা ধ্বক করে উঠল। কী করে যেন সঙ্গে সঙ্গে ও টের পেয়ে গেল যে যুগলের একজন হচ্ছে গ্লাশ্‌কা। যদিও গোড়ায় ওরা দু'জন চুপ করেই ছিল, তবু। ওদের অর্থহীন কানাকানি আর হাসির খিল্‌খিল শব্দ শুয়ে-শুয়ে শুনতে লাগল কোল্‌কা। ওইদিন রাত্রে প্রথম ক্রাচদুটোকে অভিশাপ দিয়ে কাঁদতে লাগল ও। বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদল। ভাবল, 'নাঃ, এভাবে আর বাঁচা যায় না! বাঁচা অসম্ভব!'

পরদিন ভোরে দিনের আলো ফুটতেই কোল্‌কা সোজা গিয়ে হাজির হল স্থানীয় ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ওর ভালোই। একসঙ্গে প্রায়ই ওরা শিকারে আর মাছ ধরতে যায়।

'কী ব্যাপার? এমন অসময়ে যে?' ডাক্তার শুধোলেন।

ঢাকা বার-বারান্দাটায় বসে কোল্‌কা ক্রাচ দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিল একটা।

বলল, 'আপনার কাছে বাড়তি কিছু কার্তুজ হবে? আমার আবার ফুইরে গ্যাচে।'

'কার্তুজ? আচ্ছা, দেখচি।' বলে ডাক্তার বাড়ির ভেতর গেলেন, তারপর মিনিট-খানেকের মধ্যে ফিরলেন একমুঠো কার্তুজ নিয়ে। বললেন, 'এই নাও।'

পকেটে কার্তুজ ক'টা রেখে একটা সিগারেট ধরাল কোল্কা। অদ্ভুত স্থিরচোখে ডাক্তারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঠোঁটদুটো বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকাল একবার, তারপর ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল।

'টোটার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আরে, ঠিক আচে। এ-সময়ে শিকারে যেতে আমার নিজেরও ভালো লাগত, কিন্তু...' বলে মাথার ছোট্ট টাকটা একবার চুলকোলেন ডাক্তার। 'অগস্টের আগে আমার আবার ছুটি পড়চে না।'

ডাক্তারের বাড়ির ফটক থেকে বেরিয়ে অল্প একটু দূরে গিয়েই থামল কোল্কা। তারপর রাস্তা-বরাবর দূরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অবশেষে ফের ফিরে এল ডাক্তারের কাছে।

বলল, 'টোটাগুলো ধরেন। আমার যথেষ্ট আচে।'

শুনে ভুরু কপালে তুললেন ডাক্তার।

'ব্যাপার কী? বুঝচি না তো!'

কোল্কা ভুরু কোঁচকাল।

'আমার পায়ের দিক একবার তাইকে দ্যাখেন দিনি...। একখান নকল পা চাই আমার। পঙ্গু হয়ে থেকে অনেকদিন কেটেচে, আর না।'

'ও, তাই বল।' কোল্কার চোখে চোখ রেখে ডাক্তার নিজেই কেমন লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন, 'এস তো দেখি ভেতরে।'

এরপর দু'জনে মিলে পা-টা পরীক্ষা করা শুরু হল।

'এখানটায় টের পাচ্চ কিছু?'

'পাচ্চি।'

'আর এখানে?'

'আবার টিপুন...। হ্যাঁ, পাচ্চি।'

'আচ্ছা, পারলে একবার নাড়াও দেখি। আবার নাড়াও। আচ্ছা, এবার একদিকে ঘোরাও। ঘোরাও, ঘোরাও, যতটা পার। ঠিক আচে।' সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে উঠলেন ডাক্তার। 'আমার মতে... নকল পা লাগানোর চেষ্টা করতে পার। পা-টা খাপ খাবে কিনা এখুনি অবশ্য বলা শক্ত, তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষেতি নেই। তবে এটা করতে হলে তোমার পা-টা কিন্তু এইখান থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। বুঝলে কথাটা?'

'হ্যাঁ, বোঝলাম।'

'চেষ্টা করে দেখতে পার। নকল পা পরে প্রথম-প্রথম হয়তো হাঁটতে পারবে না। কিছুদিন অভ্যেস করার দরকার পড়বে। বুঝলে?'

সেদিন বাড়ি ফিরে কোল্‌কা যাত্রার তোড়জোড়, গোছগাছ করতে লাগল। ও যেতে চায় শহরে, হাসপাতালে। ঠিক করল, মা-কে কথাটা জানাবে না। তবে বাবাকে একসময় উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বলল:

'আমি আমার এই ঠ্যাঙখান কেটে বাদ দিতে চাই, তাই শহরে যাচ্চি।'

'মানে?' ছেলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন আন্দ্রেই।

'নকল ঠ্যাঙ একখান এট্টু পরখ করে দেখতে চাই।'

এর এক সপ্তাহ পরে হাসপাতালে কোলিয়ার পায়ে অস্ত্রোপচার করা হল। নিচের অংশ কেটে বাদ দেবার পর পায়ের সাতাশ সেন্টিমিটার লম্বা ওপরের একটা খোঁটা রয়ে গেল মাত্র।

কাটা ঘা-টা অল্প-একটু শুকনোমাত্র বিছানার কম্বলের নিচে পায়ের খোঁটাখানা একটু-একটু নাড়াচাড়া করতে শুরু করল ও। অভ্যেস করতে হবে তো, তাই।

বাপ দেখতে এলেন ওকে। আর কাটা পায়ের খোঁটাটার দিকে একবারও না-তাকিয়ে ছেলের বিছানার পাশে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। অকেজো হলেও ছেলের তবু পা-খানা ছিল তো বটে, কিন্তু এখন-যে কিছুই রইল না।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কোল্‌কা সোজা ন... শহরে চলে গেল।

বাড়ি ফিরল ও আরও পনেরো দিন পরে। একটা ঝোলায় লম্বামতো কী একটা জিনিস নিয়ে।

ছেলেকে 'একঠেঙো' হয়ে ফিরতে দেখে ওর মায়ের তো খাবি খাওয়ার যোগাড়। ওঁর রকম দেখে কোল্‌কা হেসে ফেলে...

ঝোলার মুখ খুলে ঝকঝকে বার্নিশ-করা নকল পা-খানা বের করে ঘরের মেঝেয় রাখল ও।

'দ্যাখো দিনি — কেমন একখান ঠ্যাঙ্ বানিয়ে এনেচি!'

দারুণ কৌতূহল নিয়ে সবাই নকল পা-খানা পরীক্ষা করে দেখল। আর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে মুখ টিপে হাসতে লাগল কোল্কা। বাড়ি ফেরার পথে আগেই ও ভালো করে পা-খানা পরীক্ষা করে দেখেছে।

'কেমন ঝকঝক করতে নেগেচে... ভ্যালা রে ভ্যালা!' মা বললেন।

ওর বাবা পা-খানা তুলে নিয়ে ওস্তাদ মিস্ত্রির চোখে প্রত্যেকটা অংশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

শেষে বললেন, 'তা, মালটা বানিয়েচে ভালোই। বুড়া কুজ্মার ঠ্যাঙের খোঁটার মতন লয়।'

নকল পা-খানা পছন্দ হল সবার। যেমন কোলিয়ার তেমনি আর সকলেরও মনে হল যে অমন একখানা পা লাগিয়ে যে-কোনো গর্দভও অক্লেশে হাঁটতে পারে। পা-খানা তৈরি করতে যখন এতখানি কারিগরি কৌশলের প্রয়োজন পড়েছে, এত মজবুত আর সুঠাম পা-খানা, তাছাড়া বার্নিশ, নাটবল্টু আর বকলস ইত্যাদি সমেত এমন ঝকঝক করছে যখন জিনিসটা, তখন আর কথা নেই।

'ঠ্যাঙখান পরে দেখবি কবে?' একহাতে সজোরে পা-খানা তুলে ধরে বাবা শুধোলেন।

'পায়ের কাটা ঘা ঠিকমতন সারবে যখন। ডাক্তাররা তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেচে।'

অন্ধকার রাত। দূরে-দূরে আকাশের গায়ে গ্রীষ্মের বিদ্যুৎ-চম্কানি।

অন্যদিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই সেদিন নিজের চালায় গিয়ে সেঁধিয়েছে কোল্কা, তারপর বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করে আছে। ক্রমে সারা গাঁ নিস্তব্ধ হয়ে গেল, ঝিমিয়ে গেল সব শব্দ।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কোল্কা। তারপর ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে নকল পা-খানা ঠ্যাঙের খোঁটায় বাঁধাছাঁদা শুরু করে দিল। নকল পা লাগানো হয়ে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে নতুন প্রত্যঙ্গটা দেখতে লাগল।

শেষে হাসল। 'নাঃ, মন্দ বানায় নাই! পায়ের মতন পা বটে একখান, সত্যি!'

সাবধানে সিগারেটটা পিষে নিবিয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করল ও। কিন্তু মাতাল হলে যেমন হয় তেমনি সজোরে একদিকে টাল খেয়ে পড়ল। হাত দিয়ে খাটখানা চেপে ধরে তবেই ও দাঁড়াতে পারছে, দেখল। ভালো পা-খানা এগিয়ে সামনের দিকে এক-পা ফেলল, কিন্তু নকল পা-বাঁধা বাঁ পা-খানা নাড়াতেই পারল না। পা নাড়াতে গিয়ে দেখল পড়ে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি খাটখানা ধরে ফেলতে হল। দু'হাতে খাটখানা আঁকড়ে ধরে তবেই ও বাঁ পা-খানা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারল। বুকটা ধড়ফড় করছিল ওর।

'ও কিছু লয়। কয়দিন আমারে এখন অভ্যেস করতে লাগবে,' নিজেকে বোঝাল।

ফের একবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু না, বাঁ পা-খানা কিছুতেই নড়তে চাইছে না। ডান পা-টা লম্বা করে ফেলে এবার ও গোটা শরীরটাকে সজোরে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করল বাঁ পা-খানা টেনে তুলতে। আর তা করতে গিয়ে আছড়ে পড়ল সজোরে। মাটির মেঝেয় আঙুলের নখগুলো বিঁধিয়ে দিয়ে তারপর ওইভাবেই পড়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। নাঃ, বাঁ পা-খানা একেবারে অনড় হয়ে আছে। বিঘতখানেকও নড়তে চাইছে না পা-খানা।

'ঠিক আচে, ঠিক আচে, কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার! আমি এখনও অভ্যস্ত হই নাই তাই তোর এত চালাকি।' হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ফের হাঁটবার চেষ্টা করে ও। তারপর ফের আরেকবার। কিন্তু নাঃ, ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হল না।

চেষ্টা করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল কোল্‌কা।

'এবার এট্টু সিগ্‌রেট টানতে লাগবে দেখচি,' তিক্তকণ্ঠে সজোরে ও বলে উঠল। আর-যে সফল হবে এমন ভরসা ওর ছিল না, কিন্তু তবু তা স্বীকার করতেও মন চাইছে না। প্রাণে ধরে কিছুতে কথাটা স্বীকার করতে পারছে না ও! এ অসম্ভব, কিছুতে এ ভাবা যায় না!

একটা সিগারেট টেনে নিয়ে নকল পায়ে ফের একবার হাঁটবার প্রাণপণ চেষ্টা করল। নাঃ, হল না, হবে না। এক্কেবারে হবার নয়।

প্রচণ্ড গাল পাড়তে-পাড়তে কোল্‌কা বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিছানার

শিয়রে দেয়ালে-ঝোলানো শিকারের বন্দ্বকটার দিকে চোখ পড়ল ওর।... প্রাণপণে নিজেকে সংহত করে উঠে দাঁড়িয়ে ফের একবার বাঁ পা-খানা চালাবার চেষ্টা করল।

'তোরে হাঁটতে লাগবেই, কুত্তি কাঁহাকা! চল্, হাঁট্ দেখি...। চল্, চল্, অপদাত্থ কুত্তি!' উন্মত্তের মতো বিড়বিড় করে বকতে লাগল ও।

কিন্তু ইতিমধ্যে পায়ের খোঁটার কাটা ঘায়ে মামড়ি উঠে গিয়ে ঘা-টা প্রকাণ্ড একটা ক্ষতের মতো সাংঘাতিক টাটিয়ে উঠেছে। নকল পায়ের বকলস খ্বলে ফেলে কোল্কা এবার দগ্দগে মাংসপিণ্ডের ওপর ফ্বঁ দিতে লাগল। তারপর যন্ত্রণা সত্ত্বেও ঠোঁট কামড়ে নকল পা-খানা ফের ঘায়ের ওপর এ'টে বাঁধল।

'এবার কী বলিস? চলবি তো? ফের একবার? কী, চলবি নে!'

ভোরের আলো দেখা দিল এই সময়ে।

'শোরের বাচ্চা!' বলে কোল্কা বিছানায় ঢলে পড়ল। কোনোকিছ্ব যাতে না-দেখতে হয় সেজন্যে চোখদ্বটো বন্ধ করে রাখল। আর মনে হল তেলকালিমাখা বীভৎস একটা ম্বখ যেন ওর ওপর ঝ্বঁকে পড়েছে, আর তাচ্ছিল্যের হাসিতে ঠোঁটদ্বটো কুঁচকে উঠেছে ম্বখখানায়। ফের চোখ খ্বলল কোল্কা...। 'শালা, হারামি শোরের বাচ্চা,' ফের একবার ফিসফিস করে বলল। তারপর দেয়াল থেকে বন্দ্বকটা নামিয়ে নিল।...

এই বিপর্যয়ের কথা ওর বাবা শ্বনলেন পরদিন সন্ধেবেলা (যন্ত্রপাতির কিছ্ব পার্ট্সের খোঁজে তিনি সেদিন সারাদিন জেলা-সদরে ছিলেন)। যখন লোকে তাঁকে এই দ্বর্ঘটনার কথা জানাল তিনি তখন বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। কথাটা শ্বনে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ঘ্বরিয়ে গাড়ি ছোটালেন হাসপাতালের দিকে।

'এখন ওকে আপনার না-দেখাই ভালো,' ডাক্তার বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'ব্বঝলেন-না, এখন ও...।'

কথা শেষ করতে না-দিয়ে ঠেলে ডাক্তারকে একপাশে সরিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকে পড়লেন আন্দ্রেই।

সারা শরীরে ব্যান্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় চিত হয়ে পড়ে ছিল কোল্কা। এত ফ্যাকাশে দেখতে লাগছিল যে ওকে প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল

বাঁচার কোনো আশা নেই। সারা ওয়ার্ড আয়োডিনের গন্ধে ভরভর করছিল।

বাপ টের পাচ্ছিলেন সারা গায়ে হিমঘাম দেখা দিয়েছে তাঁর।

'ওরে, আমারে বলালি নে কেনে রে? আমি তাইলে সোজা বুকের দিকে তাক করতাম।... তাইলে এত কষ্ট পেতে হোত না, সাথে-সাথে...' বলতে-বলতে গলা ধরে গেল আন্দ্রেইয়ের। কপালের ঘাম মুছে বিছানার পাশে একটা টুলে বসলেন।

আড়চোখে কোল্‌কা ওঁকে দেখছিল। ঠোঁটদুটো নড়ছিল ওর।

'খুব কষ্ট নাগচে?' বাপ শুধোলেন।

কোল্‌কা চোখদুটো বন্ধ করল। সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল ওর।

'আহ্‌!..' বাপ উঠে ওয়ার্ডের বাইরে গেলেন।

'ব্যাপারটা এইরকম, বুঝলেন। একজন মানুষ নিজে বাঁচার জন্যে কতখানি আগ্রহী সবকিছু নির্ভর করে তার ওপর। বুঝেছেন? শরীরটাকে মেনে চলতে হয়...'

শোকে উন্মত্ত বাপ ডাক্তারের এপ্রনের কলার চেপে ধরে বললেন:

'তাইলে আপনারা এখেনে আচেন কী করতে? খালি শরীর, শরীর!..'

'এ কী করছেন আপনি? কলার ছাড়ুন। আমাদের যথাসাধ্য আমরা তো করবই।'

ডাক্তারকে ছেড়ে দিয়ে ফের ওয়ার্ডে ফিরতে যাচ্ছিলেন আন্দ্রেই, কিন্তু কী ভেবে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর এক-মুহূর্ত ওইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। বেশ খানিকটা হেঁটে আসার পর মনে পড়ল যে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এসেছেন তিনি। ফের ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন, তারপর ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালেন···

কোল্‌কার মা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে ছিলেন তিনি।

স্বামী কুঁড়েয় ঢুকলে ক্ষীণকণ্ঠে শুধোলেন, 'কেমন আচে?'

'ও যদি মরে তো তোর একদিন কি আমার একদিন! খুন করব তোরে! কুড়োল দে ফেঁড়ে ফেলব তোরে!' শোকে মরীয়া হয়ে উঠেছেন আন্দ্রেই, মূর্তিখানা ফ্যাকাশে আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

দেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন স্ত্রী।

'ওহ্‌, ভগমান রক্ষে কর, ভগমান রক্ষে কর...'

‘এঃ, ভগমান রক্ষে কর!.. নিকুচি করেচে তোর ভগমানের! ভগমান বাদে আর কিছু চিনিস নে তুই, না? আমারে এট্টা সুস্থ-সবল দুই-ঠ্যাঙওলা ছেলে পর্যন্ত দিতে পারিস নাই! আমি তোর ভগমানের মুণ্ডুটে ছিঁড়ে ফেলব। এখুনি ফেলব!’ বলে দেয়াল থেকে ‘মহিমান্বিত নিকলাস’এর আইকনখানা উপড়ে খুলে নিয়ে মেঝের ওপর আছাড় মেরে ফেললেন সেটা। ‘এই ওয়ার উপযুক্ত শাস্তি! ব্যাটা বেজম্মা কোথাকার!’

‘আন্দ্রেই, ওগো, কোরো না! ওহ্, ভগমান... ওই গ্রাশ্‌কা-ছুঁড়ির জন্যে ছেলেটা এমন কাজ করেচে। ওয়ারে, সাপিনীটারে ভালোবেসে ফেলেছেল ছেলে... আগে তো ছেলে আমার ভালো ছেল, সোনার চাঁদ ছেলে ছেল কোলিয়া! কী-যে পোকা ওয়ার মাথায় ঢোকল!’

শুনে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন আন্দ্রেই।

‘গ্রাশ্‌কা? গ্রাশ্‌কা কে?’

‘আমাদের গ্রাশ্‌কা গো! এ-তল্লাটে তো ওই এট্টাই গ্রাশ্‌কা আচে।’

আন্দ্রেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন গ্রাশ্‌কাদের বাড়ি।

‘আন্দ্রেই-কাকা... কিন্তু এমন কাজ ও করতে পারল কী করে? বলচেন — আমার জন্যে? এখন আমার কী করার আচে বলেন?’

‘ও ভালো হয়ে ওঠবে...’ হাত দিয়ে নিজের গালটা ঘষতে-ঘষতে আন্দ্রেই বললেন, ‘ও নিঘ্‌ঘাত ভালো হয়ে ওঠবে যদি কেউ ওরে বলে... যদি তুমি ওরে বল যে ও যেমন আচে তাইতেই তুমি ওরে বে’ করতে রাজি। মিথ্যে হলেও কথাটা বলতে পারবে তুমি?’

হু-হু করে কেঁদে ফেলল গ্রাশ্‌কা।

‘কিন্তু কী করে বলব বলেন? ওর জন্যে ভারি কষ্ট হচ্চে আমার, সত্যিই ভারি কষ্ট হচ্চে। কিন্তু আমি-যে অন্যেরে কথা দিইচি।’

শুনে দাঁড়িয়ে উঠলেন আন্দ্রেই। বললেন:

‘ঠিক আচে, তা কাঁদচ কেনে? সামান্যি এট্টু কথাতেই কেঁদে আকুল হও, এয়া কীরকম ফ্যাশান তোমাদের বুঝি নে। না-পারলে না-পারবে, তাতে হয়েচেটা কী? যাই হোক, আমি-যে এখেনে এয়েছেলাম তা কারেও বলার দরকার নাই। বুয়েচ?’ বলে ফের হাসপাতালে চলে গেলেন তিনি।

একই অবস্থায় তখনও শুয়ে ছিল কোল্‌কা। একই ভাবে ছাদের দিকে মুখ করে, হাতদুটো দেহের দু’পাশে টান করে পেতে।

'এখুনি আমি বাড়ি থেকে আসচি, বুইলি...' টানটান হাঁটুর ওপর রুক্ষ হাতের তেলোটা বুলোতে-বুলোতে আর বুটের মাথাটা সোজা করতে-করতে ইতস্তত করে বললেন আন্দ্রেই, 'আসার সময় গ্রাশ্কাদের বাড়ি ঘুরে এলাম...'

শুনে অবাক হয়ে কোল্কা বাপের মুখের দিকে তাকাল।

'মেয়েটা তোর জন্যে কাঁদতে নেগেচে। বলছেল, এমন মুখ্যুমি সে করল কী করে! আমারে কোনোদিন কথাটা বলল না কেনে — আমি তাইলে খুশি হয়ে বে' করতাম।...'

শুনে কোল্কার গালদুটোয় সামান্য একটু রঙের আভাস দেখা দিল। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। তারপর চোখদুটো বুজেই রইল।

আর ওর বাবা বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন... তিনি বুঝতে পারছিলেন না ছেলে তাঁর কথাটা শুনতে চাইছে না কেন।

একসময় আস্তে-আস্তে ডাকলেন, 'খোকা!'

'না-না,' কোল্কার ঠোঁটদুটো সামান্য একটু নড়ল। এত সামান্য যে ধরতে কষ্ট হচ্ছিল ও সত্যিই কথা বলছে কিনা। চোখদুটো তখনও বন্ধ ওর। 'মিথ্যে বলে লাভ কী, বাবা!.. এমনিতেই আমার লজ্জার শেষ নাই।'

আন্দ্রেই উঠে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ওঁর কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে তখন।

গেট ছাড়িয়ে খানিকটা আসতেই গ্রাশ্কার সঙ্গে দেখা। হাসপাতালের দিকে ছুটে আসছিল সে।

'আমি বলব, আন্দ্রেই-কাকা, আমি বলব... ও যদি তাতে ভালো হয়ে ওঠে তো উঠুক। বলব, আমি রাজি আচি। ও ভালো হয়ে উঠুক তাম্পর।'

'না, তার দরকার হবে না,' গম্ভীরভাবে নিজের বুটজোড়ার দিকে তাকিয়ে আন্দ্রেই বললেন। 'ও এমনেতেই ভালো হয়ে যাবে-নে। এখন আমরা যদি মিথ্যে কথা কই তাইলে ওয়ার ক্ষেতিই করা হবে।'

কোল্কা সেরে উঠল।

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই বিছানায় উঠে বসার ক্ষমতা হল ওর। আর তখন দেখা গেল বিছানায় বসে কার যেন একটা হাতঘড়ির কলকব্জা ঘাঁটাঘাঁটি

করছে। বিগ্‌ড়নো ঘড়িটা আশপাশের বেডের কোনো-এক রুগী ওকে দেখতে দিয়েছিল।

জানলা দিয়ে উজ্জ্বল রোদ্দুর এসে ভরে দিয়েছিল ঘরখানা। বাইরে অগস্টমাসের দুপুর দপদপ করছিল জীবনের মনোরম শান্তির সঙ্গীতে। বাগানের পুদিনাপাতার আর টিনের চালে সদ্য-লাগানো রঙের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। হাসপাতালের উঠোনে থেকে-থেকে ডেকে উঠছিল গরমে জ্বালাতন-হয়ে-ওঠা একটা মোরগ।

'ওয়া কিন্তু মিথ্যেমিথ্যিই অমন চিচ্‌কার পাড়চে না,' কে যেন বলল। 'এট্টা মুরগি ওরে ল্যাঙ্‌ মেরেচে। নিজের চক্ষে দেখেচি আমি। লালপানা এট্টা মোরগ এসে মুরগিটারে বশ করে ফেলল, তারপর সাথে করে নিয়ে চলে গেল।'

'কিন্তু তখন এই মোরগটে কী ভাবছেল? এখন তো খুব চিচ্‌কার পাড়চে দেখচি।'

'এইটে?.. এইটে তখন পাশের সব্‌জিবাগানে রোঁদে বেইরেছেল।'

শুনে কোল্‌কা নিঃশব্দে হাসতে লাগল — উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কী করে নিজের গায়ে এমনভাবে গুলি লাগাল ও, তাহলে টকটকে লাল হয়ে উঠে ও জবাব দেয়:

'আচমকা লেগে গেছিল।' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে তাড়াতাড়ি হাতঘড়ির দিকে ফিরিয়ে নেয় চোখদুটো।

ওর বাবা রোজ দেখা করতে আসেন। বিছানার পাশের টুলটায় অনেকক্ষণ বসে-বসে ঘড়ি নিয়ে ছেলের নাড়াচাড়া দেখতে থাকেন।

কোল্‌কা শুধোয়, 'বাড়ির খবর কী?'

'খবর একই প্রেকার। অ্যাই, তোর ছোট্ট হুইলখান হাইরে যাবে এবার...'

কম্বলের ভাঁজের ভেতর থেকে ছোট্ট হুইলটা হাতড়ে বের করে এনে ছেলের হাতে তুলে দেন বাপ।

'জানো তো, এটারে পেণ্ডুলাম কয়।'

'ভারি পুঁচকেপানা জিনিসটে তো! এমনধারা ক্ষুদে-ক্ষুদে মাল যে বানায় কেমন করে ওয়ারা কে জানে!'

'ফ্যাক্টরিতে সবকিছুই বানাতে পারে ওরা।'

'মেরে ফেললেও আমি তো পারতাম না এমন একখান যন্তর বানাতে।'

শুনে কোল্‌কা হাসল। বলল:

'তুমি পারতে না, কিন্তু ওরা ঠিক পারে।'

আন্দ্রেইও হাসলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে নিজের হাঁটুতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন:

'হ্যাঁ, তা ওখেনে ওয়ারা পারে বৈকি। ওয়ারা সবকিছুই বানাতে পারে ওখেনে।'



ফ্যাসাদ-কুড়ুনে

স্ত্রী ওর নাম দিয়েছে 'ফ্যাসাদ-কুড়ুনে'। কখনও-কনখও আদর করেও ওকে ওই নামে ডাকে।

ফ্যাসাদ-কুড়ুনের অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে সব সময়েই ও কোনো-না-কোনো ফ্যাসাদে পড়বেই। ও নিজে অবশ্য চায় না যে কোনো ঝামেলায় পড়ুক, ঝামেলায় পড়লে ভোগান্তির একশেষও হয় ওর, তবু কিছুতেই ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পারে না। অবশ্য ঝামেলাগুলো ছোটখাটই, তবু তার জন্যে ভুগতে তো হয় ওকেই।

যেমন, একবার এক-জায়গায় ওর বেড়াতে যাওয়ার কথা ধরা যাক।

একবার গ্রীষ্মকালে ও ঠিক করল, ছুটিটা উরাল-এলাকায় ওর ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে কাটাবে। ভাই বলে কথা, অথচ বারো বছর দুই ভাইয়ে দেখা নেই। অতএব বাক্স সাজাতে বসে গেল ও।

'আচ্ছা, আমার মাছ-বঁড়শিটে গেল কোন ঠেঁয়ে?' বাক্স-প্যাঁটরা রাখার ঘর থেকে হাঁক পাড়ল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে।

'আমি তা জানব কেমন করে?' স্ত্রী জবাব দিল।

'এটু আগেও তো সবকিছু ছেল এখেনে!' গোল-গোল নীলচে-শাদা চোখদুটো যথাসম্ভব পাকিয়ে স্ত্রীর দিকে কড়াচোখে তাকাতে চেষ্টা করল ও। 'আর এখন দেখচি ওইটেই খালি পাওয়া যাচ্চে না।'

'তা, জিনিসটে দেখতে ছেল কেমন?'

'আরে, বানমাছ ধরার মাছপানা ঝকঝকে বঁড়শি। আবার কেমন!'

'তাইলে আমি হয়তো ভুলে ওটারে ভেজে খেয়েচি।'

একমুহূর্ত কোনো কথা বলল না ফ্যাসাদ-কুড়ুনে। তারপর:

'তা খেতে ভালো নাগল তো?'

'কী খেতে ভালো নাগবে আবার?'

'কেনে? বঁড়শিটে? খেতে ভালো নাগল না বুঝি? হা-হা-হা!' রসিকতা করা একেবারেই ওর ধাতে ছিল না, তবু সময়-অসময়ে তা করার ইচ্ছেটাও ছিল ষোল-আনা। 'কী, তাপ্পরে এট্টাও দাঁত আচে আর? জিনিসটে ডুর‍্যালুমিন দে বানানো কিনা!'

ফ্যাসাদ-কুড়ুনেকে পথের জন্যে তৈরি করে দিতে পরিবারের সকলের অনেক সময় লেগে গেল। মাঝরাত গড়িয়ে গেল প্রায়।

পরদিন ভোরবেলায় দেখা গেল স্যুটকেস-হাতে গাঁয়ের রাস্তা ধরে লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলেছে সে।

রাস্তায় যে-ই ওকে জিজ্ঞেস করলে যে এমন সাজগোজ করে ও কোথায় চলেছে, তাকেই ও চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল, 'উরালে চলেচি! উরালে!' আর তখন গোলালো মাংসল মুখে আর গোল-গোল চোখদুটোয় ভারি একটা ডোন্ট-কেয়ার ভাব ফুটিয়ে তুলতে লাগল, যেন জানাতে চাইল — দূরের পথ পাড়ি দেয়া সে আর এমন একটা কী ব্যাপার! 'উরালে চলেচি এট্টু! ঠ্যাঙদুটোরে মাঝে-মাঝে এট্টু চাঙ্গা করে তোলা দরকার।'

তবে উরাল-অঞ্চল তখনও দূর-অস্ত্।

যাই হোক, নিরাপদে শেষপর্যন্ত শহরে এসে পেঁছিল সে। এবার এখান থেকে টিকেট কেটে ট্রেন ধরতে হবে।

ট্রেনের আগে হাতে অনেক সময় থাকায় ও ঠিক করল ভাইপোদের জন্যে কিছু খাবারদাবার কিনে নেবে — যেমন, টফি-চকোলেট, আদার রসমেশানো কেক, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব, খাবারের একটা দোকানে ঢুকে লাইনে দাঁড়াল ও। লাইনে ওর সামনে নরম ফেল্ট্‌হ্যাট-মাথায় একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিল, আর হ্যাটওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ঘন-করে লিপস্টিক লাগানো এক মোটা মহিলা। মহিলাটি হ্যাটওয়ালার সঙ্গে উত্তেজিতভাবে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে দ্রুত কথা বলে যাচ্ছিল।

'ভাবুন একবার কতখানি অভদ্রতা, কাণ্ডজ্ঞানের কতখানি অভাব! আমি জানি খুব সম্ভব ওঁর রক্তবওয়া নাড়িগুলোর দেয়াল শক্ত হয়ে গেছে, তবু

এর আগে কেউ কখনও ওঁকে চাকরি থেকে অবসর নিতে বলে নি। আর এখন এই নতুন লোকটা কাজে জয়েন করার পর পাঁচ মিনিটও কাটতে-না-কাটতে ওঁকে বলে বসল কিনা, "আলেক্‌সান্দর সেমিওনভিচ, আপনার কি মনে হয় না যে এবার আপনার রিটায়ার করা উচিত?" লোকটার আস্পদ্দা দেখেছেন একবার?'

হ্যাটওয়ালাও ওর মন যুগিয়ে উত্তর দিল:

'হ্যাঁ, আজকাল লোকে এই রকমই হয়েছে বটে। তা, ওঁর রক্তবওয়া নাড়ি আগের মতো যুত্‌সই নেই তো হয়েছেটা কী? তাছাড়া, সুম্‌বাতিচের ব্যাপারটাই-বা কী? কথা বলতে-বলতে সবকিছুই তো বেভ্‌ভুল হয়ে যায় তার। তার বেলা? আর ওই-যে মহিলা, কী যেন নামটা তার?..'

সব অথবা প্রায়-সব শহুরে লোকের প্রতিই ফ্যাসাদ-কুড়ুনের অচলা ভক্তি। প্রায়-সব বলছি এইজন্যে যে রাস্তার মস্তান আর দোকান-কর্মচারিদের তেমন ভক্তিশ্রদ্ধা করে না সে। এ-ধরনের লোকজনকে বরং একটু ভয়ই পায়।

এগোতে-এগোতে কাউণ্টারে পেঁছে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে কিছু টফি-লজেন্স, আদার রসমেশানো কেক আর গোটা তিনেক বার-চকোলেট কিনল। তারপর একটু সরে দাঁড়িয়ে জিনিসগুলো স্যুটকেসে ভরে নিতে লাগল। স্যুটকেসটা দোকানের মেঝের ওপর রেখে খোলায় ওর চোখদুটো স্বভাবতই কাউণ্টারের দিকে পড়ল। আর সেদিকে চোখ পড়তে দ্যাখে, লাইন-করে-দাঁড়ানো লোকেদের পায়ের কাছে পঞ্চাশ রুব্‌লের একটা ব্যাঙ্কনোট পড়ে আছে। সবুজরঙের ছোট্ট কাগজখানা পড়ে আছে তো আছেই, কারও নজরে পড়ছে না ওটা। দেখে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে আনন্দে কাঁপতে শুরু করল, চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল ওর। যাতে এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া না-হয়ে যায় তার জন্যে ভারি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ও মাথা ঘামাতে বসল যে লাইনের লোকজনকে ওই ব্যাঙ্কনোটের কথাটা কতখানি বুদ্ধি খাটিয়ে আর মজা করে জানানো যায়।

আর তাই চেঁচিয়ে খুশি-খুশি হাল্‌কা গলায় ও বলে উঠল, 'নাগরিক বন্ধুগণ, আপনারা তো দিব্যি নিশ্চিন্দি আচেন দেখি!'

কথা শুনে সবাই এবার ওর দিকে তাকাল।

'দেশেগাঁয়ে নোকেরে এমন করে যেখেনে-সেখেনে ট্যাকার হরির-নুট দিতে দেখি নাই কোনোদিন।'

কথাটা শুনে সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। যতই যাই হোক, এ তো আর তিন রুব্‌ল বা পাঁচ রুব্‌ল নয়, একেবারে পঞ্চাশ রুব্‌ল — গোটা দু'সপ্তার মাইনে। কিন্তু দেখা গেল কারুরই টাকা হারায় নি, নোটখানার কোনো দাবিদার নেই।

'তাইলে লোটখান লিচ্চই সেই হ্যাটওলা বাবুরই হবে।' ফ্যাসাদ-কুড়ুনে আন্দাজ করল।

ঠিক করল, নোটখানা সে কাউন্টারে রেখে যাবে — সবার চোখ পড়ে এমন একটা জায়গায়।

দোকানি মেয়েটি বলল, 'যার হারিয়েচে শিগ্‌গিরই সে ছুটে আসবে দেখবেন-নে।'

দিব্যি খোশমেজাজ নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে। ভাবছে, জবর এট্টা বুদ্ধির পরিচয় দেয়া গ্যাচে এই ব্যাপারটেয়। কেমন কায়দা করে বললাম, "দেশেগাঁয়ে নোকেরে এমন করে যেখেনে-সেখেনে ট্যাকার হরির-নুট দিতে দেখি নাই কোনোদিন! কেমন নেলাম একহাত!" আর তারপরই হঠাৎ হিমঘামে নেয়ে উঠল ওর সর্বাঙ্গ। তাহলে কি..! গাঁয়ে থাকতে সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে ও যে-নগদ টাকাটা তুলেছে তার অঙ্ক ছিল পঁচাত্তর রুব্‌ল — একখানা পঞ্চাশ আর একখানা পঁচিশ রুব্‌লের নোট। সকালে পঁচিশ রুব্‌লের নোটখানা ও ভাঙিয়েছে, কাজেই ওর পকেটে একখানা পঞ্চাশ রুব্‌লের নোট থাকা উচিত। কিন্তু পকেট হাতড়ে দেখল নোটখানা নেই। সব ক'টা পকেট ফের তন্নতন্ন করে খুঁজল — নাঃ, কোত্থাও নেই!

'আরে, ট্যাকাটা দেখচি আমার!' সজোরে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'ধুত্তোর নিকুচি করেচে! ওয়া তো আমার ট্যাকা!'

মনে হল, শোকে-দুঃখে বুকটাই বুঝি ফেটে যাবে। প্রথমে ভাবল দোকানে ফিরে গিয়ে বলে, 'নাগরিক বন্ধুগণ, ওয়া আমার ট্যাকা। আজই ব্যাঙ্ক থেকে ট্যাকাটা তুলেচি আমি। একখান পঁচিশ আর একখান পঞ্চাশ রুব্‌লের লোট। পঁচিশ রুব্‌লের লোটখান এখুনি ভাঙিয়েচি, আর আরেকখান লোট খুঁজে পাচ্চি নে।' কিন্তু তারপরই ওর মনে হল একথা শুনে সবাই কীরকম হকচকিয়ে যাবে আর অনেকেই ভাববে যে আসল মালিক না-আসায় ও এখন নিজেই টাকাটা পকেটস্থ করতে চাইছে। না, প্রাণ থাকতে কিছুতেই ও জঘন্য ওই কাগজের টুকরোটার জন্যে দাবি জানাতে যেতে পারবে না। শুধু তাই নয়, দোকানের লোকজন ওকে টাকাটা না-দিতেও তো পারে।

'আমি এমনধারা হাবাগবা কেনে?' জোরে-জোরে নিজের সঙ্গেই নিজে তর্ক জুড়ে দিল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে। 'এখন কী করি তাইলে?'

কী আর করা! গাঁয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

দূর থেকে ব্যাঙ্কনোটখানা শেষবারের মতো একবার দেখার জন্যে ও ফের হেঁটে দোকানের কাছে গেল। তারপর ভেতরে না-ঢুকে বাইরের দরজার কাছ থেকেই উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। নাঃ, ওর পক্ষে প্রাণে ধরে ভেতরে ঢোকা আর সম্ভব নয়। সেটা বড়ই কষ্টকর ঠেকবে, অতখানি উত্তেজনা ও হয়তো সামলাতে পারবে না।

বাসে চেপে বাড়ি ফেরার পথে মনে-মনে নিজেকে গালাগাল দিতে-দিতে ফিরল ও। স্ত্রীর সঙ্গে আসন্ন বোঝাপড়ার জন্যে শক্তিসংগ্রহই ছিল উদ্দেশ্য।

ব্যাঙ্কে জমানো টাকা থেকে আরও পঞ্চাশ রুব্‌ল তুলতে হল ওদের।

নিজের অপদার্থতার কথা মনে করে আর স্ত্রী আরেকবার সে-কথাটা তাকে ভালো করে সমঝে দেয়ায় একেবারে মরমে মরে গেল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে। যাই হোক, অবশেষে সে ফের শহরে এসে ভালোয়-ভালোয় ট্রেনে চাপল। তবে দেখতে-দেখতে এই মনমরা ভাবটা কেটে গেল তার। গুমগুম করে ছুটে চলল ট্রেন, চমকে-চমকে পেছনে পালাতে লাগল বন-জঙ্গল, বাগবাগিচা, গ্রাম-জনপদ। বহু লোক উঠল, আবার অনেকে নেমেও গেল ট্রেন থেকে। গালগল্পও শোনা গেল হরেকরকম।... করিডরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে-টানতে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে নিজেও একসময় একটা গপ্পো বলে ফেলল বুদ্ধিজীবী-বুদ্ধিজীবী দেখতে এক কমরেডের কাছে।

'আমাদের কাছের এক গাঁয়ে একবার এমনিধারা এক কাণ্ড ঘটেছিল, বুইলেন। এক আহাম্মক ছোঁড়া জ্বলন্ত এক-টুকরা আঙ্‌রা হাতে লিয়ে নিজের মা-বিটিরেই তাড়া করেছেল। ছোঁড়াটা মাতাল ছেল আর-কি, বুইলেন তো। তা, মা-বিটি তো পেরানপণে দৌড়ায় আর চ্যাঁচায়, "নিজের হাতের দিকে খেয়াল রাখিস কিন্তু! হাত পোড়াস নে যেন, খোকা!" নিজের পেরান-সংশয়, তবু তখনও পেটের সন্তানের কথা ভাবচে বিটি...। আর সে-ছোঁড়া ওরে তাড়া করে চলেচে, এমনি বদমাস! তাড়া করচে কারে, না নিজের গভ্‌ভধারিণী মা-রে! ভাবেন একবার কতখানি অভদ্রতা, কাণ্ডজ্ঞানের কতখানি অভাব...।'

'গপ্পোটা বানিয়ে বললেন নাকি?' ঝোলা-চশমার ওপর দিয়ে ফ্যাসাদ-কুড়ুনের দিকে তাকিয়ে কড়াসুরে শুধোলেন বুদ্ধিজীবী কমরেডটি।

'বানিয়ে বলব? বাঃ, কেনে বলেন তো? ব্যাপারটে সত্যিই ঘটেছেল তো রামেন্‌স্কোয়েতে, আমাদের গাঁ নদীর যে-পাড়ে তার অপর পাড়ে গাঁ-খান।'

শুনে বুদ্ধিজীবী কমরেডটি সরে গিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর কথাবার্তা বললেন না।

ট্রেনের পথ শেষ হওয়ার পরও ফ্যাসাদ-কুড়ুনেকে আরও ঘণ্টা-দেড়েক আঞ্চলিক বিমানপথে প্লেনে করে যেতে হল। এর আগে জীবনে আর একবারমাত্র প্লেনে চেপেছে সে। তাও আবার বহুদিন আগে। কিছুটা ভয়ে-ভয়েই প্লেনে উঠল সে। ভাবল, 'বলা তো যায় না এই ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যিই প্লেনের কলকব্জা কিছু-এট্টা বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।' তবে যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যে ভয়টা কেটে গেল তার। এমন কি পাশের লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও চেষ্টা করল একবার, কিন্তু লোকটি খবরের কাগজ পড়ায় এতই মত্ত হয়ে ছিল যে জলজ্যান্ত একটা মানুষের কথা শোনার ধৈর্যটুকু পর্যন্ত ছিল না তার। বিশেষ করে যে-ব্যাপারটা জানবার জন্যে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তা হচ্ছে এই: সে শুনেছিল, হাওয়াই জাহাজে চাপলে লোককে নাকি খাবার খেতে দেয়া হয়। কিন্তু কী কারণে কে জানে, কেউই কোনো খাবার আনছিল না। অথচ আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় খাওয়ার জন্যে সে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল — আর কিছু না, নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্যেই।

শেষে ধরে নিল, 'তাইলে আজকাল বোধহয় খাওয়ানোর পাট তুলে দেচে।'

জানলা দিয়ে নিচের দিকে জমে-থাকা পাহাড়প্রমাণ মেঘ দেখতে পেল ও। কিন্তু এই দৃশ্যটা সুন্দর কিনা তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। কেবল শুনল চারপাশের লোকজন খালি-খালি বলছে, 'ওহ্, কী সুন্দর! কী চমৎকার!' ওর কিন্তু ভারি অদ্ভুত, ভারি মজার একটা ইচ্ছে হচ্ছিল। 'ওই তুলোর পাঁজার মধ্যি ঝাঁপ খেয়ে পড়লে কেমন হয়! আচ্ছা, এই ব্যাপারস্যাপার আমার তাক নাগিয়ে দিচ্চে না কেনে?' মনে-মনে ভাবছিল ও। 'আমার নিচে তো পাঁচ কিলোমিটারের মতন জায়গা ফাঁকা, শূন্যি।' মনের চোখে ও মাটির ওপর থেকে ওই পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব মেপে ফেলল, তারপর এক-এক কিলোমিটার

দূরত্ব ওপরে-ওপরে সাজিয়ে তুলে নিজেকে তাক লাগিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু না, তবু ও অবাক হচ্ছে না, কিছুতেই হচ্ছে না।

'মানুষে কতকিছুই-না আবিষ্কার করচে!' পাশের লোকটিকে বলল ও।

লোকটি ওর দিকে তাকাল, তারপর কোনো কথা না-বলে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাল।

'যে-যার সিট-বেল্ট বেঁধে নিন!' মিষ্টিমতন অল্পবয়সী একটি মেয়ে ঘোষণা করল। 'আমরা এবার নামতে চলেছি।'

বাধ্য ছেলের মতো ফ্যাসাদ-কুড়ুনে নিজের সিট-বেল্টটা বেঁধে নিল, কিন্তু দেখল পাশের লোকটির সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকটিকে সাবধানে একটু কনুইয়ের গুঁতো দিল ও।

'সিট্-বেল্ট বেঁধে লিতে বলচে-যে।'

'ও কিছু না, ঠিক আছে,' লোকটি জবাব দিল। তারপর খবরের কাগজখানা পাশে সরিয়ে রেখে সিটের পেছনে হেলান দিয়ে বলল, 'শিশুরা হল গিয়ে জীবনের পুষ্প। মাথা নিচের দিক করে তাদের পোঁতা উচিত।' এমনভাবে লোকটি বলল কথাটা যেন কী-একটা মনে পড়ে গেছে তার।

'এ-কথার অর্থ কী আপনার?' ফ্যাসাদ-কুড়ুনে শুধোল।

খবরের কাগজ-পড়ুয়া সজোরে হেসে উঠল, কিন্তু আর কিছু বলল না।

প্লেনখানা দ্রুত নিচে নেমে পড়তে লাগল। শিগ্গিরই দেখা গেল মাটি কাছে এসে পড়েছে আর পেছনদিকে দৌড়ে পালাচ্ছে তা। কিন্তু দেখা গেল কিছুতেই আর মাটি ছুঁচ্ছে না প্লেনটা। বুঝদার লোকে পরে অবশ্য বলেছিল যে পাইলট নাকি বিমানবন্দর 'টপকে বেরিয়ে গেছে'। যাই হোক, অবশেষে মাটিতে ধাক্কা খেল প্লেন আর তা এত জোরে যে সকলেই প্লেনের মধ্যে লাফিয়ে উঠল, দাঁতে দাঁত ঠুকে যাওয়ার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা গেল চারিদিকে। আর সেই খবরের কাগজ-পড়ুয়া তো সিট থেকে ছিটকে পড়ে প্রথমে ফ্যাসাদ-কুড়ুনেকে টেকো মাথাটা দিয়ে সজোরে একটা গুঁতো মারল, তারপর একই ভাবে গুঁতো মারল পাশের জানলাটায়, অবশেষে ধপ করে বসে পড়ল মেঝেয়। কিন্তু এই লম্ফঝম্পর কারদানি দেখানোর গোটা সময়টায় মুখ দিয়ে টুঁ-শব্দটি কাড়ল না লোকটি। ফ্যাসাদ-কুড়ুনে যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল তা হচ্ছে এই যে শুধু ওই লোকটিই নয়, গোটা প্লেনে কেউই কোনো উচ্চবাচ্য করল

না। দেখাদেখি ও-ও চুপ করে রইল। প্লেন থামল অবশেষে। যাত্রীদের মধ্যে যারা প্রথমে জ্ঞানগম্যি ফিরে পেল তারা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল যে প্লেনখানা একটা আলুখেতে এসে থেমেছে। এরপর মুখখানাকে কিছুটা কঠোর করে তুলে ক্যাবিন থেকে পাইলট বেরিয়ে এল, আর প্লেন থেকে নামার দরজাটার দিকে চলল। কে যেন তাকে উদ্দেশ করে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা যেন আলুখেতে নেমেছি?'

'নিজে দেখে টের পাচ্ছেন না?' কড়াস্বরে জবাব দিল পাইলট।

যাই হোক, আর ভয়ের কোনো কারণ নেই দেখে যাত্রীদের মধ্যে যারা একটু হাসিখুশি-মেজাজের লোক তারা ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা জুড়লে।

এদিকে টেকোমাথা খবরের কাগজ-পড়ুয়া তার বাঁধানো দাঁতের পাটিটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল... ফ্যাসাদ-কুড়ুনেও নিজের সিট-বেল্ট খুলে লোকটির সঙ্গে দাঁতের পাটি খোঁজায় যোগ দিল।

'এইটেই আপনার লয়?' হঠাৎ খুশি হয়ে বলে উঠল সে, তারপর নকল দাঁতের পাটিটা খবরের কাগজ-পড়ুয়ার হাতে তুলে দিল।

'হাত দিয়ে ওতা কি না-ধল্লেই তলথিল না!' ফোকলা দাঁতে আধো-আধো বুলিতে চেঁচিয়ে উঠল লোকটি।

শুনে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে তো হতবাক।

'তাইলে কী করে ধরা নাগবে?'

'এখন আমি এতা গলম দলে ফোতাই কোথায়? কোথায় ফোতাই, বলুন দেখি?'

ফ্যাসাদ-কুড়ুনে এ-প্রশ্নেরও তেমন সদুত্তর দিতে পারল না।

শেষে বলল, 'তাইলে আমার সাথে চলেন। আমার ভাই এখেনেই থাকে। তার বাসায় এয়া গরম জলে ফুইটে নেয়া চলবে...। কিন্তু আপনি কি মনে করেন আমি এয়ার মধ্যি রোগের বীজ ছইড়ে দিচি? আমার শরীলে কোনো রোগের বীজ নাই, মশাই।'

কথাটা শুনে কেন যেন অবাক হয়ে ওর দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে রইল লোকটি, তারপর চুপ করে গেল।

বিমানবন্দরে নেমে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে স্ত্রীর কাছে পাঠানোর জন্যে একখানা টেলিগ্রামের মুসাবিদা করল:

'মাটিতে পা দিচি। একগোছা লাইল্যাক ফুল তোমার বুকে ছুড়ে দেলাম। আমারে ভুলো না কোনোদিন, প্রিয়তমা গ্রুশা আমার। দাঁড়ি। তোমারই ভাসিয়াত্কা।'

টেলিগ্রাফ-অপারেটর মেয়েটি সুশ্রী, তবে একটু কাটখোট্টা মুখশ্রীর। মুসাবিদাটা পড়ে সে বলল:

'এটা অন্যভাবে লিখতে হবে আপনাকে। আপনি তো সাবালক, না কী? একেবারে কিণ্ডারগার্টেন থেকে বেরুনো বাচ্চা নন তো।'

'কেনে? কেনে?' জানতে চাইল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে। 'অমন ভাবেই তো আমি চিঠি নিখে থাকি। ইস্তিরিরে খবর দিচ্চি আমি! নাকি আপনি ভেবেচেন আর-কাউরে...'

'চিঠিতে আপনি যা-খুশি লিখতে পারেন। কিন্তু টেলিগ্রাম হল যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে খবর পাঠানোর ব্যাপার। এখানে আপনার লেখা খোলা অবস্থায় যাবে, সবাই দেখবে।'

অগত্যা ফ্যাসাদ-কুড়ুনেকে ফিরে-ফিরতি লিখতে হল টেলিগ্রামের পাঠ।

'মাটিতে পা দিচি। সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। ভাসিয়াত্কা।'

টেলিগ্রাফ-অপারেটর এবার নিজে দু'টো শব্দ সংশোধন করে দিল। 'মাটিতে পা দিচি' আর 'ভাসিয়াত্কা' হয়ে গেল 'পেঁৗছেছি' আর 'ভাসিলি'।

'"মাটিতে পা দিচি"... কেন? নিজেকে কী মনে করেন আপনি — নভশ্চর?'

'ঠিক আচে, ঠিক আচে,' ফ্যাসাদ-কুড়ুনে বলে। 'আপনার যা-খুশি লেখেন-না কেনে।'

ফ্যাসাদ-কুড়ুনে জানত যে দ্মিত্রি নামে তার এক ভাই আছে আর আছে তিন ভাইপো। কিন্তু কেমন করে যেন তার বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল যে তার ভাইয়ের একটি স্ত্রী-ও আছে। অর্থাৎ, তার একটি ভ্রাতৃবধূও আছে। ভাইয়ের এই বৌটিকে সে আগে কোনোদিন দ্যাখে নি। আর এই ভ্রাতৃবধূটিই কিনা শেষপর্যন্ত তার অমন সাধের ছুটিটা পুরোপুরি মাটি করে দিলে। যে-কোনো

কারণে হোক, ফ্যাসাদ-কুড়ুনেকে দেখামাত্রই এই মহিলা তার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল।

প্রথম দিন সন্ধেবেলা সে আর তার ভাই দু'এক পাত্র টানার পর ফ্যাসাদ-কুড়ুনে যেই তার সাধা গলায় গিট্‌কিরি দিয়ে গেয়ে উঠল:

পপ্‌লার গা-ছ, ওরে পপ্‌লার গা-ছ...

অমনি তার ভাইয়ের বৌ সোফিয়া ইভানোভ্‌না পাশের ঘরের দরজার ফাঁকে মাথাটা গলিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠল, 'দয়া করে চ্যাঁচানিটে বন্ধ করবেন কি? এটা স্টেশন নয়, বুঝেচেন!' তারপর দরজাটা দিল বন্ধ করে।

ভাই দ্‌মিত্রি এতে অপ্রস্তুত হল। বলল:

'পাশের ঘরে বাচ্চারা ঘুমোচ্চে কিনা, তাই। আসলে মেয়েটার মনটা খারাপ না, বুইলে।'

অগত্যা আরও খানিকটা মদ গিলে ওরা দু'জন ওদের ছোটবেলা আর বাবা-মায়ের কথা নিয়ে আলাপ করতে লাগল...

পরদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে তখন দেখল ফ্ল্যাটে লোকজন নেই, বিলকুল খালি। ভাই আগেই কাজে বেরিয়ে গেছে, ভাইয়ের বৌও বেরিয়ে গেছে কাজে। এমন কি বড় দুটি বাচ্চাও খেলা করছে নিচের উঠোনে। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটিকে বাবা কিংবা মা পেঁছে দিয়ে গেছে নার্সারি স্কুলে।

ফ্যাসাদ-কুড়ুনে নিজের বিছানা তুলল, হাতমুখ ধুল, তারপর ভাবতে লাগল ভাইয়ের বৌকে খুশি করার জন্যে সে কী করতে পারে। আর ঠিক এই সময়ে বাচ্চাদের পেরামবুলেটরটা নজরে পড়ে গেল তার। ভাবল, 'এই পাওয়া গ্যাচে! পেরামবুলেটরটে আমি রঙ্‌ নাগিয়ে চিত্তির করে দুব!' বাড়িতে থাকতে একবার নিজেদের চুল্লিটায় রঙ্‌ লাগিয়ে এমন চমৎকার সব নকশা এঁকেছিল যে চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গিয়েছিল। বাচ্চাদের একটা রঙের বাক্স আর তুলি খুঁজে নিয়ে পেরামবুলেটরে রঙ্‌ করতে বসে গেল সে। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে রঙ্‌ করা হয়ে গেল। প্র্যামটাকে চেনা যাচ্ছিল না আর। প্র্যামের ওপরের অংশে উড়ন্ত সারসের পাঁতি এঁকেছিল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে, আর

তার নিচে মাটিতে নানা রঙ্‌বেরঙের ফুল আর কচি ঘাস, একজোড়া মোরগ-মুরগি আর তাদের ছানাপোনা এঁকেছিল... আঁকার পর ঘুরে-ঘুরে চারিদিক থেকে প্র্যামটাকে পরীক্ষা করে দেখল — সত্যি, চোখের টাটানি জুড়িয়ে দেবার পক্ষে চমৎকার হয়েছে প্র্যামটা! এ তো শুধু প্র্যাম নয় — যেন একখানা ছবি! ভাইয়ের বৌ প্র্যামটা দেখলে কত-যে খুশি হবে তাই কল্পনা করে নিজের মনে হেসে-হেসে বললে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে:

'আর তুমি বলতেছেলে কিনা গেঁয়ো নোকে বোকাসোকা হয়! তা, এইবার বোঝ কেমন? ছোট বাচ্চাটারে ফুলের সাজিতে গন্ধপুষ্পের মতন নাগবে কিনা তাই কও।' ভাইয়ের বৌকে খুশি করে তুলতে চাইছে ও।

সেদিন সারাদিন ফ্যাসাদ-কুড়ুনে শহরে টহল দিয়ে আর দোকানের জানলায়-জানলায় উঁকি দিয়ে বেড়াল। এক ভাইপোর জন্যে একটা খেলনা মোটর-লঞ্চও কিনে ফেলল ও। খেলনাটা ভারি সুন্দর দেখতে, গোটাটা শাদা আর লঞ্চের মাথার ওপর আবার একটা ছোট্ট সার্চলাইট বসানো। ফ্যাসাদ-কুড়ুনে ভাবল, 'এটাতেও আমার রঙ্‌ করা নাগবে।'

সন্ধে ছ'টা নাগাদ ভাইয়ের বাড়ি ফিরল সে। বাড়ির সামনের ঢাকা-বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে যখন তখন শুনতে পেল দ্‌মিত্রির সঙ্গে তার স্ত্রীর তুমুল ঝগড়া চলেছে। আসলে চ্যাঁচামেচি যা করার স্ত্রী-ই করছিল, ওর ভাই শুধু স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল মাত্র।

'ওতে কী আসে-যায়! বাদ দ্যাও না, সোনিয়া...। আরে, ও কিছু না...'

কিন্তু শুনল সোফিয়া ইভানোভ্‌না চেঁচিয়েই চলেছে, 'কালই ওকে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে! কোনো কথা শুনতে চাই না আমি! ভাঁড়টাকে একদিনের জন্যেও বাড়িতে ঠাঁই দেব না আর, তা বলে দিলাম!'

'ঠিক আচে, ঠিক আচে!.. চেপে যাও-না, সোনিয়া...'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ঢাকা-বারান্দাটা থেকে নেমে এল ফ্যাসাদ-কুড়ুনে। নেমে তো এল, কিন্তু এখন যায় কোথায় সে? আবার সে মনে বড় আঘাত পেয়েছে। যখনই লোকে তাকে অপছন্দ করে তখনই মনে ভারি আঘাত পায় সে। তাছাড়া কেমন যেন আতঙ্কিতও হয়ে পড়ে। মনে হয়, জীবনে সবই বুঝি ফুরিয়ে গেল। তাহলে এরপর আর বেঁচে থেকে লাভ কী?

আর যে-সমস্ত লোক ওকে অপছন্দ করে কিংবা ওকে দেখে হাসে তাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে, বহুদূরে চলে যেতে চায় ও।

ভাইয়ের বাড়ির বাগানে একটা চালার নিচে বসে নিজেকে শাপান্ত করতে-করতে ফিস্‌ফিস করে বলে, 'আচ্ছা, এমন এট্টা গজকচ্ছপ আমি বনলাম কেমন করে! আমার তো আগেই আন্দাজ করা উচিত ছেল যে বৌ-বিটি নোক-শিল্পকলা বোঝবে না।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত ওই চালার নিচেই বসে রইল সে বুকের মধ্যে তেমনই একটা ব্যথার অনুভূতি নিয়ে। এরপর দ্‌মিত্রি একসময় চালাটার মধ্যে ঢুকল, আর দাদাকে ওখানে বসে থাকতে দেখে মোটেই অবাক হল না। মনে হল, ও যেন আগেই ঠাহর করেছিল যে দাদা ওখানে আছে।

দ্‌মিত্রি বলল, 'ব্যাপারখান কী, জানো। ও তো আবার খেপে উঠেচে... ওই-যে প্র্যামটা... ওয়া তোমার করা ঠিক হয় নাই, বুইলে।'

'ভেবেছেলাম রঙ্‌করাটা ওয়ার পছন্দ হবে। ঠিক আচে, আমি এখুনি চললাম ভাই।'

শুনে ছোটভাই দ্‌মিত্রি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল — কিন্তু আর কিছু বলল না।

ফ্যাসাদ-কুড়ুনে যখন গাঁয়ে এসে পৌঁছুল তখন গরমিকালের হাল্‌কা একপশলা বৃষ্টি হচ্ছে। বাস থেকে নেমে, পায়ের নতুন জুতোজোড়া হাতে খুলে নিয়ে ওম্‌ওয়ালা ভিজে মাটির ওপর দিয়ে দৌড়ল খানিকটা। একহাতে স্যুটকেস, অপর হাতে জুতোজোড়া নিয়ে মাটির ওপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে দৌড়তে লাগল আর গলা খুলে গান ধরে দিল:

পপ্‌লার গা-ছ, ওরে পপ্‌লার গা-ছ...

ইতিমধ্যে অর্ধেকটা আকাশ স্বচ্ছ আর নীল হয়ে উঠেছে আর সূর্যকে দেখা যাচ্ছে কাছাকাছি, মেঘের ফাঁকে। বৃষ্টি ধরে এল, বড়-বড় বৃষ্টির

ফোঁটা মাটিতে-জমা জলের মধ্যে পড়ে জলে বুজকুড়ি কাটতে আর ফেনা তুলতে লাগল।

দৌড়ুতে-দৌড়তে পা-পিছলে ফ্যাসাদ-কুড়ুনে প্রায় আছাড় খাবার যোগাড় হল।

...আসলে লোকটির নাম ভাসিলি ইয়েগোরিচ ক্নিয়াজেভ। বয়স উনচল্লিশ। গাঁয়ের সিনেমা-হলের প্রোজেক্শন-অপারেটর সে। গোয়েন্দা আর কুকুর তার ভারি প্রিয়। ছেলেবেলায় সে স্বপ্ন দেখত গুপ্তচর হওয়ার।



বুটজোড়া

কয়েকজনে মিলে ওরা শহরে এসেছিল যন্ত্রপাতির বাড়তি পার্ট্‌স কিনে নিয়ে যেতে। ওদের মধ্যে একজন, সের্গেই দুখানিন, একটা দোকানে ঢুকেছিল আর সেখানে মাথা-খারাপ-করে-দেয়ার মতো একজোড়া ভারি বাহারে মেয়েদের বুট ওর চোখে পড়ে গেল হঠাৎ। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের শান্তি গেল ঘুচে, কেননা বলা-নেই-কওয়া-নেই একেবারে আচম্‌কা ওর খেয়াল চাপল যে বুটজোড়া স্ত্রীর জন্যে কিনতেই হবে। ভাবল, 'অন্তত এই একবার বৌটারে এট্টু মনের মতন করে আপ্যায়িত করা যাক। সত্যিকার মাগ্‌গিগণ্ডার এট্টা জিনিস উপহার দে। তা, এই বুটজোড়ার চেয়ে সোন্দর বস্তু আর আচে কী! স্বপ্নেও কোনোদিন বৌ-বিটি এমন একজোড়া জুতোর কথা ভাবে নাই।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ জুতোজোড়ার তারিফ করল সের্গেই। তারপর দোকানের কাউণ্টারের কাচে আঙুলের নখের একটা টোকা দিয়ে খুশি-খুশি গলায় শুধোল, 'ওই চোখটাটানি-জোড়ার জন্যে কত পড়বে?'

'চোখটাটানি-জোড়া আবার কী?' দোকানের বিক্রিঅলা মেয়েটি অন্যমনস্কভাবে পাল্‌টা প্রশ্ন করল।

'ওই-যে ওদিকে — ওই বুটজোড়া।'

'ও! চোখটাটানি-জোড়া!.. প'য়ষট্টি রুব্‌ল।'

ধুত্তোর নিকুচি করেচে! কথাটা উচ্চারণ করতে মুখ খুলল সের্গেই, কিন্তু বলার সময় তা না বলে বলল, 'হুঁ, বুটজোড়ায় কাঁটাও আচে, দেখচি।'

বিক্রিঅলা মেয়ে ওর দিকে বিরক্তিভরে তাকাল। ভারি দেমাকী হয় এই বিক্রিঅলা মেয়েগুলো। এমন কি তোমারে এককিলো জোয়ারদানা বিক্রি করার

সময়ও এমন ভাবসাব করবে যেন কোনকালের ভুলে-যাওয়া দেনা শুধতে হচ্চে ওয়াদেরে।

যাই হোক, ওরা যা ভাবে ভাবুক, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সের্গেইয়ের পকেটে নগদা পঁয়ষট্টি রুব্‌ল আছে। বলতে কী, পঁচাত্তর রুব্‌লই আছে ওর কাছে। কিন্তু তবু... রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। যা থাকে কপালে তাই হবে। অবিশ্যি সত্যি বলতে কী, বুটজোড়া গ্রামদেশের কাদার জন্যে নয়। তবে বৌটাকে বুটের যত্ন নিতে হবে বৈকি। মাসে একবার করে বাইরে বেরুনোর জন্যে জুতোজোড়া পরা চলবে। তবে রাস্তায় কাদা থাকলে কখনোই নয়, যখন শুকনো থাকবে একমাত্র তখন। কিন্তু বৌয়ের কী আনন্দটা হবে সেটা ভাবো একবার! সেই মুহূর্তটা কল্পনা কর, যখন ও বাক্স থেকে বুটজোড়া বের করে বৌকে বলবে, 'তোমার লেগে কেনলাম।'

দোকান থেকে অল্প দূরে রাস্তার পাশের একটা স্টলে গিয়ে বীয়ারের জন্যে লাইন দিল সের্গেই।

বুটজোড়া দেখে স্ত্রীর চোখ কীরকম চকচক করে উঠবে মনে-মনে সেই দৃশ্যটা কল্পনা করল ও। মাঝে-মাঝে বৌটা একেবারে বাচ্চার সামিল হয়ে যায়, তখন খুশিতে ওর চোখে জল এসে যায় প্রায়। তা, বৌ-বিটি ওর বড্ড ভালো মেয়ে। জেবনে ওয়াদেরে অনেক-কিছু ঝড়ঝাপটা সইতে হয়েচে, আমাদের ইস্তিরিদের কথা কইচি, সের্গেই মনে-মনে ভাবে। বাচ্চাকাচ্চা সামলানো, সংসারের যাবতীয় কাজ, কত কী... এতসব সামলাতে বেশ শক্তিসামথ্থ আর মনের জোরের দরকার করে। আমার তবু এসবের হাত থেকে অল্পবিস্তর রেহাই মেলে — কাজে ব্যস্ত থাকার সময়, ইয়ার-দোস্তদের সাথে দু'এক পাত্তর মদ-টদ খাওয়ার সময়। ইচ্ছে করলেই এক-আধটুক রেহাই আমি পেতে পারি। কিন্তু মেয়েলোকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, দিনের চব্বিশটে ঘণ্টাই জুড়ে আচে সংসারের ঘানিতে।

লাইনটা আস্তে-আস্তে এগোচ্ছিল। যারা ইতিমধ্যেই নিয়েছে একবার, তারা ফের ফিরে আসছে মগগুলো 'দুনো করে' ভরে নিয়ে যেতে। হাতে সময় আছে দেখে সের্গেই ফের ভাবনায় ডুবে গেল।

'অবিশ্যি বৌটা-যে এখন জুতো ছাড়া খালিপায়ে ঘুরে বেড়াচ্চে, তা লয়। অবস্থা অত খারাপ লয় তাই বলে! "আহা, বেচারা বৌটা," বলে নাকে-কেঁদে নাভ কী! গাঁয়ের আর-সবাই যেমন জুতো-জামা গায়ে দেয় ওর বৌ-ও দেয়

তেমনি। তাইলে বিবি-সায়েবের বুট পায়ে দে চাল মারার এমন কী দরকার পড়েচে! বুটজোড়া দেখতে অবিশ্যি সোন্দর, তবে ঠিক আমাদের মতন মানুষের সামথ্যের মধ্যে লয়। আমি যদি বৌয়ের জন্যে বুটজোড়া কিনে লিয়ে যাই, তাইলে ও-ই হয়তো বকেঝকে আমারে অস্থির করে তোলবে। হয়তো বলবে, অত দাম দে অমন একজোড়া জুতোয় আমার মতন নোকের কামটা কী? বরং মেয়েগুলার জন্যে কিছুমিছু কিনে আনলে পারতে — এট্টা-এট্টা ওভারকোট কি আর-কিছু। শীত তো এসে পড়ল বলে।'

অবশেষে সের্গেইয়ের পালা এসে গেল। মগ-দুই বীয়ার কিনে নিভৃত একটা কোণ বেছে নিয়ে সে আস্তে-আস্তে বীয়ারে চুমুক দিতে আর ভাবতে থাকল।

'হ্যাঁ, এইভাবে ভেবে-ভেবেই জেবনের পঁয়তাল্লিশটা বছর কাইটে দেলাম। সারা জেবন ধরে ভেবেই এলাম যে একদিন-না-একদিন অবস্তার উন্নতি হবে, জেবনটা সচ্ছল হবে আরেট্টু আর জেবনটারে আরেট্টু রসিয়ে ভোগ করা যাবে। কিন্তু বছরগুলা কোনদিক দে-যে চলে যায় খেয়াল থাকে না, আর তাপ্পর যখন একদিন হুঁশ ফেরে তখন দেখা যায় যে কবরে শোবার জন্যে তৈরি হয়ে গ্যাচ। তখন টের পাও যে কিসের জন্যে যেন অপিক্ষে করে-করে গোটা জেবনটাই পার হয়ে গেল তোমার। কিন্তু গোটা জেবন অপিক্ষেই-বা করতে যাব কোন শালার লেগে? সুযোগ জোটলে তখনই দু'দণ্ড ফুর্তি করে লাও-না কেনে? তা, এখন তো তেমন এট্টা সুযোগ এয়েচে। সাথে ট্যাকা আচে তোমার, চোখটাটানি বাহারে একজোড়া বুটও আচে বিক্রির লেগে, তা বুটজোড়া কিনে উপহার দে' কাউরে সুখ দ্যাও-না কেনে! জেবনে এমন সুযোগ আর হয়তো আসবে না কোনোকালে। মেয়েদুটোর এখনও পর্যন্ত বে'র বয়েস হয় নাই, বাহারে সাজপোশাক ছাড়াও কাজ চলবে-নে তাদের। কিন্তু জেবনে এমন সুযোগ আর আসবে না...'

সের্গেই ফের ফিরে গেল দোকানটায়।

বলল, 'আচ্ছা, একবার দেখি তো মালটা কেমন।'

'কোনটা?'

'ওই বুটজোড়া গো।'

'তা, দেখে কী হবে? কোন সাইজের দরকার আপনার?'

'ওসব সাইজ-টাইজ জানি নে। চেহারা দেখে আন্দাজ করব অখন।'

'সাইজ জানেন না আর বাজার করতে এসেচেন? জুতো পায়ে পরে দেখতে হয়, বুঝলেন? এ শোবার কামরার চটিজুতো নয়।'

'তা, দাম দেখেই টের পাচ্চি সেটা...'

'তাহলে? দেখে আর কী হবে?'

'কিন্তু আমি যদি কেনতে চাই, তাইলে?'

'তা, কিনবেন কী করে? আপনার তো সাইজও জানা নেই দেখচি!'

'তোমার তাতে কী, বাপু? জুতোজোড়া আমি দেখতে চাই একবার...'

'নষ্ট করার মতন অত সময় নেই আমার। প্রতিটি খদ্দের এসে যদি এখন গায়ে হাত বুলানোর জন্যে জুতো পরখ করে দেখতে চায় তবেই হয়েচে আর-কি...'

'দ্যাখো, সোন্দরী,' খেপে গিয়ে এবার খ্যাঁক করে উঠল সের্গেই। 'আমি তোমারে অন্তব্বাস খুলে দেখাতে কচ্চি নে, আমি তা দেখতেও চাই নে, বুইলে। আমি শুধু তোমারে ওই তাকটায় রাখা বুটজোড়া দেখাতে কচ্চি, এইমাত্তর।'

'দেখুন, মেজাজ দেখাবেন না, অভদ্র ব্যবহার করবেন না বলচি! মদ টেনে মাথা গুলিয়ে এসে এখানে যতসব ঝামেলা পাকান...'

'কে ঝামেলা পাকাচ্চে, শুনি? আমি মদ খেয়েচি কি খাই নাই তা জানচ কী প্রেকারে? তুমি আমারে খাইয়েচ নাকি?'

বিক্রিঅলা মেয়েটি এবার একপাটি বুট ছুড়ে কাউন্টারের ওপর ফেলল। সের্গেই বুটের পাটিটা হাতে তুলে নিয়ে উল্‌টেপাল্‌টে দেখতে লাগল, পরখ করে দেখল চামড়াটা, নখ দিয়ে গালার বার্নিশ-করা জুতোর তলিতে টোকা মারল... তারপর সাবধানে জুতোর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে আরামদায়ক মখমল-নরম লোমে হাত বুলোতে লাগল...

খুশি হয়ে ভাবল, 'একবারে পালকের বিছনার মতন লরম।'

শেষে শুধোল, 'পাক্কা পঁয়ষট্টি রুব্‌ল?'

বিক্রিঅলা মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। নিঃশব্দ রাগে ফুঁসছিল সে।

ওর ভাব দেখে সের্গেই অবাক হয়ে গেল। ভাবল, 'আরে ব্বাস, আমার ওপর খেপেচে দারুণ। অবুঝ কুত্তি কাঁহাকা!'

'বুটজোড়া কেনব,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ও। ভাবল, 'এতে হয়তো

মেয়েটার রাগ এট্টু পড়বে, বুইবে যে আমি মিথ্যেমিথ্যিই ওকে জ্বালাই নাই।'

'আচ্ছা, দাম দুব কোন ঠেঁয়ে — তোমারে না ক্যাশ-কাউন্টারে?'

একই ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি এবার শান্ত গলায় চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'ক্যাশ-কাউন্টারে।'

'পাক্কা প'য়ষট্টি রুব্‌ল, না সাথে কিছু কোপেকও আচে?'

তখনও মেয়েটি নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সের্গেই এবার একটু ভালো করে ওর চোখের দিকে তাকাল। দেখল, চোখদুটো থেকে যেন অসম্ভব রাগ আর বিদ্বেষ ফেটে পড়ছে। কেমন ঘাবড়ে গিয়ে ও আর প্রশ্ন করতে সাহস পেল না, বুটের পাটিটা কাউন্টারে রেখে ক্যাশ-কাউন্টারে জুতোর দাম দিতে এগিয়ে গেল।

'কী হল মেয়েটার?! মাথাটাথা খারাপ না আর-কিছু — এমন খেপে ওঠল কেনে কে জানে? এত রাগ মেয়েটার, বেশিদিন বাঁচবে না দেখচি!'

দেখা গেল, জুতোজোড়ার দাম একেবারে টায়-টায় প'য়ষট্টি রুব্‌ল। ক্যাশ-কাউন্টার থেকে দামের রসিদটা এনে বিক্রিঅলা মেয়েটির সামনে রাখল সের্গেই। মেয়েটার চোখের দিকে তাকাতে ভরসা না-করে এবার সে তাকাল ওর চ্যাপ্টা বুকের ঠিক ওপরটাতে — যেখানে মেয়েটার কণ্ঠার হাড়দুটো ওর আঙ্‌রাখার গলার ফাঁক দিয়ে মুরগির পাখনার দুটো হাড়ের মতো উঁচু হয়ে ছিল। মেয়েটার জন্যে করুণা হল সের্গেইয়ের, ভাবল, 'ও নিচ্চই অসুস্থ।'

কিন্তু দেখা গেল রসিদটা না-নিয়ে মেয়েটা তখনও একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সের্গেই দেখল মেয়েটার চোখে এখন বিদ্বেষের সঙ্গে মিশে একধরনের একটা সন্তোষের ভাবও প্রকাশ পাচ্ছে। মেয়েটা এমনভাবে ওকে দেখছে যেন ও মানুষ নয় — জন্তু, সকলের দিকে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে গিয়ে বিশ্রী একটা হট্টগোল বাধানোর পর যেন এখন মার খেয়ে শিরদাঁড়া ভেঙে পড়ে আছে।

'দয়া করে বুটজোড়া দ্যাও।'

'প্যাকিং-কাউন্টারে খোঁজ করুন,' চিবিয়ে-চিবিয়ে আস্তে-আস্তে বলল মেয়েটি।

'সেটা আবার কোন ঠেঁয়ে?' সের্গেইও এবার ওর মতো চিবিয়ে-চিবিয়ে আস্তে-আস্তে শুধোল। টের পাচ্ছিল ও-ও মেয়েটাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছে, ওই চ্যাপ্টাবুক বিক্রিঅলা মেয়েটাকে, ওর অন্তর্বাস থেকে জির্‌জিরে কণ্ঠার হাড় আর ডগা-উল্টোনো নাক পর্যন্ত সবকিছুকে। এত অসম্ভব রাগ

হচ্ছে ওর যে ইচ্ছে করছে সজোরে গোটা-দুই টুস্‌কি দিতে ওই নাকটার ওপর।

জবাব না-দিয়ে মেয়েটা তখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'বলি, প্যাকিং-কাউন্টারটে কোন দিকে?' সোজা মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল সের্গেই। 'অ্যাঁ? আমার পানে অমন হাঁ-করে তাকাবার কিছু নাই, সোন্দরী — বে'-সাদি আমার সারা হয়ে গ্যাচে। জানি, আমারে দেখলেই মেয়েনোকে পীরিত করার লেগে খেপে ওঠে, কিন্তু নাভ কী এয়াতে, কও? মনের আশ্‌নাই মনেই চেপে রাখতে নাগবে তোমারে, কী আর করা। আচ্ছা, তাইলে প্যাকিং-কাউন্টারটে কোন ঠেঁয়ে যেন বললে?'

এবার মেয়েটির অবাক হবার পালা। ছোট্ট হাঁ-মুখখানা খুলে ঝুলে পড়েছে এখন। এ রকমটা সে আশা করে নি...

প্যাকিং-কাউন্টারের খোঁজে সের্গেই সরে পড়েছে ততক্ষণে।

আশ্চর্য হয়ে ও ভাবছিল, 'কোত্থেকে এত আসপদ্দা হল যে মাগীর আঁতে অমন ঘা দে কথা বললাম? তবু যা হোক, এ থেকে বিনি-কারণে অমন অসম্ভব খেপে না-উঠতে শিখবে ও। ওঃ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাগে কী ভীষণ ফুঁসছিল মেয়েটা!'

দোকান থেকে বুটজোড়া নিয়ে সের্গেই শহরের পরিবহণ ডিপোয় ফিরে এল গাঁয়ে ফেরার তোড়জোড় করতে (ওরা চারজন লরিতে করে শহরে এসেছিল। ও ছাড়া আরও দু'জন ড্রাইভার আর একজন মেকানিক)।

দোকানের সেই ঘটনার পর এতক্ষণে সের্গেই বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া দোস্তদের ও নতুন-কেনা বুটজোড়া দেখাবার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

চৌকিদারের অফিস-বাড়িতে ঢুকল ও। ভেবেছিল, ওর হাতের বাক্সটায় কী আছে তা দেখবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সবাই অস্থির হয়ে উঠবে। কিন্তু দেখা গেল বাক্সটার দিকে কারও চোখই পড়ল না... এমন কি সের্গেইয়ের দিকেও ফিরে তাকাল না কেউ। যথারীতি ওরা সবাই তর্ক করে চলেছিল। শহরে একজন ছোকরা পাদ্রিকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে ওরা, আর এখন সে-অনামুখো কত রোজগার করে তাই নিয়ে ভয়ানক মাথাব্যথা দেখা দিয়েছে সবার। ফ্যাকাশে চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ আর বড়-বড় বিষণ্ণ চোখ নিয়ে ভিত্‌কা কিবিয়াকভ চ্যাঁচাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। চেঁচিয়ে মাথার পোকা বের করে আর অন্য সবাইকে যা-মুখে-আসে তাই বলে গালাগাল দিয়ে

চলেছে যখন, তখনও কিন্তু তার চোখদুটোয় সেই চিরকেলে বিষণ্ণ জ্ঞানী-জ্ঞানী ভাবটা মাখানো, যেন চোখদুটো ভিত্‌কার নিজের দিকেই তাকিয়ে আছে হতাশায়, দুঃখে মুহ্যমান হয়ে।

'জানিস তোরা যে নোকটার নিজের গাড়ি আচে আর তা শোফারে চালায়?' চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলছিল উখো (সঙ্গীরা ভিত্‌কার নাম দিয়েছে উখো)। 'ওয়ারা যখন শিক্ষানবিশি করে তখনই মাসিক দেড় শো রুব্‌ল ভাতা পায়! বুইলি? ভাতা পায়, ভাতা!'

'ওয়াদের নিজেদের গাড়ি আচে বটে, সেকথা সত্যি। তবে ওই ছোঁড়া-পাদ্রিগুলোর গাড়ি নাই। আমাদেরে কী আগড়ম-বাগড়ম বোঝাবার চেষ্টা পাচ্চিস তুই? ওয়াদের ভিত্‌রি যাদের গাড়ির শোফার আচে তারা হল গে'... ওই-যে কী যেন বলে ওদেরে?..'

'এঃ, "ওই-যে কী যেন বলে ওদেরে?.." থাম্‌-থাম্‌, সবই তো জেনে বসে আচিস কিনা!'

'তুই কদ্দুর জানিস, তাই শুনি? বড়-যে চিচ্‌কার দে' মানুষের মাথার পোকা ফেলে দিস, কদ্দুর জানিস তুই?'

'আরে, ওয়ার ঘরের খুঁটিটে পর্যন্ত পাদ্রি-পুরোতের জ্ঞাতগুষ্টি তা জানিস!'

'বুইলি?.. দেড় শো রুব্‌ল মাসিক ভাতা! বুইলি?'

'ওয়াদের ভিত্‌রি যাদের গাড়ির শোফার আচে তারা হল গে' — ধম্মোপ্রেচারক। না-না, ধম্মোপ্রেচারক না — ওই-যে কী যেন বলে ওদেরে?..'

'শুন্‌লি কথা? ধম্মোপ্রেচারকদের গাড়ি নাকি শোফারে চালায়! আচ্ছা আহাম্মক কোথাকার! তুই নিজেই মস্ত ধম্মোপ্রেচারক, বুইলি!'

'ওয়াদের ভাতাই হল গে এক শো পঞ্চাশ রুব্‌ল! তাইলে মাস-মাইনে কত ওয়াদের?'

'কী, মাসিক পাঁচ শো রুব্‌ল উপায় করতে চাস?'

যদিও ইচ্ছে করলেই তর্কে যোগ দিয়ে সে-ও দু'কথা বলতে পারে, তবুও এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে প্রবৃত্তি হল না সের্গেইয়ের। ইঃ, বলে কিনা ছোঁড়া-পাদ্রিরা মাইনে পায় মাসিক পাঁচ শো রুব্‌ল। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্চে না কথাটা! কিন্তু ঠিক এক্ষুনি ওর এ নিয়ে তর্ক করতে রুচি নেই। ওর এখন সবাইকে বুটজোড়া দেখানোর ভারি ইচ্ছে। বাক্স থেকে বুটজোড়া বের করে এবার ও সবাইকে দেখিয়ে-দেখিয়ে সেগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে

দেখতে লাগল। এই ঠিক হয়েচে, এবার ওয়ারা হতচ্ছাড়া পাদ্রিরে নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি বন্ধ করবে। হৈ-হল্লা বন্ধ হয়ে যাবে ওয়াদের। কিন্তু কই, তা তো হল না। ওরা শুধু তাকিয়ে দেখল একবার, আর কিছু না। কেবল উপস্থিত ড্রাইভারদের একজন হাতখানা বাড়িয়ে দেয়ায় সের্গেই তার হাতে একপাটি বুট তুলে দিল। ড্রাইভারটি (সের্গেই লোকটিকে চেনে না) বুটের পাটিটা হাতে নিয়ে চামড়াটা পরখ করে দেখল, লোহার মতো শক্ত আঙুলের নখ দিয়ে টুস্‌কি মারল জুতোর তলিতে... তারপর চেষ্টা করল তার তেলকালিমাখা থাবাখানা জুতোর ভেতরকার বরফের মতো শাদা, পালকের মতো নরম অংশটায় ঠেসে ঢোকাতে। দেখে সের্গেই সঙ্গে সঙ্গে বুটখানা কেড়ে নিল ওর হাত থেকে।

'আরে-আরে, মস্ত নোড়াখান ঢোকাচ্চ কোন ঠেঁয়ে, শুনি?'

শুনে ড্রাইভারটি হেসে উঠল।

'তা, এয়া কার লেগে?'

'ইস্তিরির লেগে, আবার কার!'

কথাটা কানে যেতে এতক্ষণে সবাই চুপ করল।

'অ্যাঁ? কী বললে? কার লেগে?'

'ক্লাভ্‌কার লেগে।'

'দেখি, দেখি, জুতোজোড়া দেখি।'

ব্যস, এরপর হাতে-হাতে ঘুরতে লাগল জুতোজোড়া। বাইরের চামড়াটায় সকলেই হাত বুলিয়ে দেখল, জুতোর তলিতে টুস্‌কিও দিল... কিন্তু ভেতরে হাত ঢোকাতে ভরসা হল না কারও। ওরা কেবল খামচি দিয়ে বুটের মাথাটা ফাঁক করে ভেতরকার ধবধবে শাদা তুলো-তুলো অংশটায় উঁকি দিয়ে-দিয়ে দেখল। ওদের মধ্যে কেউ একজন কী কারণে যেন ভেতরে একবার জোরসে ফুঁ-ও লাগাল। ওর পক্ষে যা অস্বাভাবিক এমন একটা গর্ব অনুভব করতে লাগল সের্গেই।

'তা, দাম পড়ল কত বুটজোড়ার?'

'পয়ষট্টি রুব্‌ল।'

'কত?!'

'পয়ষট্টি...'

শুনে সবাই তাজ্জব বনে গিয়ে হাঁ-করে তাকিয়ে রইল সের্গেইয়ের দিকে। এতে সের্গেই একটু থমকে গেল।

'কী হল তোদের?'

'অ্যাঁ, বলিস কী, পয়ঁষট্টি রুবল?!'

'তা তোরা কি ভাবলি পয়ঁষট্টি কোপেক?'

'মাথাটাথা বিগড়েচে নাকি তোর?'

উখোর হাত থেকে একপাটি বুট এবার কেড়ে নিল সের্গেই।

'তা, সের্গেই এবার সবারে মাত করে দেচে বটে!' উখো বলল। 'কিন্তু এমন জুতোজোড়ায় তোর বৌয়ের কোন উবগারটা হবে?'

নিজের বোকামিটা এতক্ষণে প্রায় টের পেয়েছিল সের্গেই। কাজেই মেজাজ খারাপ করে বললে:

'বুটজোড়া সে পায়ে দেবে, আবার কী!'

'আচ্ছা, তোরে কী পেয়ে বসেচে বল্ দিনি?'

'কী আবার পাবে, কিছুই না।' নিজেকে বুঝিয়ে শান্ত করে আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেতে চাইছে সের্গেই, অথচ কেন যেন ভেতর-ভেতর একটা কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। আর বুটজোড়ার দাম যে একখানা মোটর-স্কুটারের অর্ধেক এই ভাবনাটা কী করে যেন ওর মাথায় গেঁথে বসে গেছে। 'আধখান মোটর-স্কুটারের দাম। আধখান মোটর-স্কুটারের দাম' — কথাটা ঘুরে-ঘুরে গুন্‌গুন করছে মাথায়। ও অবিশ্যি জানে যে দামটা মোটেই অর্ধেক নয়, এমন কি অর্ধেকের ধারে-কাছেও নয়, তবু ভাবনাটা কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছে না। 'আধখান মোটর-স্কুটারের দাম'।

'বৌ কি তোরে কয়েছেল বুটজোড়া কেনতে?'

'সে বলবে কেনে? আমি লিজে থেকেই কিনেচি।'

শুনে উখো, নারকী, কাঁদুনে-চোখো উখো (আবার কাণ্ড দ্যাখো, ব্যাটা সব্বত্তর হাজির) করলে কী — সে হেসে দিল:

'বৌ তোরে আচ্ছা করে টেরটি পাইয়ে দেবে অখন।'

'আচ্ছা, তোর বৌ কোন ঠেঁয়ে বুটজোড়া পায়ে দে হাটবে বল্ দিনি?' হেসে-হেসে ওরা শুধোল সের্গেইকে। 'সব্বত্তরই তো হাঁটুভোর কাদায় ছেয়ে আচে। আর উনি কিনা কর্‌করে পয়ঁষট্টি রুবল দে বুট কিনে আনলেন। তা, তোর কী হয়েছেল বল্ দিনি — ভুতে পেয়েছেল?'

'এ-জোড়া শীতের বুট, বুইলি!'

'কিন্তু শীতেও অমন একজোড়া বুট পায়ে দে কোন ঠেঁয়ে ঘোরবে সে, শুনি?'

'তাছাড়া, এয়া শহুরে ছুঁড়িদের ঠ্যাঙের মাপের। ক্লাভ্কার পা এয়াতে ঢোকবেই না, এ আমি কয়ে দেলাম। ওয়ার পায়ের মাপ জানা আচে তোর? যা বুট কিনেচিস তুই তা ওয়ার নাকেই ঠিকঠিক মাপসই হবে, আর কিছু না।'

'আচ্ছা, ক্লাভ্কার পায়ের মাপ কত?'

'আহ্, চুলোয় যা মুখপোড়া!..' সের্গেইয়ের মেজাজ এবার রীতিমতো গরম হয়ে উঠেছে। 'এয়াতে তোর কী এসে-যায় বল্ দিনি?'

এতে ফের আরেক চোট হাসির হুল্লোড় উঠল।

'সের্গেই, ইয়ার, কিছু মনে করিস না! আমি বলছেলাম কী, তুই তো আর পয়ঁষট্টি রুব্ল রাস্তায় মাগ্না কুইড়ে পাস্ নি, তাই-না?'

'তা কেনে? এয়া আমার রোজগারের ট্যাকা আর এখন আমার ইচ্ছেমতন জিনিস কিনে খরচা করেচি সেই ট্যাকা। ব্যাস, ফুইরে গেল।'

'কিন্তু এত রাগ করচিস কেনে বল দিনি? তুই এট্টা ভুল কাজ করেচিস আর আমরা তোরে ভুলটে ধরিয়ে দিচ্চি, এই তো ব্যাপার। তাতে এত রাগারাগির আচেটা কী?'

'আমি মোট্টেও রাগ করি নাই। তোরই বরং ভয়ে-ভাবনায় মুখ কালিবন্ন হয়ে গ্যাচে। আমার মোট্টেও দুশ্চিন্তা নাই।'

'তা, আমার মুখ যদি কালিবন্ন হয়ে থাকে তো তাতে কী এসে-যায়? ইচ্ছে করলেই মুখের বন্ন পাল্টে ফেলতে পারি। দুই-এক গেলাস ভোদ্কা পেটে পড়লেই মুখের বন্ন আপনি ফিরে যাবে-নে। কিন্তু এই বুটজোড়ার জন্যে তোরে-যে গোটা মাস কষ্ট করে চালাতে হবে তা খেয়াল আচে?'

'তা, আমার লেগে এত মাথাব্যথা কেনে তোর?! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েচে দেখচি যেন! নোকে শুনলে ভাববে আমি বুঝি ওয়ার ঠেঁয়েই ট্যাকা ধার করেচি... তা, বসে-বসে অমন আকাশ-পাতাল ভাবতে নেগেচিসটা কী? বসে-বসে ভাবচে দ্যাখো হতভাগাটা, মুখ একদম কালিবন্ন হতে নেগেচে।'

'আমার মাথাব্যথা পড়েচে এইজন্যে যে আহাম্মকদের আমি দু'চক্ষে সইতে পারি নে। ওয়াদের দেখে বড় কষ্ট নাগে আমার...'

'কষ্ট নে তুই ধুয়ে-ধুয়ে খা! এঃ, কষ্ট নাগে ওনার!'

'হ্যাঁ, নাগেই তো।'

'যা-যা! গিয়ে মুখের বন্ন পাল্টে আয়!'

'তা, তুইও আমার সাথে আসচিস তো? বুটজোড়া কেনার খাতিরে এক-পাত্তর খেতে নাগবে তো।'

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলল ওদের মধ্যে। তারপর গাঁয়ের দিকে রওনা হল চারজনে।

বাড়ির পথে সের্গেইকে শেষপর্যন্ত ধরাশায়ী করে দিল মেকানিকটি (ওরা দু'জন একই লরিতে ফিরছিল)।

'তোমার বৌ তোমারে ট্যাকাটা দেছিল কিসের লেগে?' মেকানিক শুধোল। কোনো বিদ্বেষের ভাব না-দেখিয়ে সহজভাবেই প্রশ্নটা করল সে। 'আর-কিছু কেনার লেগে?'

মেকানিকটিকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে সের্গেই, তাই মেজাজ খারাপ না করেই জবাব দিল:

'না, আর-কিছুর লেগে লয়। যাই হোক, বাদ দ্যাও ওকথা।'

সন্ধে নাগাদ গাঁয়ে এসে পৌঁছুল ওরা।

অন্যদের কাছ থেকে রীতিমাফিক বিদায় নিল না সের্গেই। তাদের নিরাপদে বাড়ি-ফেরা উপলক্ষে একপাত্র ভোদ্‌কা টানার জন্যে অযথা সময় নষ্ট না-করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরল।

বাড়িতে যখন ঢুকল ক্লাভ্‌দিয়া আর মেয়েরা তখন রাতের খাবার খাচ্ছে।

'ফিরতে দেরি হয়েচে তোমার, তাই-না?' ওকে দেখে ক্লাভ্‌দিয়া বলল। 'ভাবলাম রাতটা বুঝি ওখেনেই থেকে আসবে।'

'এই, মালপত্তর যোগাড় করা, ডিপোয় লিয়ে যাওয়া, তাম্পর ডিপো থেকে জেলায়-জেলায় পাঠাবার লেগে সে-সব পার্সেল করা, এইতে খানিকটে দেরি হয়ে গেল আর-কি...'

'কিছু কেনাকাটা কর নি, বাবা?' বড়মেয়ে গ্রুশা জিজ্ঞেস করল।

'যেমন? কী বলতে চাস?' বাড়ি আসার পথে সের্গেই মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিল যে ক্লাভ্‌দিয়া যদি বুটজোড়া কেনা নিয়ে খেঁচাখেঁচি করে, যদি বলে অত দাম দিয়ে কেনার কী দরকার ছিল বরং ওর বদলে আর-কিছু কিনলে ভালো হোত, ইত্যাদি — তাহলে ও সোজা কুয়োতলায় গিয়ে বুটজোড়া কুয়োর জলে ফেলে দেবে।

'এই যাহোক-কিছু। কোনো একটা জিনিস?'

'হ্যাঁ, কিনেচি বৈকি।' যেন বরফের মধ্যেকার গর্তে মাথা-নিচের-দিক করে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝুঁকি নিল সের্গেই। ঝাঁপিয়ে পড়লও।

কথাটা শুনে টেবিলের ধারে-বসা তিনজনই ফিরে ওর দিকে তাকাল। যেভাবে ও বলল 'হ্যাঁ, কিনেচি বৈকি,' তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে বাড়ির কত্তা নিছক চার-রুব্‌ল দামের একখানা স্কার্ফ কিংবা একটা মাংস-পেশাই কল কেনে নি, কিনেছে আরও জবর কোনো জিনিস। সবটুকু শোনার জন্যে ওর দিকে ফিরে তারা অপেক্ষা করে রইল।

'জিনিসটে আমার ব্যাগে আচে।' একখানা চেয়ারে বসে পড়ে পকেটে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতে লাগল সের্গেই। এত বিচলিত হয়ে পড়েছে ও যে হাত কাঁপছে। দিনটা বড় ঝঞ্ঝাটে কেটেছে ওর। বুটজোড়া ওকে এক্কেবারে ঘায়েল করে দিয়েছে।

সের্গেইয়ের ব্যাগ থেকে বাক্সটা টেনে বের করল ক্লাভ্‌দিয়া আর অমনি বাক্স থেকে উঁকি দিল বুটজোড়া... ঘরের ইলেক্‌ট্রিক আলোয় আরও যেন ঝকমক করছে ওগুলো। মনে হচ্ছে, বাক্সের মধ্যে শুয়ে যেন হাসছে। আর ক্লাভ্‌দিয়ার ব্যাপারটা কী? সে কী করছে? একবার নড়ে-চড়ে উঠে চেয়ারে আবার যেন জমে গেল সের্গেই। জুতো দেখে মেয়েদুটোও উহু-আহা করতে-করতে লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে।

'মরি-মরি-মরি! কার জন্যে গো?'

'কার জন্যে আবার? তোমার জন্যে!'

'অ্যাঁ, বল কী? হায়-হায়-হায়!..' ক্লাভ্‌দিয়ার পা থেকে চটিজুতো-দুটো ছটকে পড়ল। ঝপাং করে বিছানায় বসে পড়ায় ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল খাটখানা।... কায়দাদুরস্ত শহুরে বুট একপাটি গাঁট্টাগোঁট্টা চাষাড়ে পায়ে সহজে ঢুকে গেল খানিকটা — ব্যস, তারপরই গেল আটকে। সের্গেইয়ের বুকটা ছ্যাঁত্‌ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আর কিছুতেই নড়ছে না বুটের পাটিটা। ওপরের মাথার দিকটা বেধে গেছে, আঁটো হয়ে চেপে বসেছে পায়ে খানিকটা নিচের দিকে।

'কত সাইজের জুতো গো এয়া?'

'আটতিরিশ।'

না, আর উঠছে না বুটটা। সের্গেই দাঁড়িয়ে উঠে শক্ত করে বুটের মাথাটা চেপে ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করল। কোনো ফল হল না।

'আশ্চয্যি তো, জুতোজোড়া আমারই পায়ের মাপের কিন্তু...'

'জুতোচা টাইট হচ্চে এখেনটায় — পায়ের ডিমের কাছে।'

'এমন বিতিকিচ্ছি মোটা-মোটা পা-না আমার!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আচ্ছা, খুব পাতলা একজোড়া মোজা পরে দ্যাখো দিনি।'

'কী নাভ তাতে! কত আঁটো হয়েচে টের পাচ্চ না?'

'তা তো পাচ্চি, তবু...'

'ইঃ, কী ঝামেলা বল দিনি! এমন গোদা-গোদা পা-না আমার!'

অবশেষে উত্তেজনা জুড়িয়ে গেল এক-মুহূর্তে।

ক্লাভ্‌দিয়া নিশ্বাস ফেলে বলল, 'হায়-হায় রে! কী বিচ্ছিরি গোদা-ধুমসো পা যে কী বলি! আচ্ছা, কত দাম নেচে গো?'

'পয়ষট্টি রুব্‌ল।' একটা সিগারেট ধরাল সের্গেই। ওর মনে হল ক্লাভ্‌দিয়া বোধহয় দামটা শুনতে পায় নি। তাই ফের বলল, 'পয়ষট্টি রুব্‌ল দাম নেচে বুটজোড়ার।'

পায়ে অর্ধেক-পরা বুটটার দিকে তাকিয়ে ছিল ক্লাভ্‌দিয়া, জুতোর মসৃণ মাথাটার গায়ে আস্তে-আস্তে হাতের তেলো বোলাচ্ছিল। ওর চোখে, চোখের পাতায় চকচক করছিল জল... হ্যাঁ, জুতোর দামটা ঠিকই কানে গিয়েছিল ওর।

'ইঃ, নিকুচি করেচে এই ঠ্যাঙ্‌দুটোর!' বলল ও। 'জেবনে একবারের তরে কপালটা ফিরেছেল আমার, তা-ও সইল না! পায়েই হল না জুতোজোড়া! হায়-হায় রে!'

শুনে সের্গেইয়ের বুকটা আরেকবার কন্‌কন করে উঠল মমতায়, ভালোবাসায়, কিছুটা-অবহেলিত ওর সেই পুরনো ভালোবাসায়। বুটের মাথায় হাত বোলানোয় ব্যস্ত স্ত্রীর হাতের ওপর হাত রাখল ও, তারপর হাতখানায় চাপ দিল একটু। ক্লাভ্‌দিয়া চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল। চোখাচোখি হল ওদের মধ্যে। আর আগে যেমন করত ঠিক তেমনি সলজ্জভাবে অল্প হেসে মাথা নাড়ল ক্লাভ্‌দিয়া। একেবারে হুবহু সেই তরুণ বয়সের মতো — দুষ্টুমিভরা পুরুষালি ধরনে, আবার আত্মমর্যাদা আর গর্বের ভাব নিয়েও।

'বুইলি গ্রুশা, তোরই দেখচি কপাল ভালো।' বলে মেয়ের দিকে একপাটি বুট বাড়িয়ে ধরল সে। 'পায়ে দে দ্যাখ্‌ দিনি একবার।'

শুনে মেয়েটা অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে ভেবে পেল না।

'তা-ই ভালো!' স্ত্রীর কায়দায় মাথা নেড়ে সের্গেই বলল। 'দশ-কেলাস ভালোয়-ভালোয় শেষ করতে পারলে জুতোজোড়া তোরই হবে।'

শুনে হি-হি করে হেসে উঠল ক্লাভ্‌দিয়া।

...শুতে যাবার আগে রোজ কিছুক্ষণ রান্নাঘরের দরজার কাছে নিচু একটা টুলে বসে দিনের শেষ সিগারেটটা ফোঁকা সের্গেইয়ের চিরকেলে অভ্যেস। সে-রাত্রেও তাই করছিল সে। বসে-বসে সিগারেট টানতে-টানতে ভাবছিল, কিংবা বলা যায় ঠিক কিছু ভাবছিল না। কেবল ওর জুতোকেনার অভিযানের অভিজ্ঞতাটুকু মনে-মনে তোলাপাড়া করে দেখছিল। অভিযানের অপ্রত্যাশিত ও — এখন ওর যা মনে হচ্ছিল সেই — গভীর তাৎপর্যটুকু বুঝে ওঠার চেষ্টা করছিল। মনটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠেছিল ওর। ভাবছিল, এই চমৎকার মেজাজটুকু, এমন একটা দুর্লভ দামি মুহূর্ত যদি কোনো কারণে এখন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।

ক্লাভ্দিয়া বিছানা করছিল। হেঁকে বলল, 'শুতে আসবে না?'

ইচ্ছে করেই সের্গেই দেরি করছিল। ক্লাভ্দিয়া এরপর কী বলে তাই শোনার জন্যে।

'সের্গেই, শুতে যাচ্ছি, কেমন!'

সের্গেই উঠল। সিগারেটের পোড়া শেষ-অংশটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘরে ঢুকল। মনে-মনে ও তখন হাসছে আর মাথা নাড়ছে। কিন্তু ওর একবারও মনে হল না — 'বুয়েচি-বুয়েচি এত মিষ্টি ব্যাভার কেনে আজ, বুটজোড়া কিনেচি বলে তো।' না, তা নয়। ও জানে বুটজোড়ার জন্যে নয় এটা। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এর কারণ, কারণটা এর... চুলোয় যাক গে...

সব ভালো যার শেষ ভালো।

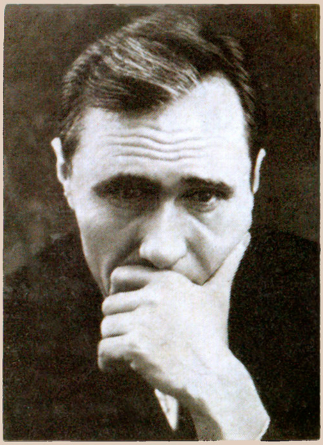
পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union





অপরূপ অভিনেতা, প্রথম শ্রেণীর চিত্র-পরিচালক ও সুলেখক ভাসিলি শুক্‌শিন (১৯২৯-১৯৭৪ সাল) শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত সাফল্য অর্জন করেন। ওঁর সাফল্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি সর্বদাই বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল।

শুক্‌শিনের অসামান্য খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার উৎস যে কোথায় তা বলা কঠিন — সে কী ওঁর গল্পগুচ্ছের জন্যে, নাকি 'হ্রদতীরে' নামের চলচ্চিত্রে অপূর্ব অভিনয়ের কারণে (এই ছবিতে উনি প্রধান অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন)? সে কী নিজের তোলা ফিল্‌ম 'জীবনের পথে' ও অন্যান্য ফিল্‌মের জন্যে, নাকি কৃষক-যুদ্ধের গণনায়ক স্তেপান রাজিনের জীবন অবলম্বনে লেখা তাঁর উপন্যাসের কারণে? কিন্তু সে যাই হোক, ছোটগল্প রচনায় শুক্‌শিনের প্রতিভা যে অসামান্য তা নিঃসন্দেহে তর্কাতীত। জনচরিত্রের মস্ত বড় এক বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। জীবনে যতরকম ঘটনা সম্ভবপর, তা সে দৈনন্দিনের ছোটখাট কিংবা বড়মাপের ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তার যথাযথ চিত্রণে ছিল তাঁর অসামান্য মুন্সিয়ানা। সংবাদপত্রে ওঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, 'শুক্‌শিন — জনগণের লেখক এবং এক অসামান্য লেখক।'

এই সংকলনে লেখকের জীবনের শেষ দশ বছরের সবচেয়ে ভালো গল্পগুলি সংগৃহীত।

প্রগতি প্রকাশন